

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মাগফেরা বেগম

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর, ২০১৯

Declaration

I declare that the thesis entitled “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে” has been prepared by me under the guidance of Dr. Manjula Bera, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date : 11/11/2019

Magfera Begum

(Magfera Begum)

Department of Bengali
University of North Bengal

কুণ্ডলিকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

আমি মাগফেরা বেগম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে
মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে” শিরোনামে পিএইচ. ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি।
আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, আমি এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ
কুণ্ডলিকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিনি।

Magfara Begum
(মাগফেরা বেগম) 11/11/2019
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ



উত্তর বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়
দাঙ্গিলিং ৭৩৪০১৩। পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর

তারিখ

Certificate

I certify that Magfera Begum has prepared the thesis entitled “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে” for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. She has carried out the work of the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date:

Manjula Bera
(DR. MANJULA BERA) 11/11/2019

Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

বাংলা বিভাগ



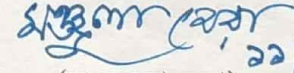
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩ | পশ্চিমবঙ্গ | ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর

তারিখ

কুণ্ঠীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

মাগফেরা বেগম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে
মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে' শিরোনামে আমার তত্ত্বাবধানে পিএইচ. ডি.
গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, গবেষক
এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুণ্ঠীলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি।


(ড. মঞ্জুলা বেরা) ২২/১১/২০২১
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ (Abstract)

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যশালী সম্পদ মঙ্গলকাব্যের বিশ শতকে ঘটেছে নানা রূপান্তর। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মানুষের চিন্তা-চেতনায় দ্বন্দ্ব-জটিলতা, মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা বাঙালীর চেতনার জগতে প্রভাব ফেলে। হতাশাময় ও স্বপ্নভঙ্গের এই সময়ে বাংলা সাহিত্যেও উঠে আসে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বের সংকট প্রভৃতি দিকগুলি। বাংলা সাহিত্যের এরকম প্রেক্ষাপটে কিছু কবি-সাহিত্যিক হাত বাড়িয়েছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনাগুলির দিকে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্যগুলিকে অনুষঙ্গ করে রচিত হয়ে চলেছে অসংখ্য কাব্য-কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প। বিশেষ করে মনসাদেবী ও চণ্ডীর মিথ নিয়ে লেখা অনেকগুলি রচনা আমরা পেয়ে থাকি। বিশ শতকের প্রথম ভাগে কয়েকটি রচনা পেলেও মূলত এই শতকের দ্বিতীয় ভাগে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী নিয়ে একাধিক কাব্য-কবিতা-নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প রচিত হয়েছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ ঘটেছে এই সময়। এই অভিনব সাহিত্য ধারার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং প্রত্যেকটি সাহিত্যই গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র সাহিত্য রূপে গড়ে উঠেছে। “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে” কীভাবে ঘটেছে, তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হল আমার গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

মনসামঙ্গল কাব্যগুলি অবলম্বনে রচিত সাহিত্য নিয়ে এযাবৎ বহু কাজ হলেও সেই সকল সাহিত্যের প্রকরণে ও ভাবনার দিক থেকে কতটা নবনির্মাণ ঘটেছে, তা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা বা নিবিড় আলোচনা হয়ে ওঠেনি। গতানুগতিক কাহিনীকে অবলম্বন করলেও সংযোজন-বিস্তার, বর্তমান পরিবেশ ও মানসিকতার পরিবর্তনে কীভাবে সেগুলি একেবারে নতুন সাহিত্য হয়ে উঠেছে সেদিকটি নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা এখনও হয়নি। আমার গবেষণা কাজের উদ্দেশ্য হল মনসা-কথাকে নিয়ে রচিত গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পগুলির অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে মনসা-কথার মিথ কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তা আলোচনা করা। আর উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলার জন্য আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণার কাজে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছি—

ভূমিকা	:	
প্রথম অধ্যায়	:	মনসা-কথার মিথ
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার পরিচয়
তৃতীয় অধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপ-এ মনসা-কথার পরিচয় সংক্ষেপ
চতুর্থ অধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যানে মনসা-কথার নবনির্মাণ
পঞ্চম অধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা-কথার নবনির্মাণ
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণ
সপ্তম অধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসা-কথার নবনির্মাণ
অষ্টম অধ্যায়	:	আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নবনির্মাণ
উপসংহার	:	

প্রথম অধ্যায় মনসা-কথার মিথ

লৌকিক সমাজে সর্পদেবী মনসার পূজার প্রচলন বহুল। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনে প্রোথিত এই মনসাদেবীর মিথ। ক্রমে এই মিথ লৌকিক সমাজ ছাড়িয়ে বৃহত্তর মানব সমাজে প্রচলিত হয়েছে। সর্প সম্পর্কিত ধারণা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রচলিত। সাধারণত মানুষ সর্পের থেকে ভয়ের কারণে তার সম্ভূষ্টির জন্য পূজা-অর্চনা করতে থাকে। সর্পপূজার প্রচলন এভাবে হতে থাকে। এই সর্পকে আবার উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সাপ 'totem' হিসেবে উঠে এসেছে। যেমন নাগজাতিরা নিজেদের সর্পের তথা নাগের বংশধর মনে করত। সর্পের মঙ্গলময়ী রূপের ক্ষেত্রে সর্পকে পূর্বপুরুষ ধরে বাস্তুভিটার রক্ষক মনে করা হয়। আমাদের ভারতবর্ষে অষ্টিক জাতি অপেক্ষা দ্রাবিড় জাতির কাছে সর্পপূজার প্রচলন বেশি। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির দ্বারা পূজিত সর্পদেবীর নাম 'মনচা অম্মা' বা 'মঞ্চা অম্মা'। আর এই শব্দ থেকে 'মনসা' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। আবার বৌদ্ধ সাধনামালার 'জাম্বুলী তারা' পরে মনসাতে রূপান্তরিত হয়েছে বলা যেতেও পারে। আমাদের বাংলাদেশে আবার এই মনসাদেবীকে শিবের 'মানস কন্যা'

বলা হয়ে থাকে। লৌকিক সমাজের দেবীকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিরা ব্রাহ্মণ্য দেবতা শিবের কন্যা রূপে দেখিয়ে মনসাকে উচ্চবিত্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এভাবে মনসা দেবীর মিথের মধ্য দিয়ে আর্য-প্রাগার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। বাংলাতে এই মনসা জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী নামেও পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের শাখা মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসা, পদ্মাবতী, জাঙ্গুলী এই নামগুলি পাওয়া যায় স্পষ্টভাবে। প্রথম অধ্যায়ের মনসাকথার মিথ সম্পর্কিত সামগ্রিক একটি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার পরিচয়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারার প্রাচীনতম শাখা হল মনসামঙ্গল। এই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মনসাদেবীর যে পরিচয় তা সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অবলম্বন স্বরূপ নিয়েছি নিম্নোক্ত কাব্যগুলি—

১. পশ্চিমবঙ্গীয় বা রাঢ়বঙ্গের কবি বিপ্রদাস পিপলাই (পঞ্চদশ শতাব্দী)
২. পূর্ববঙ্গীয় কবি বিজয়গুপ্ত (পঞ্চদশ শতাব্দী)
৩. পূর্ববঙ্গীয় কবি নারায়ণদেব (পঞ্চদশ শতাব্দী)
৪. উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল (সপ্তদশ শতাব্দী)

গতানুগতিক একটি কাহিনীতেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হলেও ব্যক্তি বিশেষে, স্থানের পার্থক্যে, সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক কবির কাব্য স্বতন্ত্র মাত্রা রাখে। মনসাদেবীর পরিচয় ও সেই সঙ্গে চাঁদ সদাগর বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীও প্রত্যেকটি কাব্যে স্বতন্ত্র মাত্রা রাখে। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্যগুলিতে— বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’, বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’, নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণ’—এ দেবমাহাত্ম্য যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, যেনতেন প্রকারে পূজা আদায়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে মানবতার জয়গানই হয়েছে বেশি।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপ-এ মনসা-কথার পরিচয় সংক্ষেপ

মনসা-কথাকে অবলম্বন করে আধুনিক যুগে বিভিন্ন প্রকরণ, যথা— গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প রচিত হলেও প্রত্যেকটি সাহিত্য লেখকের ভাবনায় নতুন মাত্রা লাভ করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যকে নিয়ে যেমন গদ্য আখ্যান লেখা হয়েছে, তেমনি আবার সংলাপের মধ্য দিয়ে কাব্যগুলি হয়ে উঠেছে আধুনিক নাটক। মনসামঙ্গলের মিথকে অনুসঙ্গকে করে বর্তমানের জীবনযন্ত্রণা উঠে এসেছে উপন্যাস, ছোটগল্প ও কাব্য-কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। তৃতীয় অধ্যায়টিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আধুনিক সাহিত্য সংরূপে অর্থাৎ গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পে মনসামঙ্গলের কাব্যগুলির যে নবনির্মাণ, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যানে মনসা-কথার নবনির্মাণ

বিশ শতকের প্রথম দিকে আচার্যদীনেশচন্দ্র সেন মনসামঙ্গলের ঐতিহ্যকে গদ্যের আকারে বাঙালীর সামনে তুলে ধরেছেন ‘বেহুলা’ (১৯০৭) রচনাটির মধ্য দিয়ে, তা চতুর্থ অধ্যায়ে রেখেছি। বর্তমানের আধুনিক ও উত্তর আধুনিক যুগে নারী সমাজের কাছে প্রাচীন কাব্যের বেহুলার পাতিব্রত, সততা, একনিষ্ঠতা অবহেলার পর্যায়ে না যায়, তাই তিনি এই আদর্শ নারীর জীবনকথা বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রচনা করেছেন ‘বেহুলা’ গদ্য আখ্যানটি।

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা-কথার নবনির্মাণ

আধুনিক বাংলা নাট্য জগতে মনসা-কথার নবনির্মাণে যে নাটকগুলিকে আলোচনার মধ্যে নিয়েছি, সেগুলি হল—

১. ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯২৭)— মন্মথ রায়
২. ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৭৬)— অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৭৮) — শম্ভু মিত্র

৪. ‘মনসা কথা’ (২০০১) — শেখর দেবরায় ইত্যাদি।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে নিয়ে বিশ শতকের প্রথমেই মনমথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’ নাটকে শিব ও মনসা একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। শিবের আত্মজা হয়ে উঠেছেন মনসা। ‘সওদাগরের নৌকা’তে প্রসন্ন চাঁদের মতো ট্রাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে সে নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন বাঁচার তাগিদে। একই রকমভাবে চাঁদ সদাগর, সনকা, লখীন্দর, বেহুলাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন যুগযন্ত্রণার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে ‘চাঁদ বণিকের পালা’য়। আবার ‘মনসা কথা’য় দেবী মনসা সাধারণ দরিদ্র মানুষের মাতা রূপে উঠে এসেছেন। এইভাবে আলোচ্য প্রতিটি উপন্যাসই হয়ে উঠেছে মনসাকথার নবনির্মাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণ

আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসামঙ্গল কাব্যের রূপান্তর বা নবনির্মাণে, বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত কাব্য-কবিতাগুলি হল—

১. ‘চাঁদ সদাগর’ (বৈকালী কাব্যে ১৯৪০ খ্রী: সংকলিত) — কালীদাস রায়

২. ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ (‘রূপসী বাংলা’ ১৯৬১ কাব্যের অন্তর্গত)

— জীবনানন্দ দাশ

৩. ‘বেহুলা-নাচানো স্বর্গ’ (‘মৃত্যুভীর্ণ’ ১৩৬২, কাব্যের অন্তর্গত) — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪. ‘বেহুলা’ (‘লখীন্দর’ ১৯৫৩, কাব্যের অন্তর্গত) — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫. ‘এবং লখীন্দর’ (‘আলেখ্য’ ১৯৫২-৫৮, ও শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্গত) — বিষ্ণু দে

৬. ‘লখীন্দর’, ‘বেহুলা’, ‘সনকা’, ‘চাঁদ সদাগর’ ও ‘মনসা’ (‘কৌটোর ইচ্ছেগুলো’ ১৯৬৪,

কাব্যের অন্তর্গত) — জিয়া হায়দার

৭. ‘বেহুলা’ (১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ‘অলিন্দ’ পত্রিকার ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত

এবং শ্রেষ্ঠ কবিতায় ১৯৭৫ খ্রী: সংকলিত) — সঞ্জয় ভট্টাচার্য

৮. ‘ও বেহুলা’ (শ্রেষ্ঠ কবিতার ১৯৯১, অন্তর্গত) — অরুণ মিত্র

৯. ‘হেতালের লাঠি’ (১৩৯০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজারে প্রথম প্রকাশ, পরে শ্রেষ্ঠ

কবিতায় ১৯৮৪, অন্তর্ভুক্ত হয়) — শঙ্খ ঘোষ

১০. ‘মনসা-মঙ্গল’ (‘অনন্ত ভাসানে’ কাব্যগ্রন্থে ও শ্রেষ্ঠ কবিতায় ১৯৯৫, অন্তর্ভুক্ত হয়)

— শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

১১. ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ (২০০৩)— উত্তম দাশ

১২. ‘বেহুলার ভেলা’ (রফিক উল্লাহ খান সম্পাদিত বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা ২০০৫ গ্রন্থে সংকলিত) — দীপঙ্কর মাহমুদ

১৩. ‘ডিঙা’ (শ্রেষ্ঠ কবিতায় ২০০৮ অন্তর্গত)— জয় গোস্বামী

১৪. ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ (একালের কবিতা সঞ্চয়ন কাব্যের ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত)।

আধুনিক বাংলা কবিতায় মনসা-কথার মিথ উঠে এসেছে একেবারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। মনসার চাঁদ সদাগর-সনকা-বেহুলা-লখীন্দর প্রভৃতি চরিত্রের ভাবনাগুলিকে নিয়ে কবিতা লিখিত হয়েছে অভিনব রীতি। আধুনিক ও উত্তর আধুনিক যুগের মানুষের জটিলতা, মূল্যবোধহীনতা, মানবিকতার অবক্ষয়, নিঃসঙ্গতা, আত্মসংকট, নারীর অবমাননা তুলে ধরতে গিয়ে কবিরা অবলম্বন করেছেন মনসামঙ্গলের মিথকে। আর এই সূত্রেই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নতুন ভাবনায়, নতুন প্রকরণে উঠে আসে মনসা-কথার মিথ। সেই সঙ্গে মনসামঙ্গলের চম্পক-নগরের অধিপতি, চাঁদ বণিকের হেতালের লাঠি, ডিঙা ও বেহুলার ভেলা অন্যায় প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসা-কথার নবনির্মাণ

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নব নির্মাণের ক্ষেত্রে যে উপন্যাসগুলি মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে নিয়েছি সেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান হল—

১. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৮৪)— সেলিনা হোসেন

২. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩)— অমিয়ভূষণ মজুমদার

৩. ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর’ (১৯৯৫)— অভিজিৎ সেন

৪. ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ (১৯৯৯) — সত্যপ্রিয় ঘোষ

মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে চাঁদ সদাগর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মনসারূপী অশুভ শক্তিকে দূরে সরিয়ে সত্যের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে চাঁদ। সেই সঙ্গে লখীন্দরও হয়ে উঠেছে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবাপুরুষ ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর’ উপন্যাসে।

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নবনির্মাণ

সর্বশেষে যে সমস্ত আধুনিক বাংলা ছোটগল্পগুলির মধ্যে মনসাকথার নবনির্মাণ ঘটেছে সেগুলি হল—

১. ‘বেহুলা’ (‘প্রমা’ ১৯৭৮ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ, পরে তাঁর ছোটগল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত)

— মহাশ্বেতা দেবী

২. ‘বেহুলা’ (১৩৯২ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)— বিমল কর

৩. ‘সতত বেহুলা’ (‘পরিকথা’ ডিসেম্বর ২০০৫, পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ, পরে ‘গল্প-৫০’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়)— সাধন চট্টোপাধ্যায়

মনসা-কথার বেহুলাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকারগণ। এই বেহুলা কখনো নদীরূপে, কখনো বাড়ির কাজের মেয়ে রূপে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার প্রৌঢ় নিঃসঙ্গ মানুষের বাঁচার অবলম্বন রূপেও উঠে এসেছে গল্পে। এইভাবে মনসা-কথার আধুনিক নবনির্মাণ ঘটেছে ছোটগল্পগুলিতে।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের যে আধুনিক রূপান্তর বা নবনির্মাণ বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে আজকের একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, সেই অন্বেষণের ফলই আমার গবেষণায় তুলে ধরেছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ এক শতক ধরে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথের যে প্রয়োগ, তা গদ্য-আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পে রচয়িতার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকরণের মাধ্যমে এই মিথীয় ভাবনাগুলি উঠে এসেছে। উক্ত আলোচনাগুলির মধ্য দিয়েই মনসা-কথার যে নবনির্মাণ আমার অনুসন্ধান উঠে এসেছে তার একটি ধারা স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছি।

প্রাক্কথন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর (২০০৮-২০১০) পড়াকালীন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। আর এই আগ্রহ বশতই স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষে ‘বিশেষ পত্র’ ছিল ‘মধ্যযুগের মঙ্গল আখ্যান ও অনুবাদ কাব্য।’ আধুনিক চিন্তাচেতনার বিকাশে ও পাঠকের চাহিদার প্রবণতায় মধ্যযুগের সাহিত্য আজও অত্যন্ত অবহেলিত থেকে গেছে। মধ্যযুগের সাহিত্য মানেই অনেকের কাছে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের চর্চিতচর্চণ। তবে কবির যেহেতু সমাজেরই মানুষ। তাই তাঁদের কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজের চিত্র উঠে আসবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত বাস্তব চিত্রও তুলে ধরতেন সেই চর্চিতচর্চণ কাব্যগুলির মধ্যে। তবে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের দলিল এই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতিই আমার বিশেষ করে ভালোলাগা জন্মায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুথির ইতিহাস ও পুথি সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচয়, সেই সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের ক্লাস নিতেন বিভাগীয় অধ্যাপিকা তথা আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নতুন নতুন ভাবনাগুলি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। আর সেই সময় থেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালোলাগা জন্মে অনেক বেশী। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় পুথির রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলির পুথির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। এই প্রত্যক্ষ স্বাদ ও গন্ধের মাদকতা থেকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হই। আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করতে শুরু করি এবং মনসামঙ্গল সম্পর্কে ধারণাগুলি আত্মস্থ করতে থাকি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলি নিয়ে আধুনিক সাহিত্য লিখিত হয়ে চলেছে নতুনভাবে। সেদিকটি ভাবতে শিখিয়েছেন প্রধানত আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁরই সান্নিধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নব নির্মাণ: ভাবনায় ও প্রকরণে’ শীর্ষক বিষয় নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করি। আধুনিক গদ্য-আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্য সংরূপ-এ মনসামঙ্গল কাব্যগুলির অন্তর্গত দেবী মনসা, চাঁদ সদাগর-সনকা, বেহুলা-লখীন্দর প্রভৃতি চরিত্র ও ভাবনাগুলি কীভাবে নতুন রূপ পেয়েছে, সেই সঙ্গে লেখকের ভাবনায় ও বিভিন্ন

সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকরণে কীভাবে মনসা-কথায় নবনির্মাণ ঘটেছে— তা অন্বেষণই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে ‘শীর্ষক গবেষণাটির সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে আমি বিষয়টির অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও আলোচনার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পরিণতি প্রাপ্তির কাজে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। গবেষণাপত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে আমাকে স্বাক্ষর করেছেন, যাঁর নিরলস সাহায্য ও সঠিক পরামর্শ দানে কোনদিন এতটুকুও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয় (বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) আমাকে এই বিষয়ে নানা মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম রইল। সেই সঙ্গে আমার বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদেরও আন্তরিক প্রণাম জানাই। গবেষণা কাজটি করতে গিয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আমি চিরঋণী, সেগুলির নাম করতেই হয়— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা, রাজগঞ্জ কলেজের গ্রন্থাগার, দি এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা), কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, ইসলামপুর মহকুমা গ্রন্থাগার। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহকর্মীবৃন্দদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া যাঁরা আমাকে গবেষণা কর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন— তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এছাড়া যাঁদের উপদেশ, সাহায্য ও আশীর্বাদ ব্যতীত আমার গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ হত না তাঁরা হলেন আমার বাবা আব্দুস সাত্তার, মা সাকিলা খাতুন, স্বশুর মহাশয় শুকুর মাহমুদ, শাশুড়ি মা রহিমা বেগম, ছোট দাদা সৌকত আলী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এঁদের সকলকেই জানাই আমার ভালোবাসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা। সর্বোপরি যাঁকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না, তিনি হলেন আমার চির সুখ-দুঃখের সঙ্গী আমার স্বামী ড. সৈয়দ মাহমুদ রাকিবুজ জামান (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বানারহাট কার্তিক ওঁরাও হিন্দি গভর্নেন্ট কলেজ, জলপাইগুড়ি) যাঁর ত্যাগ, ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং ক্রমাগত উৎসাহ দান আমার বিরাট প্রাপ্তি। যাদের কথা খুব যত্নের সঙ্গে বলতে হয়, তারা হল আমার স্নেহের, আদরের দুই পুত্র

সৈয়দ মানিউজ জামান ও সৈয়দ জীশান জামান। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা।
এছাড়া জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সহকর্মী, গ্রন্থাগারকর্মী ও শিক্ষাকর্মীদের সকলের কাছে
আমি কৃতজ্ঞ। সবশেষে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ লাভে যারা সাহায্য করেছে, তারা হল আমার
ভ্রাতৃপ্রতিম সুজিৎ রায় ও প্রসেনজিৎ দাস। তাদের প্রতি আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল।

তারিখ:

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

Magfara Begum
(মাগফেরা বেগম) 11/11/2019

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	১-৩
প্রথম অধ্যায় : মনসা-কথার মিথ	৪-১২
দ্বিতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার পরিচয়	১৩-৫০
তৃতীয় অধ্যায় : আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপ-এ মনসা-কথার পরিচয় সংক্ষেপ	৫১-৫৯
চতুর্থ অধ্যায় : আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যানে মনসা-কথার নবনির্মাণ	৬০-৬৭
পঞ্চম অধ্যায় : আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা-কথার নবনির্মাণ	৬৮-১১৯
ষষ্ঠ অধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণ	১২০-১৬৯
সপ্তম অধ্যায় : আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসা-কথার নবনির্মাণ	১৭০-২২৭
অষ্টম অধ্যায় : আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নবনির্মাণ	২২৮-২৪০
উপসংহার :	২৪১-২৪৬
গ্রন্থপঞ্জি :	২৪৭-২৬৪
নির্ঘণ্ট :	২৬৫-২৭১

ভূমিকা

প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি সাহিত্যশাখা হল মঙ্গলকাব্য। দেবমাহাত্ম্য প্রচারমূলক এই মঙ্গলকাব্যের একটি ধারা হল মনসামঙ্গল। জলা-জঙ্গলময়, নদীকেন্দ্রিক মনোরম প্রকৃতির এই বাংলায় সর্পের আধিক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে কল্পিত সর্পদেবীকে কেন্দ্র করে যে গালগল্প, তা লিখিত আকারে রূপ নেয়। আর এই লিখিত রূপ মনসামঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। এই সূত্রে বলা যায়— উনিশ শতকে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিকতার প্রভাব বঙ্গভূমিতেও এসে পড়ে। নবজাগরণের ফলে দেবতার থেকে মানবতাবাদই বড় হয়ে ওঠে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় ভাবনার পরিবর্তন। বিশ্বায়ন ও যান্ত্রিক সভ্যতার আগমনের ফলে তৈরী হয় সুবিধাবাদী সমাজ ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি ও মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আমূল পরিবর্তন আসে। আধুনিক সাহিত্যসংরূপ তথা গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির মাধ্যমে কবি-সাহিত্যিকগণ আত্মবিশ্লেষণ করেছেন, সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ শতকের শেষার্ধ্বে থেকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরার জন্য কোন কোন কবি-সাহিত্যিক হাত বাড়িয়েছেন বাঙালি ঐতিহ্যের দিকে। এই সূত্রে বলে নেওয়া দরকার যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গতানুগতিকতা ও পুচ্ছানুগ্রাহিতা দোষে দুষ্ট হলেও আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে যে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, কাব্য-কবিতা প্রভৃতি নতুন নতুন সাহিত্য-সংরূপের সৃষ্টি তার সলতে পাকানো হয়েছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে। বলাবাহুল্য, আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের শিকড় হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য। আধুনিক যুগে কবি সাহিত্যিকগণ মিথ তথা পুরাণ কাহিনীকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে দাঁড় করিয়েছেন। চর্যাপদকে কেন্দ্র করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’ (১৯২৩), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চর্যাপদের হরিণী’ (১৯৫৯), সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (১৯৮২), সাইমন জাকারিয়ার ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’ (২০০৭), ‘ন নৈরামণি’ (২০১০), ও ‘বোধিধ্বম’ (২০১০), শিবশিস মুখোপাধ্যায়ের ‘অসম্ভব গোল টেবিল’ (২০০২), ‘কাহ্ন’ (২০১০) প্রভৃতি রচনাগুলি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাধাকৃষ্ণ’ (১৯৭৬), দীপক চন্দ্রের ‘মন বৃন্দাবন’ (১৯৯৩) ও ‘যদি রাধা না হত’ (১৯৯৫) উপন্যাস রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমাবস্যার গান’ (১৯৭১), সেলিনা

হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ (১৯৮৪), ‘কালকেতু ফুল্লরা’ (২০০৭), অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩), সত্যপ্রিয় ঘোষের ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ (১৯৯৯), শচীন দাশের ‘নদীতরঙ্গের আয়না’ (২০০৯), মহাশ্বেতা দেবীর ‘ব্যাধখণ্ড’ (১৯৬৪), ‘কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাওঁর জীবন ও মৃত্যু’ (১৯৬৭), ‘বেনে বউ’ (১৯৯৪) প্রভৃতি উপন্যাস লেখা হয়েছে। এছাড়া শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৭৮), শিশিরকুমার দাসের ‘ভাঙুদত্ত’ (১৯৭৭), শেখর দেবরায়ের ‘মনসাকথা’ (২০০২) এবং মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও কবিতার সংখ্যাও অনেক। মনসামঙ্গল কাব্যকে নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পথ দেখিয়েছেন। মধ্যযুগীয় মোড়ক থেকে বেরিয়ে এসেছেন দেবী মনসা। কখনো প্রতিষ্ঠানিক আত্মসী শক্তির রূপে, কখনো কল্যাণময়ী রূপ আমাদের সামনে উঠে এসেছে। প্রাকস্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী হতাশাগ্রস্ত, অসহায়, স্বপ্নভঙ্গের শিকার নিঃস্ব মানুষ্যের শক্তির প্রতিভূ হয়ে ওঠে মনসাকথার বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী চাঁদ সদাগর। আবার উত্তর-আধুনিক যুগের অস্তিত্বের সংকটের জর্জরিত ও যৌন বুভুক্ষু যুবা পুরুষে পরিণত হয়েছে লখীন্দর। বেহুলা হয়ে উঠেছে বিশ ও একুশ শতকের প্রতিবাদী নারী রূপে। কোন অন্যায়, অশুভ শক্তিকে মেনে নিতে রাজি নয়। বঙ্গদেশের এই নারী স্বামী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন সবাইকে প্রয়োজনীয় ভাবে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করতে করতে আত্মত্যাগে বা আত্মবিসর্জনে ক্রমশ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক জীবনদীপ্ত সংগ্রামী মনোভাব উঠে এসেছে। মধ্যযুগীয় এই চরিত্রগুলি কালের গণ্ডি পেরিয়ে সব যুগের সব কালের চরিত্র হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মধ্যযুগের কালচেতন্য থেকে আজকের আধুনিক স্বদেশের মরা গাঙে অস্ত্র হয়ে উঠেছে চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি। আবার মনসামঙ্গল কাব্যকে গ্রহণ করে আধুনিক কালে গদ্য-আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা করেছেন ঠিকই, তবে সময়ের ব্যবধানের নিরিখে, স্থানভেদে, ব্যক্তিভেদে প্রত্যেক রচনাতে বিভিন্ন ভাবনা কাজ করেছে। আবার প্রকরণের দিক দিয়েও একটি রচনা অন্যটির থেকে আলাদা মাত্রা লাভ করে। বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে সাহিত্য সংরূপের এই অভিনব ধারার দিকটি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এয়াবৎ এ বিষয় নিয়ে সম্মানীয় প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর’ গ্রন্থে, বিশিষ্ট সমালোচক ও অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর মহাশয় ‘অনুসৃজনে মনসাপুরাণ’ প্রবন্ধে এবং সমালোচক জহর সেনমজুমদার তাঁর ‘মধ্যযুগের বেহুলা : নির্মাণ ও বিনির্মাণ’ প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে আলোচনায় নিজেদের যুক্ত করেছেন। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসা-কথার যে নবনির্মাণ সে বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা তেমনভাবে এখনো পাওয়া যায় না। এই বিষয়টিতে আগ্রহবশতই আধুনিক

সাহিত্য-সংক্রমে মনসাকথার যে নবনির্মাণ তা অন্বেষণই আমার গবেষণার মূল বিষয়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির আখ্যানভাগ ও চরিত্রসমূহের যে বিবর্তিত আধুনিক রূপ উনিশ শতকের প্রথম দশকে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বেহুলা’ (১৯০৭) গদ্য-আখ্যানটি থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পাই, এই নবনির্মাণের দিকটি পরিস্ফুট করার জন্য আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি বর্তমান অভিসন্দর্ভে। আধুনিক ‘বাংলা সাহিত্যে মনসাকথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে’ শিরোনামের গবেষণার বিষয়টিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য প্রথম অধ্যায়ের বিষয় হিসেবে মনসা কথার মিথকে নিয়েছি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসাদেবীর যে পরিচয় এবং তৎসঙ্গে যে চাঁদ সদাগর, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর স্বল্প পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাস পিপলাই, পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব এবং উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যকে আলোচনার অন্তর্গত করেছি। পরবর্তী চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়গুলিতে আধুনিক গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যে মনসাকথার নবনির্মাণ তার প্রবেশক রূপে রেখেছি তৃতীয় অধ্যায়টিকে। আধুনিক সাহিত্য সংক্রমে আমাদের আরাধ্য দেবী মনসার মিথের নবনির্মাণ কিভাবে হয়েছে তা তুলে ধরাই আমার গবেষণা কর্মের লক্ষ্য। আমার গবেষণা, অনুসন্ধান ও অন্বেষণের মধ্য দিয়ে ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসাকথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে’ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি পরবর্তী অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে।

প্রথম অধ্যায় মনসা-কথার মিথ

বাংলার লৌকিক দেবী মনসা। মনসা নাগমাতা। আবার উর্বরতার প্রতীক হিসেবে মনসাদেবীর পূজা লোকসমাজে আজও প্রচলিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অতিপ্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল কাব্য এই মনসাদেবীর পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বর্তমান অধ্যায়ে মনসা কথার মিথ আলোচনা করতে গিয়ে মিথ সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

মিথ কি করে গড়ে উঠেছে আদিমকালে, সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের অভিমত প্রকাশ করলেও, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে আদিম মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অনেক দুর্বোধ্য বিষয় এবং ঘটনার অন্তরালে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করত। এই সব শক্তির বিবর্তিত রূপই হল দেবতা, যাদের ক্রোধ নিরসন এবং মনতৃষ্টির জন্যে বিভিন্ন ধরনের আচার-বিধি পালন করা হত। এরই সূত্রে যেসব গল্প কালক্রমে গড়ে উঠেছে তাই রূপান্তরিত হয়েছে 'মিথ'-এ। এই সমস্ত আদিম ঘটনাগুলি সম্বন্ধে প্রচলিত ভাবনাসমূহ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে এবং তার উপরে মানুষের চলমান সমাজ ধারার প্রবাহ যে পলি সঞ্চিত করে গেছে সেগুলিই একটা সামগ্রিক মিথীয় ভাবনায় পরিণত হয়েছে।

গ্রিক 'Mythos' থেকে উৎপন্ন 'মিথ' শব্দটি। মিথ-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'পুরাকাহিনী' পাওয়া যায়। 'মিথ' থেকে 'মিথলজি' (Mythology) শব্দ তৈরী হয়েছে। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষায় আঠারো খানা পুরাণ এবং আঠারো খানা উপ-পুরাণ পাওয়া যায়। মিথ বা পুরাকাহিনী পৃথিবীর সব দেশে সব নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। মুখে মুখে রচিত হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা গল্পের আকারে প্রচলিত হয়েছে। পুরাকাহিনী লোকে বিশ্বাস করে এবং তা বিশ্বাসী সংস্কারের মধ্যে মিশে গেছে। সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্যে লৌকিক-অলৌকিক ঘটনাবলী সমন্বয়ে পুরাকথা গড়ে উঠেছে। মূলত আদিম সমাজ জীবনে বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কৌতূহল ও বিস্ময় নিবারণের জন্য ভয় ও আনন্দ মিশ্রিত অলৌকিক কাহিনী পুরাকথার জন্ম দিয়েছে। মিথ একটি বিশেষ সংস্কৃতি বলয়ের অন্তর্গত মানুষের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও বিশ্বাস। এর মধ্যে তাদের সংস্কারবোধ, বস্তু সম্পর্কিত ধারণা এবং অধ্যাত্মচিন্তার সংহত প্রতিফলন দেখা যায়।

নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও লিওলিথিক যুগে আনুমানিক খ্রী: পূ: ৭৬০০-৫৫০০ তে মিথের প্রবর্তন হয়। ধীরে ধীরে খাদ্যসংগ্রহের পর্ব ছাড়িয়ে মানব সভ্যতা যখন পশুপালন ও কৃষিকার্য শুরু

করে। জল, আগুন, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজাজাতীয় ক্রিয়া থেকে মিথীয় ভাবনা শুরু হয়।

সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত এই মিথ বলে অনেকে মনে করেন। আবার আদিম চিন্তা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত এই মিথ। মিথকে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর দাঁড় করিয়ে সমালোচক Lewis Spence বক্তব্য রেখেছেন, তা এখানে তুলে ধরা হল—

"Myth is a mode of scientific approach in connection with the imaginary explanations of natural phenomenon prior to the emergence of the Science proper."^১

অনেক সময় এই সমস্ত মিথে আদিপুরুষ প্রপিতামহদের কাহিনীগুলির সঙ্গে কল্পনা মিশে গেছে। ইলিয়াদ, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল। ক্রমে ক্রমে সেগুলোতে কল্পনার মায়াজাল মিলেমিশে নানা রঙে ভূষিত হয়ে দেবত্ব পরিণত হয়েছে। অনেক সময় এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, মানব থেকে তারা ক্রমে মহামানব আবার দেবতায় পরিণত হলেন। যেমন রাম, কৃষ্ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি পূজা পেতে লাগলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, পিতামহ বা আদিম পুরুষের কাহিনী যা আমাদের মজ্জায় মিশে গেছে তাকেই মিথ বলে। এরকম প্রাচীন মাত্রকেই মিথ বলে পোষণ করেছেন। অনেকে আবার বিশ্বভাবনার সঙ্গে যুক্তকে মিথ অভিহিত করেছেন। এই সূত্রে আমরা Joseph Campbell - এর উক্তিটি উল্লেখ করতে পারি—

"Myth is a large controlling image which give philosophic meaning to the facts of ordinary life, অথবা মিথ হল, symbolic of the spritual norm,"^২

মিথ সম্পর্কে বহু মতামত থাকলেও সহজ ভাবে বলা যায় মিথ হল প্রাগৈতিহাসিক গল্প, কল্পনার অতিশয়োক্তি নিয়ে গঠিত এবং দেবতার মহিমাঙ্গাপক এমন এক লোকপুরাণ যা কালক্রমে সার্বজনীনতা লাভ করে।

এবার আসা যাক মনসা কথার মিথ প্রসঙ্গে। এই সূত্রে বলা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ ও পশুকুলকে উৎপাদনের কাজে লাগানোর প্রয়াসে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার, বিশ্লেষণ ও জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষ কল্পনা করেছে বিভিন্ন দেবদেবীর। যেমন— মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, দক্ষিণ রায়, কালু রায় ইত্যাদি।

আদিকালে মানুষ সাপ, বাঘ প্রভৃতি জীবজন্তুকে ভয় পেত এবং তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান করত নানা রকমের। আবার কোথাও বিভিন্ন জীবজন্তুকে 'totem' (জীবক) রূপে গ্রহণ করত। যেমন প্রাচীন ভারতে প্রাগায় নাগজাতি নিজেদের নাগপূজারী ও নাগের বংশধর বলে মনে করত, যা প্রত্নতত্ত্ব বা গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই নাগপূজা উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে ভৌগোলিক অবস্থা ও জনবায়ুর কারণে সর্পের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিষধর সাপের পরিমাণও কম নয়, আর অনগ্রসর সমাজে সর্পপূজার প্রচলনও কম নয়। এখানে অস্ট্রিক জাতি অপেক্ষা দ্রাবিড় জাতির কাছে সর্পপূজার জনপ্রিয়তা বেশী। আবার এই পূজা অঞ্চল ভারতে অনার্য সমাজেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকেনি, আর্য জাতিকেও প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ঋক্বেদে, যজুর্বেদে সর্পদেবতার উল্লেখ রয়েছে। 'অশ্বলায়ন গৃহসূত্রে'র সর্পদেবী পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে নাগপঞ্চমী বলে খ্যাত।

এই মনসাদেবী অর্বাচীন পুরা-লোকগল্পে পাওয়া, প্রাচীনকালে যা পাওয়া যায় তা হল প্রক্ষিপ্ত অংশ। বলা হয় কশ্যপ ঋষির মন থেকে সৃষ্টি বলে সর্পদেবীর নাম 'মনসা'। আদিবাসীদের মধ্যেও এই 'মনসা' নামটি পরিচিত। ওরাওঁ, কুমি, হো প্রভৃতির মনসামন্দিরে মুরগি বলি দিয়ে থাকে। পূর্ব পাঞ্জাব, হরিদ্বার, দক্ষিণ ভারতে সর্পদেবীর মনসা মন্দিরে পূজা হয়।

প্রাচীনকালে মনসা দেবীর যে মূর্তি পাওয়া যায় তা দশম-একাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। এই সময় থেকেই সর্পের দেবীর পূজা আরম্ভ হয়। অপৌরাণিক যে পরমেশ্বরী মনসাদেবীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোকসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ হলেও ঋক্বেদের সময়ে 'ময়ূরী' সমষ্টিদেবতায়, পরে অঙ্গরা, আরো পরে 'বিষহরি' নামে খ্যাত হয়েছিল। ঋক্বেদের যে পতিহীন অথবা পতির অর্ধাঙ্গিনী পরমেশ্বরী দেবী, সে জলদেবী 'গৌরী' ও 'নামহারা' এই দুই মূর্তিতে প্রকট। এদের মিলিত রূপ হল মনসা।

বৌদ্ধ মহাযান মতে 'মহামায়ূরী' দেবী বিষনাশনের, আরোগ্যের এবং বিদ্যার দেবতা। তাদের মতে, আরও একটি বিষহরি দেবী আছেন, তাকে 'জাঙ্গুলী তারা' নামে অবহিত করেছেন। 'বৌদ্ধ সাধনমালা'র এই জাঙ্গুলী পরে মনসাতে পরিবর্তিত হয়েছে। মহাযান তন্ত্রে যে একশতটি দেবীর চিত্র, তা পরে মনসার মূর্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই জাঙ্গুলী পরে মনসার সঙ্গে মিলে যায়, তাই তার নাম হল জাঙ্গুলি। বাংলাদেশের মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার যে বিভিন্ন নাম— পদ্মাবতী, কেতকা, বিষহরি, জরৎকার প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে জাঙ্গুলি নামও পাওয়া যায়—

“জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।”^৩

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সর্পপূজা প্রচলিত ছিল। মিশরেও সর্পপূজা সুপ্রাচীন। প্রায় ছ’হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরে রাজকীয় শিরস্ৰাণ সর্পলাঙ্ঘিত। ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী প্রাচীন তুরাণী জাতির মধ্যেই নাকি প্রথম সর্পপূজা উদ্ভূত হয়। এই জাতির একটি শাখা ভারতে এসে দ্রাবিড় নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির দ্বারা যে সর্পদেবী পূজিত হন তাঁর নাম ‘মনসা’ বা ‘মণ্ডগাম্মা’। এই শব্দ থেকেই ‘মনসা’ নামের উৎপত্তি ঘটেছে। এঁর জন্মরহস্য জানতে গেলে অনেকে বলেছেন— শিবের মানস কন্যা। তাই অনেকে মনে করেন এই জন্যই দেবীর নাম হয়েছে মনসা।

পাল আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে বৌদ্ধ ধর্মের গৌরব নষ্ট হল। বৌদ্ধরা আত্মগোপন করে তাদের নিজস্ব আচার-আচরণ নিয়ে। দীর্ঘদিন ব্যাপী মহাযান বৌদ্ধধর্ম যে রাজানুগ্রহ লাভ করে আসছিল এবং লোকাযত সংস্কারের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছিল তার অবসান ঘটে। এর প্রমাণ নিহিত আছে বৌদ্ধতান্ত্রিক সর্পদেবী জাম্বুলীর নতুন রূপের মধ্যে। জাম্বুলী পরিণত হল মনসায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর ‘মনসাবিজয়’ গ্রন্থেও জাম্বুলী ও মনসাকে চিত্রিত করা হয়েছে অভিন্নভাবে। সেন আমলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের গতি অপ্রতিহত। সেখানে বাংলার লোকাযত সংস্কারের বেশ কিছু দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আনুকূল্য লাভ করেছিল উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

“সেন রাজাদিগের আনুকূল্যে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ভাস্কর্যের পুনরুত্থান হইলে স্থানীয় নানা লৌকিক দেবদেবীও পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করিয়া অভিজাতদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রয়াস পান। সেই জন্যই সেই যুগের বাংলার হিন্দু ভাস্কর্যের পূর্ব পরিচিত বহু নতুন দেবদেবী রূপ লাভ করেন। মনসা তাহাদের অন্যতম।”^৪

অর্থাৎ সংস্কৃতি সমন্বয়ের আবহাওয়া বাংলাদেশের ছিলই, ফলত পরিবর্তনও ঘটেছিল খুব দ্রুত গতিতে। বাংলার আদিম লোকাযত জনের উপাস্য সাপের দেবী পাল আমলের জাম্বুলী হিসাবে গৃহীত ও পূজিত হয় বৌদ্ধসাধনতন্ত্রে। এই দেবীই বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবক্ষয়ের পর্বে স্বরূপে স্বীকৃত হয় পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রে। ‘মনসা’ লৌকিক দেবীরই সংস্কৃত নাম। যে ভাবধারা ও পরিবেশে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পাশে লৌকিক দেবীর স্থান, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই লৌকিক দেব-দেবীও ব্রাহ্মণ্য ধর্মতন্ত্রে গৃহীত হয়। তাই এর মূলরূপটি লোকাযত মানসলোকেই প্রোথিত।

সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে কৌম সংগঠনগুলির মধ্যে বৈদ্য বা ওঝা শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যারা একপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে বশীভূত করত সাপকে। সঙ্গত কারণে সমাজেও এরা বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিল। ফলে, ক্রমেই এইসব ব্যক্তির সর্পবিদ্যা পুরোহিত বলে গণ্য হত কৌম সংগঠনগুলিতে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া, জলবায়ুও মৃত্তিকা সাপের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। ফলে এখানে সাপকে আবিষ্কার করতে হয়নি, জীবনযাত্রার প্রতি মুহূর্তে এর সাক্ষাৎ পেয়েছে মানুষ। ভৌগোলিক পরিমণ্ডল এবং সর্পভীতি সৃষ্টি করেছে। এ সম্পর্কে সমালোচক শ্রী তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর সম্পাদিত ‘সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ’ বইটির ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছেন—

“এই উর্বর কৃষিপ্রধান দেশের সীমান্ত দক্ষিণ ভিন্ন অন্য তিন দিক পাহাড়-পর্বত, মালভূমি ও অরণ্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালার নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা যে সব হিংস্র জীবজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে সেই সকল জীবজন্তুর মধ্যে সর্প অন্যতম। সর্পের অতর্কিতে দংশন ও ভীষণতম হিংস্রতা হেতু গৃহস্থের বিপদ সর্বাধিক এবং সর্প তাহার পক্ষে পরমভীতির কারণ। বাঙালীর পল্লীগৃহস্থের নিদারুণ সর্পভীতির ফলে সর্পের একটি দেবী পরিকল্পিত হইয়া তিনি বাঙলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপে এইদেশে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নামেও ছড়া রচিত হইয়াছিল।”

পৃথিবী আদিকাল থেকে মাতৃরূপে পূজিত হয়ে আসছে। আর এই মৃত্তিকাতেই বসবাস সর্পের, তাই মাটির সন্তান। শয্যাংপাদিনী এই ধারিত্রী মাতার সন্তানকে তাই প্রজনন শক্তির প্রতীক, উর্বরতা শক্তির প্রতীক বলে ধরা হয়। দক্ষিণাত্যের বিদর অঞ্চলে বিয়ের সময়-সাপের পূজা-আচার এবং বাংলাদেশের বীরভূমের শঙ্খ বণিকের ‘গাছবেড়া’ নামে মনসা দেবীকে পূজা করার কারণ হিসাবেও উল্লেখ করা হয় সাপের অত্যাশ্চর্য প্রজনন ক্ষমতাকেই।

সাপের পূজা সংক্রান্ত আলোচনায় পণ্ডিত মহলে এসেছে এই উর্বরতাবাদের কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে সাপের পূজা প্রচলিত লিঙ্গের প্রতীক হিসাবেও। এ প্রসঙ্গে ড. নীহারঞ্জন রায়ের বক্তব্য—

“সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির

পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব; এ তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোন না কোন রূপে সর্প পূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশের যে সব মনসাদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের ক্রীড়াসীন, একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।”^৬

সাপ মূলত পুং জনন ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। তবে শক্তিদেবীর সঙ্গে এর সমন্বয় ঘটেছে বাংলাদেশে। বিভিন্ন আদিবাসী ও সভ্য সমাজ থেকে আহৃত লোককথা ও লোকাচার ভিত্তিক উপাত্ত (data) বিশ্লেষণ করে উর্বরতাবাদ সম্পর্কিত আলোচ্যে সাপকে পুংজনন ইন্দ্রিয়ের প্রতীক বলে জানিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরাও। মনোবিদ এইচ.ব্রিকটন মিলারের কথায় নিম্নোক্ত উক্তিটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক—

"Male sexual symbols 'less easy to understand include fishes and above all the famous symbol, the serpent.'"^৭

এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন যে— বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক। কারণ উভয়ই উর্বরশক্তির প্রতীক। দক্ষিণাত্যে অশ্ব বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। সেই জন্যই অশ্বখ বৃক্ষের নীচে মাটি বা পাথরের নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়। অপুত্রক বা বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনা করে অশ্বখতলে নাগমূর্তি উপহার দেয়। অথবা নাগপূজা করে ১০৮ বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এর মাধ্যমে বৃক্ষ ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা fertility cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজক কোন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে কালক্রমে বৃক্ষ মধ্যে সর্পোপাসক বা বৃক্ষোপাসক কোন জাতির সংস্কৃতি একসাথে মিশে গিয়েছিল। সেই জন্য এক সময়ে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন ভারতের সর্বত্র দেখা গিয়েছিল। মনে হয়, সেই সময়ই বাংলাদেশে উক্ত বৃক্ষোপাসক জাতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে এদেশেও বিশেষ এক শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যেই সর্পের পূজা করার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই বৃক্ষের নাম মনসা বৃক্ষ। একে সংস্কৃতে স্মৃহী বৃক্ষ বলা হয়ে থাকে।

এই স্মৃহী বৃক্ষের বিষ প্রতিষেধক গুণ-আছে বলে আদিম সমাজে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠেছিল। আবার পৃথিবীর অনেক কিছুকেই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারত না আদিম মানুষ। তাই নিজেদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিজের মতো করে কল্পনা করত। বৃষ্টির প্রতীক হিসাবে সাপকে পূজা করতে থাকে, এই অভিপ্রায়ে যে বৃষ্টি উর্বরতা জাগায়। তাই বৃষ্টির প্রতীক হিসাবে উর্বরতার

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাপও।

ভারতীয় সংস্কারে যেভাবেই সাপের পূজা অঙ্গীভূত হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে আদিম ভারতীয় কৌমদের ভিতরের ভয় ও বিস্ময়ের দ্যোতনার মধ্য থেকে এর সৃষ্টি। কোথাও টোটম আকারে আবার কোথাও তা প্রচলিত পশুপূজা হিসাবে। পরবর্তীকালে সর্পকুলের মধ্যে অক্ষতিকারক সাপের সন্ধানও মেলে। যারা ঘুরে বেড়াত বাস্তুভিটার আশেপাশে। তাদের অনেক সময়ই পূর্বপুরুষদের সর্পশরীর রূপে কল্পনা করা হত। মঙ্গলার্থে এরা সন্তান সন্ততিদের বাড়ি পাহারা দিত বলে ভাবা হত।

একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে, অন্যদিকে উপকৃত হওয়ার আশায় তুষ্ট রাখতে পূজনীয় হয়ে ওঠে দেবী মনসা। এই সমস্ত পূজা প্রাচীন বাংলায় অনার্য জনগোষ্ঠী দ্বারা পূজিত; গ্রাম্য পূজা। যখন বৌদ্ধরা ‘যান’ তন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মের প্রসারে নেমেছিল, তখনই আচারতন্ত্র সমেত গ্রহণ করেছিল অনেক লৌকিক দেবীকেও। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হলেও সংস্কৃতি সমন্বয়ের সময় অস্বীকার করতে পারেনি, বৃহত্তর লোকায়াত ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণকে। তাই শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডালিনী, শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

বর্তমান ভারতে সর্পপূজার প্রধান তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়—

১. নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর সরীসৃপ মূর্তির পূজা বিশেষভাবে উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত।
২. দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্পপূজার আদর্শই প্রবল।
৩. বাংলাদেশে সর্পপূজার কেন্দ্রে আছে নারী-রূপী সর্পদেবী জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, মনসা ইত্যাদি নামে এর পরিচয়।

অবশ্য বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সর্প প্রতীক পূজার রীতিও প্রচলিত। এই প্রতীক হিসাবে কখনো ‘মনসার ঘাটে’ অঙ্কিত নানা আকৃতির সর্পফণা, কখনো বা ফণিমনসা সিঁজ গাছের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পূজনীয়া দেবতা হচ্ছেন দেবীমনসা। সর্পদেবতারূপে এই মাতৃকা-মূর্তির পরিকল্পনা বাংলার সর্পপূজার বৈশিষ্ট্য।

দেবী মনসাকে অনেক সময় সিঁজবৃক্ষে, ঘাটের প্রতিকৃতি বা সাপের প্রতিকৃতিতেও পূজা করা হয়। হাম বা বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পেতে গ্রামে-গঞ্জে সর্পদেবী মনসার পূজা হয়ে থাকে। কোন পূজায় সাপের দ্বারা আচ্ছন্ন এই দেবী, কোন জায়গায় সাপ বা পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাথায়

সাতটি কোবরা সাপের মূর্তিও পাওয়া যায়, আবার সন্তান আস্তিককে কোলেও মনসাদেবীকে পদ্মাসীন দেখা যায়। উত্তরপূর্ব ভারতে ‘হাজং’ সম্প্রদায়ের লোকেরা কানী দেবী বা অন্ধদেবী বলে প্রতিপন্ন করে কারণ সৎমা চণ্ডীর দ্বারা তার এক চক্ষু কানা হয়ে গিয়েছিল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগরকেও ‘চ্যাংমুড়ি কানী’ বলে সম্বোধন করতে শোনা যায়।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে অন্যতম পূজা হল বিষহরি বা পদ্মাবতী। কৃষিজীবী প্রায় প্রত্যেক পরিবারে মনসার থান পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গেও (বর্তমান বাংলাদেশ) মনসার পূজা বৃহত্তর আকারে দেখি। বাংলায় অনেক বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও মনসার পূজা হয়ে থাকে। আসামে ওঝাপালি (Oja-pali -- Musical folk theatre) সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মিথের উপর নির্ভর করে মনসাপূজা করে। মনসার পূজা অনেকসময় নাগ পঞ্চমীর দিন শ্রাবণ মাসে (July-August) হয়ে থাকে। সেই দিন বাংলার অনেক নারী ব্রত রেখে সাপের লেজে দুধ ঢেলে পূজা করে। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীই যে বাংলাদেশে প্রচলিত মনসার মাহাত্ম্যসূচক একমাত্র কাহিনী, তা নয়। মেয়েলি ব্রতকথায় মনসার মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া স্বতন্ত্র এক কাহিনী রচিত হইয়াছিল। মনসার ব্রত উদ্‌যাপন করে মেয়েরা এই ব্রতকথা বলে থাকে।

মনসা-কথার মিথ আমরা মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্যে সুন্দরভাবে পেয়ে থাকি। মহাভারতে বাসুকি কর্তৃক ভগিনী মনসার মুনি জরৎকারুর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া, সন্তান আস্তিক কর্তৃক বুলন্ত ব্যক্তিদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং রাজা জনমেজয়ের হাত থেকে নাগ সম্প্রদায়কে রক্ষা করা। পুরাণে আবার মনসার পিতা শিবের জায়গায় ঋষি-কশ্যপকে পাই। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় বিশেষ শক্তির অধিকারী হয় মনসা। মনসামঙ্গলের প্রথমাংশে আমরা দেখি মনসার জন্মকাহিনী, পিতৃগৃহে গমন, সৎ মা দেবী চণ্ডী কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়া, মনসার বিবাহ, চণ্ডীর ছলনায় সর্পসজ্জিত মনসাকে দেখে জরৎকারুর পলায়ন, শিব কর্তৃক মনসাকে বনে রেখে আসা, নেতার সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনার পরে মনসার সভ্য সমাজে পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টা, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, পরিশেষে বেহুলার দ্বারা পূজা পাওয়া, চাঁদের নমনীয় ভাব প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে সুন্দরভাবে পেয়ে থাকি।

পরিশেষে বলা যায় সর্পদেবী মনসার পূজা শুধুমাত্র বাংলা, আসাম ও বিহারের কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই পূজা গোটা ভারতবর্ষের লোকসমাজে পূজনীয়। মনসাদেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা দৃষ্টি ভঙ্গি আমরা আলোচনা করে দেখলাম, দেবী মনসার পূজা বাংলাতে সাধারণ লোকসমাজে হতে হতে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই লৌকিক দেবী ক্রমে সাধারণ সমাজ থেকে বৃহত্তর সমাজেও

পরিচিতি লাভ করে এবং দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে বহু গালগল্প তৈরী হয়েছে। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলে দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই গালগল্পগুলি অলৌকিক হলেও জীবন্তভাবে আমাদের সামনে উঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Spence, Lewis : An Introduction to Mythology (London, George G Harrap and Co.Ltd. first published 1921. the reverside press ltd Edinburge, Great Britain, p-128
২. Campbell, Joseph, Masks of God, Primitive Mythology, Viking press, N. York, 1959, p-136.
৩. Vipradasa's Manasa-Vijaya, Sukumar Sen, The Asiatic Society, 1, Park Street, Calcutta, P-xxxiv
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, পৃ. ২২৭
৫. 'সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ', শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলেজ স্ট্রিট, প্রথম মুদ্রণ-১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ: ২০১১, পৃ. ভূমিকা অংশের ii.
৬. 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ৪৮৯
৭. H.Chrichton Miller: Psycho-Analysis and its Derivatives', London Oxford University Press, Second edition-1945, p-164.

দ্বিতীয় অধ্যায় মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার পরিচয়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ আলোচনা করতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনসা-মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসাদেবীর পরিচয় কিভাবে পাই সেগুলির অনুসন্ধান প্রয়োজন। যা এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে আমি রেখেছি।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কিছু ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যের সন্ধান মেলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সব ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যকে ‘মঙ্গলকাব্য’ অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। ‘মঙ্গল’ অর্থাৎ কল্যাণ এবং কল্যাণের সঙ্গে মহাত্ম্যসূচক একটা সম্পর্ক যোজনা করে দেবদেবীদের মহিমা-কীর্তনের অভিপ্রায়ে রচিত হয়েছে বাংলা মঙ্গলকাব্য। আসলে দেবদেবীর মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে প্রধানত তাঁদের স্বেচ্ছাচারজনিত ভয়-ভীতির কারণে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কিছু পাওয়ার অভিলাষে। এসব অভিপ্রায়ে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বিশেষ কোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা দেবতার গুণকীর্তন করে এই ধারার কাব্যের সূচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা এবং খ্যাতি সম্পন্ন সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

“বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক এবং পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম, পূজা-প্রচার ও ভক্ত কাহিনী অবলম্বনে যে ধরনের সম্প্রদায়গত, প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য বলা হয়।”

তবে মঙ্গল কাব্যে সাধারণত হিন্দু-পুরাণ নির্ভর কোনো কাহিনীর আশ্রয়ে, বিশেষত, মানবভাগ্যের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কাহিনীর নায়ক একজন স্বর্গচ্যুত ব্যক্তি। তিনি অশেষ মানবিক গুণের অধিকারী। এইদিক থেকে একথা মনে করার কারণ আছে যে, মঙ্গলকাব্যে দেবতাদের আধিপত্য তাতে পরোক্ষত স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব সঞ্চার করে, কিন্তু এই হীন কূটকৌশলগত দৈবপ্রয়োগ দেবতার অধিকার বাড়ায় না, বরং মানুষেরই জয়গান হয়। সার্বজনীন মানুষের বিকাশ সাধনের জন্যেই, একথা বলা যায়, মঙ্গলকাব্যে কাব্যমূল্যও অটুট। বাংলাদেশ (অবিভক্ত বাংলা) রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংকট-সমস্যাজনিত পর্যায়ে মুখোমুখি হয়। এরূপ অবস্থায় বাংলার সামাজিক জীবনে লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মের যে সমন্বয় ঘটেছে তার ইতিহাস লক্ষ্য করি বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই স্বর্গ থেকে অভিশপ্ত হয়ে বৈদিক দেবদেবী মর্ত্যে মানবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচার হেতু। এখানে আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। সমন্বয় সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটের সময়। অনুবাদ সাহিত্যেও একইভাবে বৈদিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারের জন্য বাংলায় অনূদিত হয় সংস্কৃত মহাকাব্য।

নতুন ধর্মভাবনা, নতুন শাসনব্যবস্থা আসতে শুরু করল ঠিকই, মানুষ গ্রহণ করল ঠিকই, কিন্তু পুরাতন একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেনি। পুরাতনকে রূপান্তর করে নূতনত্বের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতনকে পুরাতনের মধ্যে সুন্দর-সামঞ্জস্য বিধান করে পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গেঁথে দিবার চেষ্টা করেছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে একদেহে লীন হয়ে আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয়।

মঙ্গল কাব্যগুলির আখ্যান-বিন্যাসে পুচ্ছানুগ্রাহিতা ও গঠন-শৈলীতে নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কোনো দেবদেবীকে অবলম্বন করে বহু কবি একই আখ্যান রচনা করে গেছেন। নতুনত্ব আনার কোনো সুযোগ নেই তথাপি যুগবৈশিষ্ট্য ও সামাজিক-আর্থিক-ধর্মীয় চিত্রগুলি পেতে মঙ্গল কাব্যের বিশেষ সহায়তা করে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান কাব্যগুলি হল—

১. মনসামঙ্গল
২. চণ্ডীমঙ্গল
৩. ধর্মমঙ্গল
৪. শিবমঙ্গল
৫. অন্নদামঙ্গল

এছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলি আমরা পাই যা মঙ্গলকাব্যধারাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখেছে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসা দেবীর মাহাত্ম্যসূচক মনসামঙ্গল সর্বাপেক্ষা প্রচার লাভ করেছিল। বাংলাতে তো বটেই, বাংলার বাইরেও প্রচার লাভ করেছে। পূর্ববঙ্গের কবি নারায়ণ

দেবের মনসামঙ্গল সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রচার লাভ করেছিল। এমনকি, এখনও আসামের লোকেরা নারায়ণদেবকে নিজ রাজ্যের কবি মনে করে। উত্তর বিহারেও ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের মধ্যকার বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বহুল প্রচলিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনীতে আমরা দুইটি ভাগ পেয়ে থাকি। একটি দেবখণ্ড অন্যটি মর্ত্যখণ্ড। স্থান-কাল-পাত্রভেদে পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় সংক্ষেপণ, বিস্তৃতি-গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন থাকলেও মনসামঙ্গলের একটি গতানুগতিক কাহিনী আমরা সব কবির কাব্যেই পেয়ে থাকি। আমাদের সকলের জানা থাকলেও পূর্ণাঙ্গ মনসামঙ্গলের কাহিনীটির একটি কাঠামো বা বিষয়সূচী এখানে তুলে ধরলাম—

কামুক শিবের বীৰ্য পদ্মপাত্রে স্থলিত হলে তা থেকে মনসার জন্ম ও যুবতীরূপ ধারণ, অচেনা মনসার কাছে শিবের রতি কামনা, পিতা-কন্যার পরিচয়, চণ্ডীর ভয়ে সসঙ্কোচে কন্যা মনসাকে গৃহে আনয়ন, মনসাকে দেখে চণ্ডীর রোষ ও পদ্মাকে প্রহার, চণ্ডীর হাতে পদ্মার চক্ষু নষ্ট। রুষ্ট পদ্মার বিষদৃষ্টিতে চণ্ডীর অচেতন্য হয়ে পড়া, শিবের অনুরোধে মনসা কর্তৃক চণ্ডীকে চেতনা দান, জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ, ভাগ্যের পরিহাসে স্বামী বিচ্ছেদ, সমুদ্র মন্থনে সৃষ্ট বিষপানে মহাদেবের চেতন্য হারিয়ে ফেলা, মনসা কর্তৃক চেতন্যদান, সৎমা চণ্ডীর ষড়যন্ত্রে দেবীর নির্বাসন ও পুরী নির্মাণ, কন্যা বিচ্ছেদের কাতর শিবের অশ্রু থেকে নেতার জন্ম, নেতাকে পদ্মার দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে দেবখণ্ডের সমাপ্তি।

এরপরে মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচারের সংকল্প দিয়ে মর্ত্যখণ্ড বা চাঁদ-সদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী শুরু। প্রথমে রাখালদের, পরে হোসেন-হাসানের মাধ্যমে পূজা প্রচার, চাঁদের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার ইচ্ছা, ধনন্তরী (শঙ্কুর গারুড়ী) বধ, চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণনাশ, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও পণ্য বিনিময়, চৌদ্দ ডিঙ্গা নিমজ্জন, লখিন্দরের জন্ম, চাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন, লখিন্দরের বিয়ের উদ্যোগ, লোহার বাসর নির্মাণ, বিয়ে, বাসরে সর্প-দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু। ভেলায় মৃত স্বামী নিয়ে বেহুলার যাত্রা, ঘাটে ঘাটে নানা সংকট, অবশেষে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছান, নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে দেবতাকুলকে তুষ্ট করে শিবের সুপারিশে পদ্মার মাধ্যমে স্বামীসহ ছয় ভাণ্ডরের জীবন ফিরিয়ে আনে, সেই সঙ্গে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরও। চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে এই সত্য করে বেহুলা-লখিন্দর দেশে ফিরে। ডোমের ছদ্মবেশে বেহুলা-লখিন্দরের বাড়িতে প্রবেশ, চাঁদকে বুঝিয়ে মনসার পূজায় রাজি করানো এবং মনসার মন্দির নির্মাণ ও মনসার পূজা প্রচারিত হলে বেহুলা-লখিন্দর রূপে উষা-অনিরুদ্ধ স্বর্গে গমন ইত্যাদির মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে মনসামঙ্গল কাহিনীর।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

১. পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা হলেন— ক. বিপ্রদাস পিপলাই, খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, গ. বিষ্ণুপাল।

২. পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা হলেন— ক. কানাহরি দত্ত, খ. বিজয়গুপ্ত, গ. নারায়ণ দেব, ঘ. দ্বিজ বংশীদাস, ঙ. ষষ্ঠীবর দত্ত।

৩. উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা হলেন— ক. তন্ত্রবিভূতি, খ. জগজ্জীবন ঘোষাল, গ. জীবন মৈত্র।

আমি বর্তমান অধ্যায়ে মনসামঙ্গলের কয়েকজন কবি ও তাদের কাব্যে মনসার পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টা, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ঘটনাধারার সঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কানা হরিদত্তকে পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলের আদি কবি তথা তাঁর পূর্ববর্তী কবি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ‘পদ্মাপুরাণ’-এর স্বপ্নাধ্যায় পালায় উল্লেখ করেছেন—

“সর্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য।

প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।”^২

মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘপাইং গ্রাম থেকে পাওয়া একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যে হরিদত্তের ভণিতায়ুক্ত কবিতা পাওয়া গেছে বলে তাকে পূর্ববঙ্গের কবি বলে উল্লেখ করা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার হরিদত্তের যে পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, তাতে মনসাদেবীর সর্পদ্বারা সজ্জিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। শঙ্খিনী সর্প দিয়ে দুই হাতের শঙ্খ, কালনাগিনীকে কেশের সজ্জা, সুতলিয়া নাগ দিয়ে গলার সুতলি, সিন্দুরিয়া সাপ দিয়ে সিঁথির সিন্দুর, কাজুলিয়া নাগ দিয়ে চোখের কাজল প্রভৃতি সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে দেবী মনসা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন হরিদত্তকে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি বলে উল্লেখ করেছেন— অর্থাৎ মুসলমান দ্বারা বঙ্গদেশ অধিকারের আগে হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে যখন গৌড়দেশের উৎসব, সাহিত্য এবং আমোদ-প্রমোদ সমস্ত আর্যদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল, সেই সময়ে হরিদত্ত তাঁর কাব্য রচনা করেন। শ্রদ্ধেয় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যটি নিম্নে তুলে ধরা হল—

“সম্ভবত: একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত

বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে যখন গৌড়দেশের উৎসব,

সাহিত্য এবং আমোদ-প্রমোদ সমস্ত আর্থাবর্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই
সময়ে সম্ভবতঃ হরিদত্ত তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন।”^৩

উক্ত তথ্যের নিরিখে আমরা বলতে পারি যে কানা হরিদত্ত প্রাক্ চৈতন্যযুগের মনসামঙ্গল
কাব্যজগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন এবং পরবর্তী কবিরা তাঁর কাব্যের দ্বারা প্রভাবিতও
হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে দেবী মনসার খুব বেশি পরিচয় না পেলেও দেবীর সাজসজ্জার পরিচয়
পাই। মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি হিসেবে কানা হরিদত্তের কাব্যের মনসার পরিচয় তুলে
ধরার চেষ্টা করলাম।

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় রাঢ় বঙ্গের কবি বিপ্রদাস পিপলাই। মনসামঙ্গলের এই প্রাচীন কবির
কাব্য ‘মনসাবিজয়’ নামে পরিচিত এছাড়া ‘মনসামঙ্গল’, ‘মনসাচরিত’, ‘পদ্মামঙ্গল’ নামের উল্লেখ
রয়েছে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে। কাব্যের অন্তর্গত প্রথম পালার ৪নং কবিতায় যে আত্মবিবরণী
দিয়েছেন, সেখান থেকে জানা যায় কবির পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত, নিবাস হল চব্বিশ পরগণা জেলার
নাদুড্যা বটগ্রাম (নাদুড্যা পাঠান্তরে মেলে বাদুড্যা)। বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে দেবী মনসা
কবির শিয়রে বসে কাব্য রচনার আদেশ দেন। দেবীর আদেশ পেয়ে গুরুজন ও পণ্ডিতজনদের
স্মরণ করে কাব্য রচনা শুরু করেন কবি কাব্যের কালজ্ঞাপক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, সেটি হল—

“সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।

নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।”^৪

প্রথম চরণটি থেকে আমরা পাই— ৭১৪১ = ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ + ৭৮ = ১৪৯৫ খ্রী:।
তখন হুসেন শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। ভাষাবিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার শ্রদ্ধেয় ড.
সুকুমার সেন বিপ্রদাস পিপলাই-এর রচিত কাব্য সম্পর্কে বলেছেন—

“মনসার কাহিনী সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বিপ্রদাসের কাব্যেই
মিলে। অন্য মনসামঙ্গল কাব্যে হয় কোন কোন আখ্যান মোটেই নাই,
নয় কোন কোন আখ্যান অপেক্ষাকৃত অল্পতর অথবা বৃহত্তর আয়তন
লইয়াছে। বিপ্রদাস ছাড়া সব কবি— যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে—
বেতলা লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়াছেন।”^৫

সমালোচকের এই বক্তব্য মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র বিপ্রদাসের কাব্যেই পাওয়া যায়। এখানে
আমরা মোট ১৩টি পালা পেয়ে থাকি। কাব্যে দেব-দেবীর চরিত্র; মনসা, শিব, চণ্ডী ও নেতা এবং

মানব চরিত্র —চাঁদো, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর, সন্ধ ধনুস্তরি, হাসন-হুসেন, জালু-মালু, ধনা-মনা
প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিয়ে কাহিনী ধারা এগিয়েছে।

বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়ে’র প্রথম পালায় আমরা গণেশ, নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
জরৎকারু নেতো এবং দ্বিজ গুরু-জনক বন্দনা করে মনসার জন্ম কথা বলেন। মনসাদেবীর নাগরূপ
বর্ণনা করে অর্থাৎ মনসার সপসজ্জার কথা বলে দেবীর বিভিন্ন নামের পরিচয় দেন। কবির ভাষায়
উঠে এসেছে—

“উদ্ভবা-পাতাল নাম পাতালকুমারী
নাগ-দান পাইয়া নাম হৈল নাগেশ্বরী।
কালিদহে পদ্মবনে হইল উতপতি
তথির কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী।
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারী
তথির কারণে নাম মনসাকুমারী।”^৬

মোট তেইশটি কবিতা নিয়ে রচিত এই প্রথম পালায় কবি নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের
বর্ণনা করে শিব-গঙ্গার কথা, দেবতা-অসুরের কথা বর্ণনা করেছেন। গঙ্গার সঙ্গে ধর্মের সাক্ষাতে
গঙ্গা ধবলমুখী হলে দেবতাগণ কর্তৃক গঙ্গার বন্দনা, গঙ্গার শিবের মাথায় স্থান প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে
সঙ্গে অতি দক্ষতায় মনসার জন্ম বিবরণ দেন। কালীদহে শিব মদন পীড়িত হন। পরিণামে তাঁর
বিন্দুপাত হয়। পদ্মপাতায় সে বিন্দু পড়ে, সেখানে থেকে জলে পড়লে পরে বাসুকির মা নির্মাণীর
মাথায় পড়ে। নির্মাণী তা দিয়ে পুতুল পানিয়ে তার মধ্যে প্রাণ দান করেন, নাম দিলেন পদ্মা। পদ্মাকে
বাসুকি বিষভাণ্ডারের অধিকারিণী করে দিলেন। এই পদ্মা কর্তৃক কালিদহ বিধবস্ত হলে শিব গরুড়কে
নিয়ে আসেন সাপ ধ্বংস করার জন্য। শিবের সঙ্গে মনসার দেখা হলে তাকে কামচিহ্নে দেখলে
দেবী নিজের পরিচয় দিয়ে পিতার সঙ্গে নিজের বাড়ি যেতে চান। কিন্তু দেবী চণ্ডীর ভয়ে মহাদেব
কন্যাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে না চাইলেও মায়াবশত শেষে ফুলের সাজিতে করে ঘরে নিয়ে আসেন।
দেবী চণ্ডীর সঙ্গে মনসাদেবীর কলহ বাঁধে। কবি বিপ্রদাস পিপলাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই চিত্রটি
তুলে ধরেছেন—

“মহাকোপে চণ্ডিকা লইল কুশাবাগ।
তার ঘায়ে মনসার চক্ষু হৈল কান।”^৭

পরে মহাদেব কন্যাকে সিজুয়া পর্বতে রেখে আসেন। সেখানে তাঁর ‘নেত্রের জল’ থেকে নেতো ও

‘ললাটের ঘর্ম’ থেকে ধামাই-এর সৃষ্টি হয়। দেবসমাজে ব্রাত্য মনসার করুণ অবস্থা কবি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় পালায় সমুদ্র মন্ত্রনের কথা বর্ণনা করে তৃতীয় পালায় কবি দেবী মনসার বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। মুনি জরৎকারুর সঙ্গে মনসাদেবীর বিয়ের পর সৎমা চণ্ডীর কুপরামর্শে নাগ আভরণে সজ্জিত হয়ে স্বামী সম্ভাষণে গেলে ভয় পেয়ে মুনি সমুদ্রে গিয়ে লুকোনেন। পরে অবশ্য মনসাকে পুত্র বর দেন। নেতোর বিয়ে দেন শিব বশিষ্ঠের সঙ্গে। বশিষ্ঠও নেতাকে পুত্রবর দিয়ে অন্যত্র চলে যান। চতুর্থ পালায় ৯ নং কবিতায় সর্পসত্রযজ্ঞের মাধ্যমে পুরাণ কথার (দেবখণ্ডের) সমাপ্তি ঘটান কবি বিপ্রদাস। এখানে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, জনমেনজয়ের ‘সর্পসত্রযজ্ঞ’ ও আন্তিক কর্তৃক সর্পসত্র নিবারণ। পরে উদ্দেশ্য সফল হলে সিজুয়া পর্বতে ফিরে যান।

এরপরে মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম কাহিনী নরখণ্ডের সূত্রপাত হয়। এই চাঁদ সদাগরের ধন-ঐশ্বর্যের কথার বর্ণনা আমরা প্রথমেই পাই—

“চম্পকনগরে ঘর চাঁদো অধিকারী
গন্ধবণিকের কুলে জনম তাহারি।
রাজচন্দ্রবতী রাজা রাজ্য বহুদূর
কুলে শীলে ধনে জনে বলে মহীশূর।
কুবের সমান ধন রত্নমণিময়।
অসংখ্য অমূল্য নিধি দীপ্ত অতিশয়।।”^৮

শিব-দুর্গার বরপ্রাপ্ত চাঁদ সদাগর কঠিন তপস্যার ফলে শিবের কাছ থেকে মহাজ্ঞান স্বরূপ ‘সিদ্ধির ঝুলি’ ও ‘শিরে জয়-নেত’ পান। বিপ্রদাসের কাব্যে আমরা দেখি দেবী চণ্ডী মনসা-শিবের দ্বন্দ্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মনসা ‘দুষ্টমতি’, দুরাচারী, দেবসভায় সর্বদা অপমানিত বলে চাঁদকে তাঁর পূজা না করার উপদেশ দেন। শিব ভক্ত চাঁদ সেই থেকে মনসা পূজা করে না। অন্যদিকে সিমুলা পর্বতে বসে নেতোর সঙ্গে যুক্তি করে মর্ত্যভূমিতে পূজা প্রচারের পরিকল্পনা করেন। নেতো খড়ি পেতে দেখে মহাজ্ঞানের অধিকারী চম্পকনগরের অধিপতি চাঁদ বণিকের পুজো আদায়ের কথা বলেন। দেবী পৃথিবী ভ্রমণে বেরোলে ‘ডাইনীবুড়ি’ সেজে রাখালদের সম্মুখে গিয়ে একাদশী ব্রতের জন্য কিছু দুধ চান। রাখালরা দেবীকে চিনতে না পেরে তাড়িয়ে দেয়। পরে দেবী নিজ রূপে আবির্ভূত হয়ে রাখালদের গর্তে পড়ে যাওয়া গরু উদ্ধার করে দেন। পরিবর্তে রাখালরা দেবীকে চুপড়ি ভর্তি দুধ দেয়। প্রসন্ন হয়ে দেবী ধন-সম্পত্তির আশ্বাস দিয়ে একটি গ্রাম বানিয়ে দেন রাখালদের। গ্রামের নাম দেন ‘রাখালগাছি’। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে জলভর্তি ঘটে ফল দিয়ে ‘দশহারা ব্রত’

করতে বলেন। এইভাবে রাখালদের মধ্যে মনসার পূজা প্রচারিত হয়। এরপরেই হাসান-হুসেনের সঙ্গে মনসা দেবীর দ্বন্দ্ব বাঁধে। হোসেন-হাসানের কৃষাণ গোরা মিঞা রাখালদের মনসাঘট ভেঙে দেয়। সপর্দাংশনে তুড়ুকরা মরতে লাগল। পরে দেবীর দয়ায় তুড়ুক পাড়ার বিপদ ঘুচল। হাসন তার এলাকায় মনসার মন্দির নির্মাণ করে। ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে সেখানে পূজা দিলেন। একইভাবে আমরা দেখতে পাই মুসলিম সমাজেও পূজা প্রচার হতে থাকে। পঞ্চম পালার শেষার্ধ্বে আবার দেবী চাঁদ বণিকের রাজ্যের দুই জেলে জালু-মালুর ঘরে স্বর্ণঘট নির্মাণ করে পূজো প্রচারের আয়োজন করেন ঘট করে। চাঁদের স্ত্রী সনকা ছয়পুত্রবধূকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ঘরে ফিরে এসে ঘট নির্মাণ করে পূজা করে। ভৃত্য নেড়ার মাধ্যমে উক্ত সংবাদ জানতে পেয়ে হেতালের লাঠি দিয়ে ঘট ভেঙে দেয়। চাঁদের এই দুর্ব্যবহারে দেবী ভয় পেয়ে নেতার সঙ্গে যুক্তি করে সনকার বোন মেনকা সেজে ছলনা করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে তার ‘নাখরা বন’ ধ্বংস করেন। পরে গোয়ালিনী বেশে (কমলা নাম নিয়ে) শ্রেষ্ঠ ওঝা ধনুন্তরির স্ত্রী কমলার সঙ্গে সই পাতিয়ে রাত্রিবেলায় ওঝার মৃত্যুরহস্য জেনে তাকে বধ করে। শিষ্যরা কথামতো নিজেদের বাঁচার ও চাঁদের বাঁচার উপায় স্বরূপ ওঝার দেহ টুকরো টুকরো করে বোট নানা স্থানে পুঁতে দিতে পারে না। মনসা চক্রান্ত করে দেহ জলে ভাসিয়ে দিয়ে পাতালে তা লুকিয়ে রাখলেন। সপ্তম অধ্যায়ে আবার দেখি মনসার বিষ দৃষ্টিতে ধ্বংস হওয়া চাঁদের অন্তঃপুরের চন্দনগাছ সুবর্ণ চেন্সড়ার লোভে ধনা-মনা জিইয়ে দিলে মনসা তাদের বধ করে। পরে ধনামনার মায়ের সখী সেজে জিইয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে দেবী পালিয়ে যান। সিজুয়া-পর্বতে এবং সেখানে নিজের সেবক করে রাখেন।

অষ্টম পালায় দেখা যায় মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ভাতের মধ্যে বিষ দিয়ে চাঁদের ছয় পুত্র নিধন করেন মনসা। ছয়পুত্রের মৃতদেহ সুঙ্গড়ির জলে ভাসিয়ে দিলে, শিবের মূর্তির বেশে চাঁদকে স্বপ্ন দেখান দেবী বাণিজ্য যাওয়ার জন্য। অন্যদিকে মনসা ইন্দ্রের সভায় গিয়ে অনিরুদ্ধ ও উষাকে মর্ত্যধামে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন দেবীর পূজা প্রচারের কারণে। স্বর্গের কামদেব ও রতির পুত্র অনিরুদ্ধ অভিষাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকার গর্ভে পুত্র লখীন্দর হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং বান রাজার কন্যা উষা মর্ত্যে উজানি-নগরের সায়বেনের ঘরে সুমিত্রার গর্ভে বেহুলা নামে জন্মগ্রহণ করে। সনকা যখন পাঁচ মাসের গর্ভবতী সদাগর তাকে গর্ভপত্র দিয়ে পাটনে বাণিজ্য যাত্রা করে। চাঁদ বণিক গন্ধেশ্বরী, সর্বজয়া, জগদল, সুমঙ্গল নবরত্ন, চিত্ররেখা, শশিমুখী প্রভৃতি সাতটি ডিম্বা নিয়ে বাণিজ্যে যান। এখানে কুমারহট্ট, হুগলি, ভাটপাড়া, কাঁকীনাড়া, মুলাজোড়, ভদ্রেস্বর, চাপদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, নিমাই-তীর্থ,

খড়দেহ, রিসিড়া, কোননগর, কামারহাটি, ঘুসুড়ি, চিতপুর, কলিকাতা, বেতড়, কালিঘাট, চুড়াঘাট, বারুইপুর প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি আজও আমাদের কাছে চিরপরিচিত। কালিঘাটের মন্দিরে কালিপূজা দিয়ে চুড়াঘাট হয়ে বারুইপুরে পৌঁছালে দেবী তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে থাকেন। কালীদেহে মনসা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে পুরী নির্মাণ করেন এবং হেমঘট স্থাপন করেন। মনসা প্রেরিত নাগকুলের তাণ্ডবে কালীদেহে ঝড়-তুষারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু চাঁদ কর্ণধারদের কথা না শুনে একাই দেবী ও তার অনুচর সর্পকুলের অত্যাচারের প্রতিরোধে নেমে পড়েন। এখানে চাঁদ সদাগরের মুখে কবি —

“চাঁদো বলে কর্ণধার দেখ বিদ্যমান
মোর ভয়ে পলাইল জত নাগগণ।
তুমি ত না জান ভাই আমার মহিমা
কানির পরাণে কি করিতে পারে আমা।”^৯

চাঁদ মনসার বিচিত্রপুরীতে ঢুকে হেতালের লাঠি দিয়ে পদ্মার ঘট ভেঙে মন্দিরের ধন-রত্ন নিজ ডিঙ্গাতে তুলে নেন। কাঁকদহ, হাজাদহ-জোঁকদহ, সাপদহ, কড়িদহ ও শাঁখাদহের পাশ দিয়ে চাঁদ সদাগর গিয়ে পৌঁছায় অনুপম পাটনে। সেখানে রাজার সঙ্গে মিত্রতা করে বুনা নারকেলের বদলে শাঁখ, হলুদের বদলে সোনা, ধুতির বদলে পাটজোড়, পাঁচকুমড়ার বদলে কাঁচপাত্র নিয়ে ডিঙ্গা ভর্তি করে দেশে ফিরার আয়োজন করে।

এরপরে আমরা দেখি সনকার গর্ভে লখীন্দরের জন্মের কথা। লখীন্দর গর্ভে থাকাকালীন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, জন্মের পরে অনুষ্ঠান, সোমাই পণ্ডিতের কাছ থেকে লখীন্দরের শিক্ষা শুরু হয়। এবং পরে লখীন্দরের অভিষেক হয়। মনসা সনকার রূপ ধরে চাঁদকে স্বপ্ন দেখিয়ে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করেন। পরে হনুমানকে দিয়ে চাঁদ সদাগর ও তাঁর সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে দেন। চাঁদকে বাঁচানোর জন্য দেবী তাঁর নাম লেখা বালিশ ও ভেলা পাঠালে চাঁদ তা গ্রহণ না করে হেতালের লাঠি দিয়ে বাড়ি মারে। পরে ধামাই নাগকে পাঠিয়ে চাঁদের হেতালের লাঠি কেড়ে নেন। আবার মনসা গৃহস্থ বধূর ছদ্মবেশে এসে চাঁদকে দেবীর পূজা করার কথা বলেন। মনসার কুচক্রান্তে চাঁদ নানা দুর্দশার মধ্যে পড়লেও সে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে ডাঙায় উঠে বারুইপুরে এসে পেটের দায়ে কাঠ বিক্রি করে। চৌতলে কলাচোপা খেয়ে প্রাণ বাঁচায় এবং ব্যাধদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। কালিঘাটে চোরের কবলে পড়ে, হুগলিতে এক ব্রাহ্মণের গরু দেখাশোনার দায়িত্ব পায়। শেষে ত্রিবেণীতে এসে পাঁচ দরবেশের হাতে মার খেয়ে চাঁদ বন্ধু চন্দ্রকেতুর রাজ্যে গিয়ে

প্রবেশ করে। কিন্তু বন্ধু চন্দ্রকেতু মনসার ভক্ত ও দেবীর পূজা করে, তা শুনে চাঁদ বন্ধুর বাড়ি ত্যাগ করে।

বিপ্রদাসের কাব্যে নানা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে চাঁদ উন্মত্ত পাগলের বেশে চম্পকনগরে প্রবেশ করেন। বিকৃতি আকারের চাঁদ ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে রাখালরা ভুল বলে গ্রামে রটিয়ে দেয়। চাঁদ বাঁচার জন্য তার প্রাসাদের মালিনী কাজলা রামার বাড়িতে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু কাজলা মালিনী ভয় পেয়ে চাঁদের গায়ে আগুন ছুড়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে চাঁদ নিজ প্রাসাদে গিয়ে কলা-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। ঝাউয়া দাসী ভুল সন্দেহে বাড়ির সবাইকে ডেকে আনে। উপায় না পেয়ে সনকার সামনে পরিচয় দিলে সদাগরকে সবাই চিনতে পারে। চাঁদ পুত্র লখীন্দরকে চিনতে পারে। রূপে-গুণে-বিদ্যাধর লখীন্দর অবিবাহিত জেনে পিতা তার বিয়ের আয়োজন শুরু করে। লখীন্দর বাসর ঘরে সর্পাঘাতে মারা যাবে জেনে বণিককুলের কেউ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয় না। দেবী মনসা সনকার মাসি সেজে চাঁদের বাড়িতে এসে সায়বেণের কন্যা বেহুলার সম্বন্ধ নিয়ে আসেন নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। দেবীর ভাষায়—

“উজানি সাহের ঘরে আছে তার কন্যা

বেহুলা তাহার নাম রূপে গুণে ধন্যা।”^{১০}

অন্যদিকে উজানি নগরের সরোবরে বেহুলা সখীদের সঙ্গে জলকেলি করতে থাকলে মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে আসে। বেহুলার পায়ের জল গায়ে পড়ার অজুহাতে অভিশাপ দেন বিয়ের রাত্রে বেহুলার বর মারা যাবে। পরিশেষে বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ে স্থির হলে বাসররাতে লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে জেনে বেহুলার মা সুমিত্রা বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করে। বেহুলা কিন্তু ‘ললাট লিখন’ বলে সবকিছু মেনে নেয়। তবুও সায়বেনে চাঁদ সদাগরকে মনসা পূজা করতে বলে। তার ফলে লখীন্দরের কোন মৃত্যু আশঙ্কা থাকবে না। প্রাণ গেলেও মনসা কানীর পূজা করবে না চাঁদ জানিয়ে দেয়। সনকাও লখীন্দরের বাসররাতে সর্পাঘাতে মৃত্যুর জন্য বিয়ে দিতে রাজি না হলে, চাঁদ সাঁতালী পর্বতে লোহায় বাসর-ঘর নির্মাণ করেন। সনকাকে চাঁদ আশ্বাস দেয় যে গুণবতী মেয়ে লোহার কলাই সেদ্ধ করেছে, সে নিশ্চয়ই স্বামীকে রক্ষা করতে পারবে।

বিপ্রদাস পিপলাই দ্বাদশ পালার নাম দিয়েছেন ‘জাগরণ পালা’ (সুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’ কাব্যের দ্বাদশ পালায় আছে ‘জাগরণ আরম্ভ’)। এখানে মনসাদেবী ভয় দেখিয়ে কর্মকারকে দিয়ে সুতোর মতো সরু ফুটো রেখে দেয়, যার মধ্য দিয়ে সাপ অনায়াসে সাপ প্রবেশ করতে পারে। এখানে আমরা দেখতে পাই উজানি নগরের উদ্দেশ্যে বরযাত্রী যাত্রা করলে

নাগকুলের তীব্র গর্জনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিবাহ চলাকালীন দেবী রথে চড়ে সমস্ত কিছু দেখতে থাকলে লখীন্দর চারিদিকে সাপ দেখে মুর্ছিত হয়ে পড়ে। চাঁদ সদাগর শোকে কাতর হয়ে পড়ে এই দুর্ঘটনার জন্য। এই অবস্থায় বেহুলা প্রাণ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করলে দেবী লখীন্দরের চেতনা ফিরিয়ে দেন। আর শেষে বিয়ের নানা রীতি-নীতি সম্পন্ন হলে চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে সাঁতালি পর্বতে রেখে সেনাপতি ও ধন্যন্তরী ওঝাকে পাহারায় বসায়। কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও মনসার প্রেরিত কালনাগিনী লখীন্দরকে দংশন করলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বেহুলা এখানে কালনাগিনীর লেজটুকু কেটে রেখে দেয়। চম্পকনগরে শোকের ছায়া নেমে আসে। সনকা পুত্র হারানোর জন্য স্বামীকে দোষারোপ করতে থাকে। পুত্র মারা গেলেও কানির সঙ্গে যে বিবাদ ঘুচেছে এই ভেবে চাঁদের মনে কোন অনুতাপ নেই। তবে বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যেতে চাইলে সদাগর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। সবার অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য করে স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে মনসা পুরীর দিকে রওনা হয়। পথে কাকের মাধ্যমে মায়ের কাছে নিজের আংটি পাঠিয়ে দেয়। সুমিত্রা পুত্রদের সঙ্গে করে এনে বেহুলাকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বেহুলা মায়ের অনুরোধ রাখে না। এরপর বিভিন্ন ঘাটে ধনাপুলা, গোদা, জনার্দন, জুয়ার প্রভৃতিদের দুর্ব্যবহারকে এড়িয়ে, গুধিনী-শকুনি, বাঘের হাত থেকে লখীন্দরের গলিত শবকে রক্ষা করে বেহুলা অবশেষে নেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। দেবী মনসা অবশ্য বেহুলাকে সাহায্য করেছেন এই দুর্গম পথে। মনসাদেবীর মন্ত্রণাদাত্রী নেতার সাহায্যে বেহুলা দেবপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে দেবতাদের সামনে লাস্যনৃত্য করে শিবসহ সমস্ত দেবতাদের তুষ্ট করে পুরস্কার স্বরূপ স্বামীকে জীবিত করার প্রস্তাব রাখেন। শিবের নাতনির পরিচয় দিয়ে শিবের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সে নিজেকে বাঁচায়। মনসা প্রথমে লখীন্দরের মৃত্যুতে সর্পদংশনের কথা অস্বীকার করলেও বেহুলা কালনাগিনীর কাটা লেজ দেখালে মনসা দুঃখে তার বারমাস্যা শুরু করে। চাঁদবেনের কাছে পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টায় তাকে যে কত অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তা বারমাস্যার মধ্য দিয়ে অতি করুণভাবে দেবসভায় ব্যক্ত করেছেন কবি। দেবতাদের অনুরোধে ‘নাগবাঁচা’ মন্দের সাহায্যে লখীন্দরকে বাঁচিয়ে তোলেন। সেইসঙ্গে বেহুলার ছয় ভাসুর ও শ্বশুরের সপ্তডিঙা মধুকরও ফিরিয়ে দেন।

সর্বশেষ পালায় অর্থাৎ ত্রয়োদশ পালায় আমরা দেখি-বেহুলার স্বামী-ভাসুরদের নিয়ে ফেরার পালা। দলপতি হিসাবে দুর্লভকে নিয়ে সাতটি ডিঙা আনে রামেশ্বর ঘাটে। আত্মীয়-পরিজন, ভৃত্য-দাসী সবাই চাঁদকে মনসাপূজার জন্য অনুরোধ করে। বেহুলা শ্বশুরকে পূর্ব জন্মের কথা বলে। দেবলোক থেকেই বেহুলা পদ্মার পূজারী। চাঁদের কারণেই অর্থাৎ চাঁদকে দিয়ে মনসাপূজা করানোর

জন্যই যে দেবলোকের বাণরাজার কন্যা উষা চম্পকনগরের বধূ বেহলারূপে এসেছে তা স্পষ্ট বলে। চাঁদ মনসার পূজা না করলে তারা সকলেই আবার দেবপুরে ফিরে যাবে তাও বলে। চাঁদ সগাদর শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সমস্ত পরিবারকে প্রাসাদে ডাকে মনসা পূজার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। চাঁদের মনসাপূজার চিত্র আমরা পাই সুন্দরভাবে—

‘ঘৃত দধি শর্করা নৈবেদ্য দশ ফল
নানা পুষ্প আনিল কমল শতদল।
ছাগল মহিষ মেঘে আনি শতে শতে
স্নান তর্পন রাজা কৈল বিধিমতে।
ছবি চিত্র আলিম্পনা দেখিতে সুন্দর
সিজের পল্লব দিল ঘটের উপর।
শুভক্ষণে দেব-দ্বিজ বন্দে সন্নিধানে
মন্ত্র পাড়ি শিক্ষা বান্ধে বিপ্রদাস গানে।।’^{১১}

মনসাদেবী যে দেবাদিদেব শিবের অংশ, হাতজোড় করে দেবীর স্তুতি করে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এই স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে চাঁদ সদাগরকে বর দান করে। দেবীর নামে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে শেষে লখীন্দরকে কোলে তুলে নেয় চাঁদ।

অন্যদিকে মনসা বেহলাকে পূর্বজন্মের কথা বলেন এবং সমস্ত কর্তব্য পূর্ণ হয়েছে জেনে মুক্তিলাভের কথা বলেন। বেহলা-লখীন্দরের শাপমুক্তি ঘটে স্বর্গে গমনের সময় ‘জুগিয়া-জুগিনি’ বেশে সায়-বেনের ঘরে বিদায় গ্রহণ করতে যায়। স্বর্গে ফিরে গেলে দেবতারা অনিরুদ্ধ-উষাকে পরীক্ষা করার জন্য দুজনের কাঁকালে ভারি পাথর বেঁধে অথই জলে ফেলে দেন। দেবীর কৃপায় সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আবার তাদের আগুনে ফেলে পরীক্ষা করেন। দেবী এই বিপদ থেকেও তাদের উদ্ধার করে। এইভাবে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে বেহলা-লখীন্দর অর্থাৎ উষা-অনিরুদ্ধ ইন্দ্রের সভায় স্থান পায়। সবশেষের কবিতাটিতে ‘অষ্টমঙ্গলা’ গীত হয়েছে। দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্র মনসাদেবীর পূজা প্রচার মর্মে কীভাবে হয়েছে তা জানতে চাইলে মনসা সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। অর্থাৎ সমগ্র মনসা কাহিনীর সারসংক্ষেপ মনসার মুখে বর্ণনা করেছেন কবি বিপ্রদাস পিপলাই।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা এবং বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে বিপ্রদাস

পিপলাই-এর মনসাদেবী সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছেন তা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন—

“বাংলা মনসামঙ্গলে মনসার চরিত্র অতি কঠোর ও নির্মম,— মাঝে মাঝে
ঘৃণ্য নীচতার ধার ঘেঁষিয়াও গিয়াছে। কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা
চরিত্রে একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই চরিত্রে করুণা ও স্নেহ-
মমতা সঞ্চার বিপ্রদাসের অন্যতম প্রশংসনীয় কৃতিত্ব।”^{১২}

আমরা দেখতে পাই হাসন-হোসেন পালায় হাসন দেবীর পূজা করলে দেবী তার প্রতি ব্যথিত হন
এবং মধুর স্বরে দয়া-স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেন। জন্ম থেকেই দেবী গৃহহারা, পদ্মবনে জন্ম, পিতার
সঙ্গে নিজের বাড়ি এলে সৎমা চণ্ডীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধে। যার ফলে হারাতে হয় একটা চোখ। দেব
সভাতেও তার কোন স্থান নেই, সকল দেবতা তাকে অবহেলার চোখে দেখে। সেই মনসা চম্পক
নগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব চাঁদ বণিকের কাছে পূজা পেতে গেলেও নানা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।
মর্ত্যভূমিতে পূজা আদায় করতে গিয়ে দেবীর রুঢ়তা, কঠোরতা প্রকাশ পেলেও কাব্যে দেবীর
অসহায় ও করুণাময়ী রূপও প্রকাশ পেয়েছে। বিপ্রদাস পিপলাই-এর ‘মনসাবিজয়’-এর তৃতীয়
পালায় দেবীর এক করুণ চিত্র পাই—

“পরিণু নাগের আভরণ।
ডরাইল ঋষির নন্দন।
সতাই হইল দুরবার
দেবপুরে করিল খাঁখার।
তাহে প্রবোধিব কি বলিয়া
কেন ঋষি না গেনু গোড়াইয়া।
জন্মিয়া নহিল কিছু সুখ
কতেক সহিব মন দুঃখ।”^{১৩}

শিবভক্ত চাঁদ চরিত্রের মধ্যেও একনিষ্ঠতা, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তার পাশাপাশি শেষে লৌকিক দেবী মনসা
যে শিবেরই কন্যা তা জেনে অনুতপ্ত হয়। শেষে নানা উপাচারে, যজ্ঞের মাধ্যমে মনসাপূজা দেয়।
চাঁদের মধ্যে বিনয়ী ভাব প্রকাশ পেয়েছে। বেহুলার পতিব্রতা, একাগ্রতা, সাহসিকতা, ধৈর্য্যশীলতার
দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। সবমিলিয়ে বলা যায় বিপ্রদাস পিপলাই-এর
মনসাবিজয়ের ‘দেবখণ্ডে’ পুরাণ প্রসঙ্গের বর্ণনা, সেখানে দেবী মনসার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন
সুন্দরভাবে এসেছে। তেমনি নরখণ্ডের চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের বিভিন্ন ঘটনাধারার

বর্ণনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি নিজে তাঁর কাব্যকে মনসার ব্রতকথা বলে উল্লেখ করলেও মনসামঙ্গলের এক নিটোল কাহিনী তাঁর কাব্যে পেয়ে থাকি আমরা।

বিজয়গুপ্তকে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পূর্ববঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত কবি হিসেবে পেয়ে থাকি। তিনি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন— মাতা রুক্মিনীর গর্ভে, পিতা সনাতনের ঔরষে। শ্রাবণ মাসের রবিবারে, রাতের তৃতীয় প্রহরে স্বপ্ন দেখেন কবি মনসা দেবীর। সেখানে দেবী তাকে আদেশ দেন কাব্য রচনা করার জন্য। দেবীর আদেশে তিনি ‘পদ্মাপুরাণ’ কাব্য রচনা করেন পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে। পদ্মপুরাণের রচনাকাল সংক্রান্ত একটি উদ্ধৃতি আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি—

“ঋতু [শ] শী বেদ শশী পরিমিত শক।

সুলতা [ন] হুসন রাজা পৃথিবীপালক।”^{১৪}

অর্থাৎ ঋতু-৬, শশী-১, বেদ-১, শশী-১ = ৬১৪১ অঙ্কস্য বামাগতিতে হয় ১৪১৬ শকাব্দ এবং ১৪১৬ + ৭৮ = ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলার হুসেন শাহের রাজত্বকাল। গল্পরস সৃজনে, করুণরস ও হাস্যরস প্রয়োগে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের পরিচয়ে, চরিত্র চিত্রণে, এবং পাণ্ডিত্য প্রয়োগে ‘পদ্মাপুরাণ’ জনপ্রিয় কাব্য।

মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুযায়ী বিজয়গুপ্ত দেবদেবীর বন্দনা দিয়ে তার কাব্য শুরু করেছেন। এরপরে ধারাবাহিক ভাবে চব্বিশটি পালা রচনা করেছেন। সেগুলি হল—

১. স্বপ্নাধ্যায় পালা
২. মনসার জন্ম পালা
৩. চণ্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ
৪. মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার
৫. পদ্মার বিবাহ
৬. বিচ্ছেদ পালা
৭. সমুদ্র মন্তন
৮. পদ্মার বনবাস
৯. রাখয়াল বাড়ীর পূজা
১০. কাজির সহিত যুদ্ধ

১১. গুয়াবাড়ি কাটা পালা
১২. মহাজ্ঞান হরণ
১৩. সঙ্কুর গাড়রি নিধন
১৪. ছয় কুমার বধ। ঝালবাড়ি পূজা
১৫. বরের পালা
১৬. অনিরুদ্ধ উষাহরণ ও যমযুদ্ধ
১৭. চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন
১৮. বস্তু বদল
১৯. বস্তু বদল পালা
২০. ডিপা বুড়ান, চান্দের অবস্থা ও লক্ষ্মীন্দ্রের জন্ম
২১. লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহের জুড়ানি
২২. লোহার বাসর গঠন
২৩. লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহ
২৪. লক্ষ্মীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান

বিজয়গুপ্ত তাঁর ‘পদ্মাপুরাণে’ স্বপ্নাধ্যায় পালার পরে মনসার জন্ম পালাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় শিব-পার্বতী-মনসা সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী।

পরম সুন্দরী অযোনীসম্ভবা কন্যা মনসা মহাদেবের মনসাকন্যা হিসেবে দেবগণে নাম রাখেন মনসা। অন্যদিকে পদ্মবনে উৎপত্তি বলে পদ্মাবতী নামে পরিচিত। আবার পাতালপুরীতে নাগিনীকন্যা রূপে জন্ম বলে বিষহরি নামেও খ্যাত। মনসার জন্ম পালায় আমরা দেখি পদ্মবনে মহাদেব মদনবাণে জর্জরিত হয়ে কামপ্রস্তুত দিলে লজ্জিত পদ্মা পিতার উদ্দেশ্যে বলে—

“আপনে সকল জান আমি বলিব কি।

বাপ হইয়া না চিনিলা আপনার কি।।

চরণে পড়িয়া আমি করি নমস্কার।

এমত কুশ্চিত কথা না বলিও আর।।”^{১৫}

পরে শিব নিজের ভুল বুঝতে পেরে কন্যা মনসাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলে, সৎমা চণ্ডীর আক্রোশের কবলে পড়তে হয়। মনসা তাকে নিজের দুঃখের কথা বললেও চণ্ডীর হাত থেকে নিস্তার পায় না। কবি বিজয়গুপ্ত মনসার মিনতি ভরা করুণ চিত্র বর্ণনা করেছেন এখানে— মা ভাই

ছাড়া দুঃখী এই মনসাকে পিতা মহাদেব সৎ-মা চণ্ডীর ভয়েই লুকিয়ে রেখেছিলেন। মা সন্মোদন করে মাটিতে দেহ রেখে পায়ে প্রণাম করেন তবুও দেবী চণ্ডী সদয় হননি। কবির ভাষায়—

“মা ভাই কেহ নাই মনে বড় তাপ।

তোমার কোপ দেখিয়া লুকাইয়া থুইল বাপ।।

... ..

চরণে পড়িয়া পদ্মা ভুমে দিল পাড়ি।

তথাচ দারুণ চণ্ডী পদ্মারে নহে এড়ি।।”^৬

হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও চণ্ডী মনসাকে অসহ্য প্রহার করে ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনসা কর্তৃক চণ্ডী প্রাণ হারান। পরে অবশ্য মহাদেব ও দেবগণের অনুরোধে চণ্ডী পুনরায় জীবিত হন। এখানে মনসার মঙ্গলীয় ভাব থেকে নাগিনী মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুনি জরৎকারের সঙ্গে মনসার মহাসমারোহে করে বিয়ে হলেও, কোন্দলের ফলে মুনি মনসার বিষে আক্রান্ত হন। এবং প্রাণ ফিরে পেলেও স্বামী তাকে ত্যাগ করে তপোবনে চলে যান।

মনসা ক্রোধান্বিত হয়েও মুনি তাকে ত্যাগ করতে চাইলে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং মুনি দেবীকে পুত্র বর প্রদান করেন।

“অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাজা পায়ে।

স্ত্রী লোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হয়ে।।

করুণা শুনিয়া কহে মুনি তপোধন।

তপ করিতে যাই আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।।’

... ..

... ..

আমার সন্তান হবে তোমার উদরে।

আস্তিক হইবে নাম জগত ভিতরে।।

তক্ষকের শাপ হইয়াছে অষ্ট নাগের তরে।

তাহারা আসি জন্ম হইব তোমার উদরে।।”^৭

দেবতাগণের সমুদ্র মন্ডন অংশে দেবী পদ্মাবতীকে আহ্বান না করলে ক্রোধে অমৃতকে গরলে পরিণত করে। আবার সেই গরল পান করে পিতা মহাদেব ঢলে পড়লে করুণাময়ী সর্বহারা নারীর কণ্ঠস্বর শুনা যায়—

“জন্মিল কমল বনে তুষ্ঠ হইল দেবগণে
সতাই করিল বিড়ম্বন।
আনি মুনির নন্দন মোরে কৈলা সমর্পণ
ছাড়িয়া গেলা মনি তপোবন।।
সতাই সঙ্গে বাদ হইল বাম চক্ষু কানা কৈল
সেই কথা ঘোষে সর্ব লোকে।
মোর সম দুঃখী জন আর নাহি ত্রিভুবণ
প্রাণ মোর যায়ে তোমার শোকে।।
দৈবে এত কৈল মোরে তাহে কেন বাপু মরে
কেন হেন করিলা নারায়ণ।”^{১৮}

অন্যদিকে পিতা নৌকস পর্বতে বনবাসে দিলে পিতৃবিচ্ছেদের কাতর হয়ে পড়েন মনসা—

“বাপ হইয়া বনে দিবা বল হেন বাণী।
কিরূপে রহিব আমি হইয়া একাকিনী
...
কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা হইলা অচেতন।
পদ্মার কান্দনে কান্দে দেব ত্রিলোচন।।”^{১৯}

ধীরে ধীরে মনসা নেতার যুক্তিতে মর্ত্যভূমিতে পূজা পাওয়ার অভিলাষী হন। যতিরূপে রাখয়ালদের কাছ থেকে পূজা আদায় করেন, হোসেন ও হাসান কাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করে পূজা আদায় করেন এবং শেষে দেবী মনসা চম্পক নগরের বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার জন্য অভিলাষী হয়ে ওঠেন। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান দুটি চরিত্র দেবী মনসা ও বণিক প্রধান শিব পূজারী চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কাহিনী ধারা এগিয়েছে এখানে। অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে মানবের লড়াই। সেই সঙ্গে সনকা, বেতলা-লখীন্দরের কাহিনী এসেছে। তবে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলে দেখি মনসার পূজা প্রচারই মুখ্য। তাই মর্ত্যভূমিতে পূজা প্রচারের জন্য চাঁদ সদাগরকে উদ্দেশ্য করেন। শিশুকাল থেকে মনসার পূজারী সনকা (পদ্মাপুরাণে সোনকা, সোনকা ব্যবহৃত হয়েছে) ঘট নির্মাণ করে দেবীর পূজা দিলে চাঁদ সদাগর হেতালের লাঠি দিয়ে সেই ঘট খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। দেবী ভীত হয়ে পড়েন এবং নেতার সঙ্গে যুক্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কবির ভাষায় উঠে এসেছে—

“দোহাতিয়া বাড়ি মারে ঘটের উপরে।

খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ঘরের ভিতরে।।

এত দেখিয়া পদ্মা পাইল বড় ডর।

পূজা এড়ি মন [সা] উঠিয়া দিল লড়।।”^{২০}

এরপরে ক্রোধে দেবী চাঁদের গুয়াবাড়ি ধ্বংস করেন, নটী বেশে ছলনা করে মহাজ্ঞান হরণ করেন। কিন্তু মনসা চাঁদের অটল, স্থির সংকল্পকে সরাতে পারেন না। এর ফলে মনসা সঙ্কর গাড়রিকে মারার সংকল্প করেন। নানাভাবে ছলনা করে শেষপর্যন্ত সঙ্কর গাড়রির স্ত্রী কমলার মাসি সেজে ওঝার মৃত্যু রহস্য জেনে নেন। ওঝার মৃত্যু হলে চাঁদ সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়েন। পরে আমরা দেখি বিজয়গুপ্তের কাব্যে চাঁদের ছয়পুত্র নিধনের পথে দেবী নিজেই গোয়ালিনী বেশে দই বিক্রি করতে আসেন। অপরিচিত গোয়ালিনীর কাছ থেকে দই নিতে সনকা নিষেধ করলেও পুত্রদের কান্না ও জেদের বশে দই কিনেন। ভাতের সঙ্গে দই খেয়ে ছয় পুত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছয় পুত্রের হারানোর মর্মভেদী শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সনকা। মহাজ্ঞান হরণ থেকে শুরু করে ছয় পুত্র নিধন সমস্ত পরিকল্পনাই চাঁদের শক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে করেন মনসা। এই সমস্ত মর্মান্তিক ঘটনায় বিলাপ করলেও শিবভক্ত চাঁদ মনসা পূজার জন্য রাজী হননি। সোমাই পণ্ডিতের নির্দেশে কলার মান্দাসে করে ছয় পুত্রের মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও সনকার কান্নায় শোকের ছায়া নেমে আসে চাঁদের বৃহত্তর প্রাসাদে। সনকা পুত্রদের হারিয়ে গভীর অরণ্যে অবিরাম কেঁদে বেড়ান। বিজয়গুপ্তের কাহিনীতে এরপর ধীবর জালু-মালুর প্রসঙ্গ রয়েছে। জালুর মাকে স্বপ্ন দেখান দেবী, তাদের জালে সুবর্ণ ঘট হিসেবে ধরা দিয়েছেন এবং প্রচুর ধন-সম্পত্তি দান করেন। এই জালু-মালু মনসার ঘট নির্মাণ করে, যেখানে সনকা ছয় বিধবা পুত্রবধূ ও সোমাই পণ্ডিতকে নিয়ে মনসা পূজা করেন। মনসা সন্তুষ্ট হয়ে সনকাকে পুত্র বর দেন। কিন্তু সেই পুত্রকেও উটানিতে বা অন্নপ্রাশনে বা চূড়া অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে নিতে চান মনসা। সনকা শেষে কায়দা করে বিয়ের রাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন এবং মনে মনে স্থির করেন পুত্রের বিবাহ দিবেন না। এরপর মনসা দেবসভায় গিয়ে শিবের কাছ থেকে বান রাজার কন্যা উষা ও কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধকে মর্ত্যে আনার ব্যবস্থা করেন নিজের পূজা প্রচারের জন্য। চম্পক নগরে সনকার গর্ভে লখীন্দ্র রূপে অনিরুদ্ধ ও উজানিনগরে সায়েবনের ঘরে সুমিত্রার গর্ভে জন্ম হয় উষার বেহুলা নামে। তবে দেব সভায় মনসার এ হেন আচরণ যে মোটেই পছন্দসই নয়, তা উঠে এসেছে অতি নিপুণ হাতে। উষা, অনিরুদ্ধ যখন নাচে গানে দেব সমাজে আনন্দের আবহ সৃষ্টি করেছিল, মনসার আকস্মাৎ দেবসভায় প্রবেশকে

নিয়ে দেবতাদের ভাবভঙ্গি কবি বিজয়গুপ্ত খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

“দেখিয়া সকল দেবে মাথে দিল হাত।

না জানি সভাতে আজি কি হবে প্রসাদ।।

... ..

বাপের অনাদরে পদ্মার স্থির নহে মন।

সভা মধ্যে নিজ মূর্তি হইলা তখন।।”^{২১}

চাঁদ দক্ষিণ পাটনে যান ছয় পুত্রের মৃত্যুর পরে। গর্ভবতী সনকা সমাজ সম্পর্কে নানা আশঙ্কা প্রকাশ করলে চাঁদ সদাগর স্ত্রীকে অভয় দান করেন। শেষে চাঁদ স্ত্রীকে গর্ভপত্র লিখে দিয়ে দক্ষিণ পাটন যাত্রা উপলক্ষ্যে মনসা ছাড়া সব দেবদেবীর পূজার্চনা করেছেন।

নানারকম দ্রব্যে চৌদ ডিঙ্গা মধুকর গঙ্গাচরণ, সিন্দুর কাটুয়া-হাসমড়া-মগর-ধুতুরার ফুল-গৌরাঙ্গ-সমুদ্র-উথাল-সুমদ্র বহাল-সঞ্চুচর-গরুড় মহারথী-সিংহমুখ-চন্দ্ররেখা প্রভৃতি) সাজিয়ে যাত্রা শুরু করেন। ধনার কথানুযায়ী বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ দক্ষিণ রাজ্যে যাত্রা করা মনস্থ করেন। যেখানে ‘সোনার কাঁচি দিয়ে দান্তালে ধন দায়ে’ এবং ‘হীরামন মাণিক্য’ রৌদ্রে শুকায়। দক্ষিণ রাজ্যে যাত্রা শুরু করে কালীদহের সমুদ্র পেরিয়ে লবনাস্থ সমুদ্র এড়িয়ে জম্বুদ্বীপ সাগরে পড়ে। সেখানে জোক ও সঙ্কের ত্রাসকে দূরে ঠেলে আরো কিছুটা এগিয়ে মনসার পুরী দেখতে পান। সেখানে কৈবর্তের মুখে ধূপ দীপ দিয়ে মনসা পূজার কথা শুনে ক্রোধে চাঁদের দুই চোখ থর থর করে কাঁপে। হেতালের লাঠি দিয়ে মনসার পুরী ভেঙ্গে ফেললে দেবী মনসার মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা ও পূজা পাওয়ার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। কবির ভাষায় আমরা পাই—

“ঘরে থাকি পদ্মাবতী চাহে ব্রুদ্ধমতি।

বানিয়া কুলেতে আমি রাখিবম খ্যাতি।।

বানিয়ার না রাখিব বিচের বাইগন।

এহার প্রতিফল আমি দিব এইক্ষণ।।

... ..

‘না পুজিলে ধনে জনে সাগরে করি তল।

এতেক ভাবিয়া পদ্মা অন্তরে বিকল।।”^{২২}

দক্ষিণ পাটনে পৌঁছে সদাগর নারকেল সহ নানা দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে রাজাকে সন্তুষ্ট করেন। রাজার সঙ্গে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পুনরায় আসবেন বলে বিদায় নেন। এখানেও চাঁদ

সমস্ত দেবতার পূজা করলেও বিষহরীর পূজা করল না। মনসা ত্রুন্ধ হয়ে জানাল যে তাঁর পূজা না করলে সদাগর চম্পক নগরে ফিরে যেতে পারবেন না। চাঁদ এর প্রত্যুত্তর দেন যে, মনসাদেবী শক্তিবলে যদি চাঁদ সদাগরের অমঙ্গল সাধন করতে পারেন, তাহলে কেন নিজের কানা চোখ সারিয়ে তুলতে পারেন না? এখানে চাঁদের সঙ্গে মনসার সরাসরি সংঘাত শুরু হয়েছে।

চাঁদের বিদ্রূপে দুঃখিত, ব্যথিত মনসা নেতার পরামর্শ মতো পিতা শিবের সম্মতি আদায় করেন তাকে ধনে জনে ডুবিয়ে দুর্গতি করার। গঙ্গা ও ঐরাবতের সাহায্যে কালীদহের জলে চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর নিমজ্জিত করেন দেবী। ধনজন সমস্ত গঙ্গার কাছে গচ্ছিত রেখে চাঁদকে কূলে তুলতে ব্যস্ত হন। তবে সাতদিন সাতরাত্রি জলে ভেসে থেকে বিবসনা চাঁদ কূলে উঠেই মনসার কুকর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। তার দেওয়া নেতের কাপড় ছুড়ে ফেলেন এবং প্রথমে দেব মহেশ্বরের ভজনা করে বাবকের অন্ন খাবেন বলে স্থির করেন চাঁদ। জাতি-নাশের ভয়ে মনসা সেই অন্ন সরিয়ে দেন এবং চাঁদের পাওয়া কলার বাকলও সরিয়ে ফেলেন। ক্ষুধার্ত চাঁদ তার এই দুর্দশার জন্য মনসাকে দায়ী করে ত্রুন্ধ হন। পরে ক্ষুধার তাড়নায় কাঠ বিক্রি করতে গেলে, সেই কাঠ সর্পে পরিণত হয়, ফেরৎ দিতে হয় কুমোরের বউ-এর চার পণ কড়ি এবং কুমোরের হাতে বেদম প্রহার খায়। এত দুর্গতির পরেও ক্ষুধায় হীনবল চাঁদ নগরের জগাই মণ্ডলের ধান নিড়ানোর কাজে নিযুক্ত হন দু'মুঠো ভাত পাবার আশায়। কিন্তু দেবীর মায়াজালে ঘাস না কেটে ধান গাছ কেটে ফেলেন কাঁচি দিয়ে।

চাঁদ সদাগর বনের মধ্যে কাঠ ভাঙতে গিয়ে পাকা কাঠাল পেয়ে খেতে গেলে মনসার কপটে কাঠাল ভিঙ্গুলের বাসা হয়। কবি বিজয়পুণ্ডের ভাষায় উঠে এসেছে—

“কাঁঠাল পাইয়া চান্দো মনে বড় আশা।

মনসার কপটে হইল ভিঙ্গুলো বাসা।।

শিব পূজা করি চান্দো কাঁঠাল খাইতে চায়।

নাকে মুখে চৌক্ষে তারে ভিঙ্গুলে কামড়ায়।।”^{২৩}

এইভাবে দেখা যায় চম্পক নগরের ঐশ্বর্য্যশালী বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদ চরম দুর্দশার মধ্যে অভুক্ত অবস্থায় দিন যাপন করতে থাকেন।

অন্যদিকে আমরা দেখি চাঁদের পত্নী সনকার সাধভক্ষণের বিভিন্ন আড়ম্বর। চম্পকনগরে লখীন্দরের জন্ম ও উজানি নগরে বেতুলার প্রসঙ্গ। এই সময় চাঁদ মিতার সাক্ষাৎ পেয়ে তার সহায়তায় দোলায় করে বাড়ি ফেরার রাস্তায় অষ্টনাগের প্রহার খান। ভূমিতে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে যান। চোখের দৃষ্টি হারিয়ে নিজ রাজ্যের লোকজনকে চিনতে পারেন না। পরে সদাগর শ্রীকলার হাটে

ভিক্ষাবৃত্তি করতে থাকেন।

এদিকে চম্পকনগরে সনকা চাঁদের দুর্দশার স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে। লখীন্দরের হাতে হেতালের লাঠি পেয়ে স্বামীর জীবনাবসান হয়েছে বলে সোমাই পণ্ডিতকে দিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। শ্রাদ্ধের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য রতি ধাই শ্রীকলার হাটে বাজার করতে গেলে, চাঁদ দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে রতি ধাই-এর সাথে নিজ বাড়িতে এসে পৌঁছান। রতি ধাই খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে বললে চাঁদ পুষ্পবন দেখে আনন্দিত হন এবং সেখানে গেলে চোর ভেবে কোতোয়ালরা তাকে মারধর করে। পরে রতি ধাই তাকে চিনতে পেরে ভাত খেতে দেয়। এই পরিস্থিতিতে নেতা মনসাকে স্মরণ করিয়ে দেয় রতির অন্ন খেলে চাঁদের জাতি যাবে এবং মর্ত্যলোকে কেউই দেবীর পূজা করবে না। নেতার উক্তি—

“চান্দোর দিব্যচক্ষু যদি এখন না দেও।

মর্ত্য লোকে তোমারে না পূজিব কেও।।

এতেক শুনিয়া পদ্মা নেতার উত্তর।

হাতে জল দিয়া ছান্দা ভাঙ্গিল সত্তর।।”^{২৪}

চাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে সবাইকে চিনতে পারেন এবং রতিকে তিরস্কার করেন ভাত দেওয়ার সাহসে। সনকা প্রথমে স্বামীকে চিনতে না পরলেও পরে বুঝতে পারে এবং নারীগণের জয়ধ্বনিতে চাঁদসদাগরের প্রাসাদ মেতে ওঠে।

নিজের বাড়ি ফিরে এসে চাঁদ পুত্র লখীন্দরের খবর জানতে পেরে পিতৃগৃহে তাকে কাছে টেনে নেন। ছেলের বিয়ে দিবেন বলে স্থির করেন। পরদিন সকালে পাত্রমিত্র ও সোমাই পণ্ডিতকে ডেকে পাঠিয়ে শুভক্ষণ স্থির করতে বললে সনকা শঙ্কিত ভাবে জানায় যে, মনসার বরপ্রাপ্ত লখীন্দরের বিয়ে দিতে সে রাজি না। বাসররাতে সাপে দংশন করবে বলে জগৎগৌরী মা মনসা জানিয়েছেন। কিন্তু শিবশঙ্কু পূজারী মনসা বিদেবী চাঁদ এই বক্তব্যকে তোয়াক্কা না করে বরং প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ান। সনকাকে অভয় দান করেন। পাত্রী খোঁজার পালা চললে সোমাই পণ্ডিত দেবী দশভূজার পুত্রতুল্য সায় সদাগরের সুন্দরী কন্যা বেহুলা সঙ্গে লখীন্দরের বিয়ে দিতে বলেন। চাঁদ পাত্রমিত্র পুরোহিত নিয়ে সায়বেনের ঘরের দিকে রওনা দেন। উজানিনগরের ‘মুক্তাসার’ সরোবরের পাশে অবস্থান করে। এই সময়ে পদ্মার ছলনায় বেহুলা ‘মুক্তাসার’ স্নানে যেতে চায়। মাতা সুমিত্রা অনুমতি না দিয়ে বরং তিরস্কার করে। কিন্তু পিতার সায় পেয়ে বেহুলা মুক্তাসারে যায়। এখানে চাঁদ স্নানরত বেহুলাকে দেখে উৎফুল্লিত হয়। মনসা এখানে ব্রাহ্মণীর বেশে মুক্তাসার সরোবরের ঘাটে অবস্থান করে বেহুলা

পায়ের জল শরীরে পড়েছে বলে বিয়ের রাতে স্বামী মারা যাওয়ার অভিশাপ দেন। নাছোড়বান্দা বেহুলাও ভাগ্য বিচারের জন্য ডুব দিয়ে শঙ্খ-সিঁদুর তুলে শেষে পদ্মাবতীর মন্দিরে গিয়ে পূজো দেয়। বেহুলা আবার ‘মরা সউল’ জীবিত করে দিলে চাঁদ সদাগর লখীন্দরের উপযুক্ত কন্যা বলে স্থির করে। গণকেরা বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ের দিনে স্থির করতে না পারলে নেতা নারদ মুনিকে গণকরূপে পাঠালে বিয়ের দিন স্থির হয়। সায়বেনের অনুরোধে সদাগর আহারে রাজি হলে লোহার কলাই সিদ্ধ করার কথা বললে বেহুলা লোহার সিদ্ধ করে চাঁদকে কর্মনিপুণতার জোরে মুগ্ধ ও আনন্দিত করে তোলে। এদিকে মনসা সনকার মাসির ছদ্মবেশে এসে লখীন্দরকে অভিশাপ দেয় বিয়ের রাতে কালসাপ দংশন করবে বলে। চাঁদ মনসা অনুমান করে হেতালের লাঠি নিয়ে পিছু পিছু যায়—

“কোপ মনে গেল চান্দো কোথা গেল বুড়ি।

পদ্মার প্রাণ কাঁপে যেন কলার বাগুড়ি।।

তর্জিয়া গর্জিয়া চান্দো হেতাল বাড়ি লাভে।

সভ্রমে পলায়ে দেবী সোনকার আড়ে।।”^{২৫}

লখীন্দরের বিয়েতে বাঁধা আসলে এবং মনসার অভিশাপে সনকা ভয় পেলে চাঁদ সদাগর লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেন। যেখানে বায়ু চলাচল করতে পারবে না, একটা পিঁপড়েও ঢুকতে পারবে না। তবুও মনসা কর্মকারকে ভয় দেখিয়ে সর্প প্রবেশের ছিদ্রপথ বানিয়ে নেন।

এরপর লখীন্দর বিয়ের নানা আচারবিধি মেনে উজানি নগরের দিকে বরযাত্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে দেখি বেহুলা ছোটবেলা থেকে মনসার পূজারী। তাই বেহুলার বিয়ের দিন দেবী সেখানে উপস্থিত হন। দেবতারা এই আচরণে শঙ্কিত হন এবং দেবী চণ্ডী মনসাকে কৌতুক করেন যাতে বেহুলা কাঁচা বাড়ি না হয়—

“বিবাহ করাব পুত্র নগর উজানি।

ছল করি ফিরে মোর লঘু জাতি কানি।।”^{২৬}

বিবাহে লখাইয়ের মাথায় ছত্র ভেঙে নাগছত্র ধরলে তা থেকে লখাই ভয় পেয়ে যায় এবং মুর্ছিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। বেহুলা মনসার কাছ থেকে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো নিজের অধিকার আদায় করতে গেলে মনসা সেখানে ছলনার আশ্রয় নেয়। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বেহুলাকে সাহায্য করতে না চাইলে পরে বেহুলা কিছু যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ‘খণ্ড বিয়ান’ ও ‘অমৃতকুণ্ডের জল’ আদায় করে মনসার কাছ থেকে। লখীন্দরকে সুস্থ করে তোলে। সেই সঙ্গে বিশ্বকর্মা দিয়ে নিজের কাঁচুলিও

নির্মাণ করে নেয়। মন না চাইলেও মনসার কঠোর আদেশে কালনাগিনী লোহার বাসর ঘরে বায়ুকোণের ছিদ্রপথে গিয়ে লখীন্দরকে দংশন করে। নেতার মহাজ্ঞানে বেহুলার কালনিদ্রা পেলে মনসা তৎক্ষণাৎ তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলে, নিজেকে নিরপরাধ রাখার জন্য স্বপ্নে বেহুলার প্রতি মনসার উক্তি—

“নিদ্রা হতে উঠি দেখ তোমার প্রভুয়ে।

ঢলিয়াছে লখীন্দর প্রাণে নাহি মরে।।

কালিনাগ পলাইয়া যারে মোর অসন্তোষ।

কালি খাইল তোমার স্বামী মোর কিবা দোষ।।”^{২৭}

লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার ক্রন্দন, সনকার হাহাকার ও চাঁদের ক্রোধ মিলে তীব্র শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয় চম্পক নগরে। চাঁদ লখীন্দরকে পুড়িয়ে দিতে বললে বেহুলার আকুল প্রার্থনায় ও সোমাই পণ্ডিতের কথায় কলার ভেলা তৈরী করান এবং লখীন্দরকে ভাসিয়ে দেয়। বেহুলাও কলার মাজুষে গিয়ে বসে। বেহুলা নানা ঘাট ঘুরে, নানা বাধাবিঘ্নের মাধ্যমে এগিয়ে চলে পথ। দেবী মনসা আবার নেতাকে বাঘরূপে পাঠিয়ে দেন গাঙ্গের কূলে লখীন্দরের দেহের মাংস খাওয়ার জন্য।

“পদ্মা বলে নেতা তুমি গাঙ্গের কূলে যাও।

বাঘ রূপে গিয়া তুমি লখাইর মাংস খাও।

অস্তি চর্ম খাইয় না থুইয় শেষ।

পাছে যেন বেউলা না পায় উদ্দেশ।।”^{২৮}

নেতা কিন্তু বেহুলার পাতিব্রত দেখে তাকে বিপদে ফেলতে পারে নি। বরং অষ্ট নাগের লেজ কেটে মাংস বিসর্জন ও লখীন্দরের অস্থি সংরক্ষণের বুদ্ধি দেয়। বেহুলাকে নিজ বাড়িতে রেখে সহযোগিতা করলে মনসা নেতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। নেতার পরমর্শে মনসা লখীন্দরকে জীবিত করার অঙ্গীকার করে। বেহুলা দেবসভায় নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে, বেহুলা মহাদেবের কাছে স্বামীর প্রাণ ফেরানোর বর চায়। বেহুলার এই দুর্দশার কারণ হিসেবে মহাদেব মনসাকে ডেকে পাঠালে দেবী কপটতার আশ্রয় নেন। যা বিজয়গুপ্তের ভাষায় খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে—

“পদ্মা বলে কহি শোন নন্দী মহাকাল।

মাথা ব্যথা করে মোর গায়ে না বাসি ভাল।

বুঝিতে না পারি আজি শরীরের ভাও।

আমি তথা না যাইব তুমি ফিরি যাও ।।”^{২৯}

লখীন্দরকে হত্যার অপবাদ মনসা প্রথমে অস্বীকার করে বেহুলাকে নানা অভিশাপ দিলেও শেষ পর্যন্ত নিজ দুঃখে ভেঙে পড়েন দেবী। চাঁদবেনের সঙ্গে নানাভাবে দ্বন্দ্ব হওয়া সত্ত্বেও মনসার পূজা করতে সে নারাজ।

শেষে লখীন্দর ও একে একে বেহুলার ছয় ভাসুর, চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরিয়ে দেন মনসা। তবে চাঁদবেনে কর্তৃক নিজ পূজা করানোর অঙ্গীকার নেয় দেবী বেহুলার কাছ থেকে। কাব্যের শেষে দেখা যায়— সাতপুত্র ও ধন-জন পেয়ে বাম হস্তে চাঁদ মনসার পূজা করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করে। পদ্মাবতী ও দেবী চণ্ডী এক হয়ে যায় কাব্যে। মনসার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে এখানে দেবী চণ্ডীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—

“এতেক শুনিয়া পদ্মা বিরস বদন।

চান্দারে ডাকিয়া চণ্ডী বলিলা বচন।।

তোমার ঠাই কহি শুন চান্দ সদাগর।

এক মূর্তি-আমি সেই নাহি অন্যপর।।

সেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।

কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর।।

পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্তি।

এ বলিয়া সাক্ষাত হইল ভগবতী।।”^{৩০}

চম্পক নগরের সম্ভ্রান্ত বণিক চাঁদসদাগরও নিজের ভুল বুঝতে পেরে মনসাকে জগতজননী পদ্মা আদ্যের দেবতা বলে অভিধায় ভূষিত করে, ছাগল-মহিষ বলিদান দিয়ে, পূজার আয়োজন করেন। হেতালের লাঠি কেটে ধূপের আয়োজন করে। কাব্যের শেষে পদ্মার সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হলে লখাই-বেহুলা স্বর্গে গমন করে, সেই সঙ্গে ছয় পুত্র ও ছয় পুত্রবধূ সঙ্গে নিয়ে চাঁদ সদাগর ও সনকাও স্বর্গে গমন করে।

অত্যন্ত সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে চরিত্রগুলির অন্ধন বিজয়গুপ্তের কাব্যের একটি অন্যতম গুণ। আবার দেব চরিত্র মনসাকে আধ্যাত্মিক গৌরবের মোড়কে আবৃত না করে, তার মধ্যে হৃদয়হীনতা, আক্কেশ পরায়ণ, ছলনাময়ী রূপ যেমন প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি আবার অন্যের দুঃখে কাতরও হয়েছেন। নিজের ভাগ্যের প্রতিও দুঃখিত হয়েছেন। অনায়াসেই প্রকাশ করেছে নিজেকে জন্ম দুঃখিনী বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্যের শেষে বেহুলা এবং চাঁদ সদাগরের প্রতি অত্যন্ত

সহানুভূতিশীল হয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে দেবী নিজ অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে চলেছেন। মনসাদেবী কোন অমঙ্গলের প্রতীক হয়ে ওঠেনি, বরং তার পরিপূর্ণ মানবী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এখানে চাঁদের আদর্শ বড় হয়ে ওঠেনি। তাই বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে অন্যতম সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। বিজয়গুপ্তকে বাস্তববাদী, সমাজ সচেতন, শিল্পবোধসম্বিত রূপে পেয়ে থাকি উক্ত কাব্যের রচয়িতা রূপে। এই কাব্যে মনসাদেবীর দৈবিক দিকটি যেমন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি মনসাদেবীর অবহেলিত জীবন থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য লড়াই আমরা দেখতে পাই।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—

“পাঁচশত বৎসর যাবৎ বিজয়গুপ্ত বাঙ্গালীর চিত্ত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। তাঁহার রচনা মেকী কিছুই ছিল না। খাটি বাঙ্গালী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তিনি মিটাইতে পারিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি এত আদর পাইয়াছেন।”^{৩১}

আরো বলা যায় বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্রগুলি বিজয়গুপ্তের কাব্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই দিক দিয়ে তাঁর মনসামঙ্গল তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটি মূল্যবান দলিল। তিনি দেব-চরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানব-চরিত্ররূপেই চিত্রিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নেই। বাংলার ধুলিমলিন গৃহাঙ্গিনায় তাঁদের কাহিনীর পরিবেশটি রচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন আদর্শবাদের স্পর্শমাত্র নেই। মনসা, চণ্ডী, মহাদেব প্রভৃতি দেব-চরিত্রগুলি নিখুঁত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে বিভিন্ন ধরনের পালা বিভাগ থাকলেও প্রতিটি পালা এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম তথ্যের খনি। ভাষা প্রাচীন ও কতটা অমার্জিত হলেও এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লী-প্রাণের পুরান সত্তা পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের বরিশাল-নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের ঘরে ঘরে বিজয়গুপ্তের কাব্য বহুল প্রচলিত। তাঁর লিখিত মনসার কাহিনী এখনও মানুষের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম প্রতিভাশালী কবি নারায়ণদেব। ‘সুকবিবল্লভ’ বা ‘কবিবল্লভ’ উপাধিযুক্ত পূর্ববঙ্গের এই কবির কাব্যের নাম ‘পদ্মাপুরাণ’। মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রাচীনতম কায়স্থ পূর্বপুরুষ রাঢ়দেশ ছেড়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বোরগাঁও অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। নারায়ণ দেবের পিতামহের নাম নরহরি, পিতার

নাম নরসিংহ। মাতার নাম রুক্মিণী। কবির মধুকুল্য গোত্র এবং গুণাকর গাঁই। পূর্ববঙ্গ ছাড়া আসামে ও উত্তরবঙ্গে নারায়ণদেবের কাব্য বহুল প্রচারিত।

নারায়ণদেবের ‘পদ্মাপুরাণ’ তিনভাগে বিভক্ত। যথা—

প্রথমভাগে রয়েছে— আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা,

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে— পৌরাণিক আখ্যানের সমাহার,

তৃতীয় ভাগে রয়েছে— চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী।

তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এই কাহিনীধারার মধ্যে কোন সংযোগ সূত্র নেই। অসংলগ্নভাবে এই কাহিনীর বর্ণনা পাই। শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সুকবি নারায়ণদেবের ‘পদ্মাপুরাণ’-এর সম্পাদনায় যে পুথিটি (ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর অঞ্চলের অধিবাসী এবং হেমনগরস্থ আশ্বারিয়া স্টেটের তদানীন্তন কর্মচারী শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ দাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত) নিয়েছেন তার মধ্যে যে শিরোনামগুলি দিয়েছেন, সেই সূত্র ধরে মনসাদেবীর পরিচয় আমরা তুলে ধরতে পারি। প্রথমেই আমরা পাই শিব-চণ্ডীর কথা। বৃষের সজ্জা করে শিবের যাত্রা শুরু হয়। পরে দেবী চণ্ডী ডুমুনী বেশ ধারণ করে শিবের কাছে গিয়েছেন। নদী পারাপারের সময়ে ঘাটে ডুমুনিকে শিবের মিলনের জন্য প্রস্তাব দিলে রতিক্রিয়ায় পরে দেবী নিজরূপে আবির্ভূত হন। শিব নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন। এরপরে পদ্মবনে কামাসক্ত শিবের শরীরের ঘাম থেকে নেতার জন্ম হয়। মহাদেব নেতাকে কৈলাস শিখরে পাঠিয়ে দেন, চণ্ডী ও গঙ্গার কাছে। নারায়ণদেব তাঁর কাব্যে চণ্ডী ও গঙ্গা দুজনকেই মহাদেবের স্ত্রী হিসেবে দেখিয়েছেন। এগুলি তাঁর ‘পদ্মাপুরাণে’ নতুন সংযোজন। মনসার জন্মকথায় দেখা যায়, কামবানে জর্জরিত শিবের নির্গত বীর্য পদ্মপাতায় পড়ে। ক্ষেমা নামে এক পক্ষীনি অমৃত ভেবে পান করে। সেই মহাবীর্যের ভার পক্ষীনি সহ্য করতে না পেরে পুনরায় কালীদহে গিয়ে পদ্মপাতায় রেখে আসে। পদ্মপাতা থেকে বীর্য পাতালে ভুবনে গিয়ে বাসুকির কাছে পৌঁছল। বাসুকি ধ্যানে মহাদেবের বীর্য জানতে পেরে ‘কুর্মে’র সঙ্গে যুক্তি করে ‘নিম্মালি’কে আদেশ দেন চার হাত তিন নয়নের শিবের লক্ষণযুক্ত কন্যা নির্মাণের জন্য। এইভাবে পাতালপুরীতে মনসার জন্ম হয়। মনসাদেবীর সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে তার বৃত্তান্ত বলেন সুকবি নারায়ণদেব—

“আনঙ্কিত নাগপুরি জন্ম হইল বিষহরি

ঘটে জীব হইল দিষ্টান।

আগে রক্ত বির্য হইল তার পাছে মাংস হইল

দেবীর শরীর গঠিল ভাগে ভাগে।”^{৩২}

এখানে কবি অতি সূক্ষ্মভাবে পদ্মার জন্ম বিবরণ দিয়েছেন কবি। দেবাদিদেব মহাদেব একসময় আবার পদ্মবনে মনসার মতো সুন্দরী নারীকে একা দেখে পরিচয় জানতে চেয়ে রতিসুখের জন্য আহ্বান জানান। মনসা মহাদেবকে পিতা সম্বোধন করে নিজেকে তাঁর দুহিতা/কন্যা পরিচয় দেন। মহাদেব কন্যার কথা যাচাই করার জন্য তাকে নিজ মূর্তি ধারণ করতে বলেন। পদ্মা বিভিন্ন নাগের হার, বসন, সঙ্খ পড়ে, নাগের খাট সিংহাসনে, নাগের বিছানায় শুয়ে, নাগের ঝারিতে জল ও নাগের বাটাতে পান খেয়ে ইত্যাদি ভাবে নাগ সজ্জিত হয়ে শিবের কাছে এসে বিষ নয়নে তাকালে শিব মূর্ছা যান। পরে ইন্দ্র, নারদ এবং অন্যান্য দেবতারা স্তুতি করতে লাগলে দেবী অমৃত নয়নে মহাদেবের দিকে তাকিয়ে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনেন। এরপর কন্যা অর্থাৎ পদ্মা নিজের বাড়িতে যেতে চাইলে একটি পুরী নির্মাণ করে শিব তাকে সেখানে থাকতে বলেন। কিন্তু মনসা সৎমার ভয় পান না, পিতার সঙ্গে যাবেনই। উপায় না পেয়ে মহাদেব বিশ্বকর্মা'কে দিয়ে ফুলের সাজি বানিয়ে তার মধ্যে মনসাকে রেখে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। নারায়ণদেবের কাব্যে মনসার প্রথমে গোয়াল নগরে পূজা প্রচারের কথা রয়েছে। গোয়ালনগরের গোচরণভূমিতে শিশুদের কাছে দেবী ক্ষীর চাইলে, শিশুরা অপরিচিত নারী দেখে না দিতে চাইলে দেবীর বিষ নয়নে সবাই সংজ্ঞা হারায়। শেষে গোপীনীরা কান্নায় ভেঙে পড়লে প্রাণ ফিরে পায় শিশুরা। এরপর মনসা হালুয়া বাছাইর গ্রামে যায়। ইছাই পাতরের ছেলে চাষী বাছাই সুন্দরী কুমারীকে দেখে বিয়ে করতে চায়। মনসা কোপবশত তার দিকে চাইলে বাছাই দেবীর সম্মুখে ঢলে পড়ে। বাছাই-এর মা মালতী অনেক অনুনয়-বিনয় করার পরে বাছাই প্রাণ ফিরে পায় তারা নতুন এই দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে পদ্মা মহাদেবের কন্যা বিষহরি বলে নিজের পরিচয় দেন এবং পূজাবিধির কথা বলেন—

“হংস ছাগল বেড়া পূজা দিয় মইস গেজা

নিতর্গিত মঙ্গল জয়কার।

চাঁপা কলা পঞ্চপাতে তিল চাউল দুধসাঁতে

কৈল তোরে পূজার বিস্তার।।

জন্ম মোর শ্রাবণ মাসে বিষ্ণু পঞ্চমী দিবসে

এথ পূজে এই তিথি পাইয়া।”^{৩৩}

লক্ষ বলি দিয়ে বাছাই পূজা করে দেবীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। অন্যদিকে শিব মনসাকে নিয়ে নিজের বাড়ি যান। গঙ্গা ও চণ্ডীর ভয়ে শিব মনসাকে ‘হিঙ্গুলালি ঘরে’ লুকিয়ে রাখলে নারদ দেবী

চণ্ডীর কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে দেন। গঙ্গার সঙ্গে যুক্তি করে করুণী বের করে পরম সুন্দরী মনসাকে দেখতে পান। আক্রোশে চণ্ডী মনসাকে প্রহার করেন। কুশের বাড়ি দিয়ে মনসার একচক্ষু কানা করেন। মনসা সহ্য করতে না পেরে বিষ দৃষ্টিতে তাকালে চণ্ডী চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পরে শিবের অনুরোধে সুস্থ হয়ে ওঠেন চণ্ডী। নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণে’র দেবখণ্ডে যে মনসার কাহিনী তা এখানে হঠাৎ সমাপ্ত হয়েছে। দেবখণ্ডে মনসাদেবীর পরিচয় আমরা এর থেকে বেশি পাই না। আবার নরখণ্ডে চাঁদ সগারের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের চিত্র পরে বিচ্ছিন্নভাবে পেয়ে থাকি।

নারায়ণদেবের ‘নরখণ্ডে’ আমরা বেহুলা-লখীন্দরের বিবাহের চিত্র পাই। মর্ত্যলোকে মনসার যে পূজা পাওয়ার প্রচেষ্টা তা চাঁদ সদাগরকে কেন্দ্র করে। তাই বেহুলা-লখীন্দরের বিবাহে নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করেন দেবী। উনকুটী নাগ উজানি নগরে গিয়ে বিয়ের আসরে লখীন্দরের মাথায় গিয়ে বসে। কাল সাপ দেখে ভয় পেয়ে লখীন্দর অচেতন হয়ে পড়ে। ছয়পুত্র, বাণিজ্যের সমস্ত ধন সম্পত্তি, মানুষজন হারিয়েছে এবং শেষে লখীন্দরের পরিণতি দেখে চাঁদ সদাগর বিলাপ করতে থাকেন। এই সময় বেহুলার নানা মিনতি শুনেও মনসা ‘আড়মুখ’ করে থাকেন। উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্না বেহুলা মনসাকে স্ত্রীবধের অপবাদের কথা বলেন। দেবী বেহুলার প্রতি সদয় হয়ে লখীন্দরের চেতন্য ফিরিয়ে দেন। এর সঙ্গে আরো বলা উচিত যে বাণিজ্য বদল করে পাটন থেকে স্বদেশে ফেরার সময় চাঁদের চৌদ্দডিঙা ডুবিয়ে দেওয়ার ফলে দুর্দশার মধ্যে পড়েও মনসাপূজা করতে রাজি হননি তিনি। পরে আবার বেহুলা-লখীন্দরের মাধ্যমে পূজা প্রচারের চেষ্টা করেন দেবী। বাসররাতে লখীন্দরকে কালনাগিনী সাপে দংশন করলে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য গাঙ্গুড়ের জলে ভেলায় ভেসে যায় বেহুলা স্বর্গের উদ্দেশ্যে। নেতা ধোপানীর সাহায্যে স্বর্গে দেবসভায় গিয়ে উপস্থিত হয়। দেবসভায় শিবের আদেশে বেহুলা নৃত্য করে সকল দেবতাকে তুষ্ট করে, মনসাদেবীর সাহায্যে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনে। মহাদেবের আদেশে দেবী লখীন্দরের জীবন পুনরায় ফিরিয়ে দিলেও চাঁদের দ্বারা মনসাপূজা করিয়ে নেওয়ার শর্ত করিয়ে নেন। মনসামঙ্গলের গতানুগতিক কাহিনীর মতো নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলেও শেষে বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দেন। বেহুলা-লখীন্দর (স্বর্গের উষা-অনিরুদ্ধ) শাপমোচনের পরে স্বর্গের পথে গমন করে। পথে উজানিনগরে সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে স্বর্গে গিয়ে স্বস্থানে আসীন হয়।

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে আমরা দেখতে পাই মনসা-কাহিনীকে পুরাণের মর্যাদায় ও গুরুত্বে উপনীত করতে চেয়েছেন কবি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীভূদেব চৌধুরীর মতে—

‘সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং বর্ণনারীতির অসংলগ্ন

আঙ্গিক সত্ত্বেও নারায়ণদেবের কাব্যে

ভাব-কল্পনার সংহতি গাঢ়তর।’^{৩৪}

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে— চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরামের খ্যাতি যেমন অনেক প্রচারিত। তেমনি মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কাব্য যে শুধু সমাজে প্রচারিত তা নয়, বাংলার বাইরে অসম প্রদেশেও প্রচার লাভ করেছে। নারায়ণদেবকে শিল্পরসের দিক দিয়ে মধ্যযুগের অন্যতম প্রতিভাশালী কবি বলে মনে করেছেন। তাই বলা যায় নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণে’ নতুন নতুন ঘটনা ও গল্প সংযোজিত হওয়ার ফলে আখ্যানটি বিস্তৃত হয়েছে। আর এই ‘পদ্মাপুরাণই’ বাংলার বাইরে, বিশেষ করে আসামে প্রচার লাভ করেছে। কাব্যগুণের দিক দিয়ে নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণ’ উৎকৃষ্ট না হলেও সাধারণ লোকসমাজে প্রচারলাভে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

মনসামঙ্গল কাব্যের উত্তরবঙ্গের ধারার অন্যতম কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ‘মনসামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। কবির জন্মস্থান দিনাজপুর জেলার কুচিয়ামোড় গ্রামে (বর্তমানে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বারসেই অঞ্চল, যা উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কাছাকাছি)। পিতামহের নাম জয়ানন্দ, পিতা রূপধায় চৌধুরী, মাতা রেবতী, সহোদর ঘনশ্যাম ও পত্নী পদ্মমুখী। জাতিতে ব্রাহ্মণ, ঘোষাল পদবীর কবিরা হলেন রাঢ়ী শ্রেণী। কবির কুচিয়ামোড় গ্রাম মহারাজ প্রাণনাথের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর পুঁথিটি প্রথম সম্পাদনা হয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কলকাতার ড. আশুতোষ দাসের যুগ্ম প্রচেষ্টায়। ড. আশুতোষ দাস নিজের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি, শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের অসম্পূর্ণ পুঁথিটি এবং আরো একটি পুঁথি-এই তিনটি পুঁথির সাহায্য নিয়ে সম্পাদনা করেন জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলটি এবং আগ্রহী পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দেন এই কাব্য।

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. দেবখণ্ড

২. বানিয়াখণ্ড

দেবখণ্ডের মধ্যে পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা, মনসার জন্মপ্রসঙ্গ ও মনসা হরগৌরী উপাখ্যান। দ্বিতীয়টিতে আমাদের চিরপরিচিত ও পরম্পরাগত চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী।

দেবখণ্ডে অনাদি দেব নিরঞ্জনের পৃথিবীকে প্রলয় থেকে রক্ষা করার জন্য চার ভাইকে সৃষ্টিকার্যে আদেশ দেন। এই চার ভাই ধর্ম দেবতার সৃষ্টি করেন। ধর্ম আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। আবার ধর্মের মনঃকষ্টজনিত নিঃশ্বাস থেকে মনসার জন্ম হয় এবং এই ধর্মের সঙ্গেই মনসার বিবাহ হয়। পরে ধর্মের মৃত্যু হয় এবং মনসা চিতার শয্যায় পুড়ে জীবন ত্যাগ করে। সেই চিতা থেকে শিশু কন্যা পার্বতীর জন্ম হয়। হেমন্তঋষির কন্যারূপে বড় হওয়া এই পার্বতীর মালঞ্চ বনে সাক্ষাৎ হয় শিবের সঙ্গে। সুন্দরী-যুবতী কুমারী পার্বতীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয় শিব এবং গান্ধর্ব-বিবাহ হয় তাদের মধ্যে। পরে স্ত্রী গঙ্গার অনুমতি নিয়ে পার্বতীকে কৈলাসে নিয়ে আসেন। এখানে দেখা যায় শিব গঙ্গা-পার্বতীর দ্বন্দ্ব বিরক্ত হয়ে গৃহত্যাগে উদ্যত হন। পরে মালঞ্চবন মুকুলিত হয়েছে জেনে সেখানে গমন করেন। মালঞ্চী বনে সুবেশ বিদ্যাধরীদের দেখে পার্বতীকে স্মরণ করে মদনবিকল শিব স্থলিতকাম হয় এবং তা পদ্মপাত্রে রাখেন। মহাদেবের সেই অক্ষয় মহাবীর্য পাতালে প্রবেশ করে বিষহরির জন্ম হয়। বাসুকি নাড়ী ছেদ ও কর্ণভেদ করেন এবং ‘জয়বিষহরি’ নাম রেখে নিজের ভগ্নী মনে করে পালন করতে থাকেন। অন্যদিকে একবছর ধরে শিব মালঞ্চ বনেই থাকলে পার্বতী গোয়ালিনী ছদ্মবেশে শিবের কাছে যান এবং শিবের সঙ্গে মিলনের ফলে গণেশের জন্ম হয়। একইভাবে বারো বছর পর মালঞ্চবনে কুচুনীরূপে শিবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে কার্তিকের জন্ম হয়। বাড়িতে ফেরার সময় সরোবর তীরে মনসাকে দেখে শিব মদনবাণে পীড়িত হন। দেবী নিজের পরিচয় দিলে মহাদেব কন্যাকে নিজ মূর্তি ধারণ করতে বলেন। দেবী বিভিন্ন নামের সর্পে সজ্জিত হয়ে শিবাত্মজা হিসেবে প্রমাণ দেন। দেবখণ্ডে আমরা চিত্রটি সুন্দরভাবে পাই—

“বাপের চরণে পড়ে জয় ব্রাহ্মণী।

জিয় জিয় বলিয়া শঙ্কর বোলে বাণী।।

গোসাঞি বোলে পদ্মানলে জনম তুমার।

পদমকুমারী নাম হইবে প্রচার।।”^{৩৫}

নিষেধ করা সত্ত্বেও মনসা পিতার সঙ্গে বাড়িতে আসেন ফুলের সাজিতে ঢুকে। পরে গঙ্গা-পার্বতীর কবলে পড়লে পার্বতীর আক্রোশে মনসার কোমর ভাঙে, এক চোখ কানা হয়ে যায়। এরপরে আমরা শিবের সমুদ্রমন্থন, কালকূট বিষে শিবের প্রাণ হারানো, মনসার শক্তিবলে পুনরায় প্রাণ ফিরে পাওয়া ইত্যাদি ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে দেখা যায় জরৎকার মুনির সঙ্গে বিবাহের পরে সরোবর তীরে দু’জনে বিশ্রাম করে। বর্ষাকালে নদীর চরে চেঙ, ব্যাঙ, মংস্য দেখে লোভ বশত তা খেতে থাকেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে মুনি এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হন এবং

স্ত্রীকে কলঙ্কিনী নারী ভেবে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। সন্ধ্যার সময় পদ্মা স্বামীকে ঘুম থেকে জাগালে মুনি ছলনা করে অসময়ে ঘুম ভাঙানোর অপরাধে পদ্মাকে ত্যাগ করে চলে যান। স্বামী পরিত্যক্তা মনসা একা অরণ্যে বসবাস করতে থাকেন। পরে পুত্র আন্তিকের অন্নকষ্টের কথা ভেবে নরলোকে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন।

নরলোকে দেবী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে এসে রাখালদের কাছ থাকে পূজা পাওয়ার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণী ছদ্মবেশে রাখালদের কাছে দই চাইলে পরিণামে তারা দেবীকে অপমান করলে তাদের ‘গোধন’ লুকিয়ে রাখেন। রাখালরা ঘটা করে মনসা পূজা করলে ‘গোধন’ ফিরে পায় তারা রাখালদের পূজা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সরোবরে জালু-মালুর কাছে যান। মাছ চেয়ে মনসার নাম করে জাল ফেলতে বললে তার মধ্যে সোনার ঘট ওঠে আসে দেবীর আদেশে জালু-মালু সোনার ঘট বাড়ি নিয়ে গিয়ে নানা উপাচারে পূজা করে। এই দেবখণ্ডে দেখা যায় সৃষ্টি ধর্মরাজই জগৎস্রষ্টা। শূন্যপুরাণের অনুসরণে এখানে সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে দেখি চাঁদ-সদাগর ও বেহুলা-লখীন্দর পর্বের নাম হল বাণিয়া খণ্ড। এখানে চাঁদ সদাগরের কাহিনী শুরু হয়েছে একটু অন্যভাবে, যা গতানুগতিক মনসামঙ্গল কাব্য থেকে আলাদা। এখানে দেখা যায় গৌড়নগরের মহারাজ ছিলেন বিক্রমকেশরী। তার নগরে সব মানুষই সুখী ও ধনী। এই বিক্রমকেশরীর অধীনে কোটিশ্বর নামে নৃপতি ছিলেন, স্ত্রী কলাবতী। অপুত্রক অবস্থায় এই কোটিশ্বর শিবের বরে পুত্র সন্তান লাভ করেন। আর এও জানতে পারেন এই পুত্র শিব ছাড়া অন্য কারোর পূজা করবে না। এই পুত্রই হল চন্দ্রপতি। এই চন্দ্রপতির সাথে সনক সাধুর কন্যা মনকার বিয়ে হয়। শিবের কৃপায় ছয়পুত্র লাভ করেন এবং পুত্রদের বিবাহও দেন।

মনসা মর্ত্যে পূজা প্রচার করতে চান এই চাঁদের সদাগরের মাধ্যমে। মনসা শিবকে অনুরোধ করেন যাতে শিব ভক্ত চাঁদ সদাগরকে আঞ্জা করেন তাঁর পূজা করার জন্য। দেবাদিদেব মহাদেব পদ্মার পীড়াপীড়িতে দৃঢ় নিষ্ঠা সম্পন্ন চাঁদ সদাগর ধরকে মনসার পূজার করতে ও পৃথিবীতে তার পূজা প্রচার করতে বলেন। এর উত্তরে চাঁদসগাদর বলেন—

“ক্লেধ হইয়া বোলে চান্দো শুন শূলপাণি।

এক মহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি।।

গঙ্গাজল থাকিতে কেনে অন্য জল খাই।

বটবৃক্ষ ছাড়িব কেনে সহড়াতলে যাই।।

লাজ নাই পদ্মার এ মত বোলে বাণী।

শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুলপানি।।”^{৩৬}

অনাচারের কারণে যাকে স্বামী ছেড়ে চলে গেছে তাকে কিছুতেই পূজা দিবে না চাঁদ। উক্ত বক্তব্য শুনে লজ্জিত-দুঃখিত মনসা ক্রোধে বানিয়াকে ‘দুর্জ্ঞান’, ‘বর্বর’ বলে তিরস্কার করে ধনে পুত্রে তাকে নাশ করার কথা বলেন। ফুলপানি না পেয়ে নেতার সঙ্গে যুক্তি করেন পৃথিবীতে কিভাবে পূজা প্রচার হবে। চাঁদ সদাগর মনসার ভাই, তাই চাঁদের কাছে গিয়ে সরাসরি পূজা প্রচারের কথা বলতে বলেন নেতা। কারণ নেতার মতে ‘পিরীতে পাইলে পূজা বিবাদের কিবা কাজ।’ মনসা দাদা সম্বোধন করলে প্রত্যুত্তরে চাঁদ ‘ভাতারছাড়ি’ বলে গালিগালাজ করেন এবং ‘হেমতালের লাঠি’র ভয় দেখান। পরিণামে চাঁদের ছয় পুত্রকে সাপে দংশন করে। বিষহরিকে না পূজা করে পুত্রদের হারিয়ে চাঁদ সদাগর পরিতাপ করতে থাকেন। আবার এখানে দেখা যায় তাড়কা রাক্ষসীকে দিয়ে চাঁদের ছয়পুত্রের মৃতদেহ হরণ করেন মনসা।

পুত্রদের হারিয়ে চাঁদ সদাগর পাটনে যাওয়ার সংকল্প করেন। বিভিন্ন ধরনের গাছ কেটে চৌদ্দ ডিঙ্গা প্রস্তুত করান। কাঁচা হরিদ্রা, পুরাণ সুকুতা, মাসকালাই আটার সুট, জিরা, মরিচ, লবঙ্গ, ফুলবড়ি, কদলীর খার, করুয়া সানকি, নারিকেল, তাল, বেল, কাঁঠাল ও আম প্রভৃতি নিয়ে বাণিজ্যে যায়। বলাবাহুল্য এখানে পাটের ধকড়া মেখলা ও শাড়ির কথা পাওয়া যায়। যা আসাম সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত। চাঁদের বাণিজ্যে যাওয়াকালীন উত্তরবঙ্গের নদ-নদীর কথা পাই আমরা। যেমন— ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, আত্রাই, ধবলা, পাস্কা প্রভৃতি। বাণিজ্য থেকে ফেরার সময় মনসার চক্রান্তে নানা বিপদের মধ্যে পড়ে। নৌকা ডুবে গেলে চাঁদ সদাগরসহ বাঙ্গাল মাঝির বিলাপ করতে থাকে। কেউ যুবতী স্ত্রীর জন্য, কেউ বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য কেউ নিজের ঘরবাড়ি-স্বদেশের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শেষে মনসার কথায় হনুমান চৌদ্দ ডিঙা ডুবিয়ে দেয়।

চৌদ্দ ডিঙা ডুবে যাওয়ার পর চাঁদের চরম দুর্গতি শুরু হয়। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণীর (মনসা) কথা মতো রান্নার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রান্নার উপরে মনসা কাকরূপে বর্জ্য ত্যাগ করলে শিব শিব বলে চাঁদ পথে নেমে পড়েন। শ্রীগোলানগরে চার পণ কড়ির বিনিময়ে হাঁড়ির ভার বয়ে নিয়ে চললে সেখানে বাঘরূপে মনসা হৃষ্কার ছাড়ে এবং পড়ে গিয়ে সব হাঁড়ি ভেঙে যায়। কুন্তকারের কোপে কড়ি ও ধূতি হারিয়ে দিগম্বের চাঁদ শ্রীগোলার হাটে গাছের ছাল পড়ে চলতে থাকেন। সেখানে কোতায়ালের হাতে মার খান। নানা দুর্গতি ও বিপদের মধ্য দিয়ে চাঁদ শেষে নিজের বাড়িতে এসে লুকিয়ে থাকলে সেখানেও চোর ভেবে মার খায়। তবে নানা বিপত্তির মধ্যে পড়েও চাঁদ মনসার সঙ্গে আপোষ করতে নারাজ। তাই তার মুখে শোনা যায়—

“মাথে হাত দিয়া কান্দে চান্দো অধিকারী।

বিবাদ সাধিলে পদ্মা ঢেমনাভারতী।।”^{৩৭}

পরে সনকা স্বামীকে চিনতে পারে। অবশেষে চাঁদ নিজ বাড়িতে পৌঁছান চরম দুর্ভোগের পর।

নিজ প্রাসাদে চাঁদ ফিরে এসেছেন কিন্তু মনসাদেবীর উপরে বিমুখ। মনসা নেতার সঙ্গে যুক্তি করে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গের উষা-অনিরুদ্ধকে নিয়ে আসার সংকল্প করেন। একদিকে মনসা-ধন্বন্তরি ছদ্মবেশে সনকাকে পুত্রবর দেন এবং বিবাহ রাত্রে পুত্রকে সাবধানে রাখতে বলেন। অন্যদিকে দেব সভায় গিয়ে ইন্দ্রকে দিয়ে নৃত্যরত উষা-অনিরুদ্ধকে অভিশাপ করান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার। সনকার গর্ভে অনিরুদ্ধ লখীন্দর রূপে এবং মেনকার গর্ভে উষা ‘বেহুলা’ রূপে জন্ম গ্রহণ করে। লখীন্দর ষোড়শ বৎসরের হলেও বিবাহের কোন আয়োজন না দেখে মনসা ব্রাহ্মণ কন্যার ছদ্মবেশে লখীন্দরকে বিবাহোন্মুখ করে তোলেন। আবার কামসোনাকে দিয়ে মামী কৌশল্যা রূপে স্বপ্নাদর্শন করিয়ে কামাসক্ত করে তোলেন। পরের দিন সকালে সরোবর তীরে মামী কৌশল্যাকে জোরপূর্বক আলিঙ্গন করে মিলক্রিয়া সম্পন্ন করে। সনকার মুখে সংবাদ পেয়ে লজ্জিত চাঁদ সদাগর পুত্রের বিবাহের আয়োজন করেন। অনেক খোঁজ করেও মেয়ের সন্ধান না পেয়ে, শেষে ব্রাহ্মণীর অভিশাপকে তোয়াক্কা না করে স্বামী মারা গেলে ছয়মাসে জীবিত করবে, বেহুলার মুখে এই উক্তি শুনে চাঁদ বেহুলার পিতা ‘বাছো সদাগর’র সাথে দেখা করে বিবাহ স্থির করেন। যথারীতি মেনে বিয়ের দিন স্থির হয় এবং মনসার নানা চক্রান্তের পরেও শুভকাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেলে বেহুলা-লখীন্দর বাড়ি ফিরে আসে। এখানে অন্য মনসামঙ্গল কাব্যের মতোই লখীন্দরকে কালসাপ দংশন করে। বেহুলা নানা বিপত্তির মধ্য দিয়ে নানা ঘাট পেরিয়ে দেবপুরে পৌঁছে নৃত্যাদির মাধ্যমে শিবকে সন্তুষ্ট করে শেষে মনসার কাছ থেকে সমস্ত ধনসম্পদ, ডিঙ্গা, ছয় ভাসুর ও স্বামী লখীন্দরকে ফিরে পেয়ে চম্পক নগরে যাত্রা করে।

চম্পকনগরে পুত্রশোকাতুরা সনকা মনসার মায়ায় পুত্র ফিরে আসার স্বপ্ন দেখে। এরকম পরিস্থিতিতে বেহুলা ডোমনির বেশে চাঁদের পুরীতে প্রবেশ করে সকালে খোঁজ নেয়। পরে বেহুলা-লখীন্দরের আসল পরিচয় পেয়ে সনকাসহ সবাই গগড়িয়ার ঘাটে যায় তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য। সমস্ত কিছু ফিরে পেয়েও চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দিতে অসম্মত হয়ন। বেহুলা-চাঁদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা চলে। মনসার পূজার কথা বলে। ‘চাঁদ মনসারে পুজিব’ কিনা পুজিব দ্বন্দ্ব এবং দোলাচলতায় শেষে বাম হাতে পূজা দেন। এই পরিস্থিতির চিত্র খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে—

“ডাহিন হস্ত করি আপনে চান্দো বাম হস্ত করি।

সেই বাম হস্তে চান্দো পূজে বিষহরি।।

নানা পুষ্প লঞা চান্দো দিল বাম হস্তে।

হাতে হাতে পদ্মাবতী বান্ধিলেন মাথে।।”^{৩৮}

চাঁদের বাম হস্তের পূজাতেই মনসার সঙ্গে দীর্ঘ বিবাদের অবসান হয়। মনসা খুশি হয়ে চাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বণিককুলে সর্প ভয় কোনোদিন থাকবে না বলে জানান। শেষে বেথলা-লখীন্দর ইন্ডের আদেশে মনসার রথে চড়ে স্বর্গে গমন করে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার তন্দ্রাবিভূতি, জীবন মৈত্র, দুর্গাবর, সনকার প্রমুখ কবিদের কাব্যে পেলেও জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে। গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী কাব্য রচনা হলেও স্থানের বিভেদে, সময়ের ব্যবধানে নতুনত্ব দেখা যায় অনেকক্ষেত্রে। চৈতন্য পরবর্তী এই কবির কাব্যে মনসাকে দেখা যায় প্রীতির মাধ্যমে পূজা চান, বিবাদের মধ্য দিয়ে নয়, আবার অনেক সময় রুঢ়, কঠোর রূপ ধারণ করেছে। চাঁদ চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই। যে চাঁদ শেষ পর্যন্ত বাম হাতে পূজা দিয়েছে মনসাকে। সেই নাকি, মনসার পূজা করেননি তাই ছয় পুত্র হারিয়েছে বলে মনস্তাপ করেছেন, চৌদ্দ ডিঙা ডুবে গেলে কেঁদে আকুল হয়েছেন বাঙ্গালদের সঙ্গে। আসলে সপ্তদশ শতকের দিক থেকে মানুষের কথা উঠে এসেছে সাহিত্যে। তাই মানসিক দ্বন্দ্ব, জটিলতা, দোলাচলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় মনসা ও চাঁদসদাগরের মতো প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে। কাব্যে চরিত্রগুলির নামের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা যায়। যেমন— চাঁদের ভৃত্য নেড়ার নাম লেঙ্ঘা।

বেথলা — বিথলা

বেথলার মা— মেনকা

বেথলার পিতা— বাছা সদাগর ইত্যাদি।

এই কাব্যে আরো নতুন সংযোজন হল লখীন্দরের সাথে মামী কৌশল্যার পর্বটি। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে জগজ্জীবন ঘোষাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

“মাতুলানীর সঙ্গে লখীন্দরের কুব্যবহারের বর্ণনা করিয়া জগজ্জীবন তাঁহার

রচনাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কে বলিবে ইহার ভিতর দিয়াই হয়ত

কবি তাঁহার পারিপার্শ্বিক সমাজের রস ও রুচির পরিচয় দিয়াছেন।”^{৩৯}

একইভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদ-নদী— করতোয়া, পাল্লা প্রভৃতি বিভিন্ন রকম গাছ— পিয়লা, পিপলি, খেজুর, শাল, সিমলি, চাপা নাগেশ্বর, বকুল, কাঠাল, নিম, নারিকেল, জলপাই প্রভৃতির

পরিচয় পাই। উত্তরবঙ্গের সবুজ প্রকৃতির আভাস পাই আমরা এর মধ্য দিয়ে। এছাড়া আঞ্চলিক শব্দ-থুকুড়া, পালান, সাপুড়া, মুটফি, খাদ গাবর, পাতল, ডাবর, মুড়ি প্রভৃতি আরো অনেক উদাহরণ পাই কবির মনসামঙ্গলে। বাঙালীর আমিষ-নিরামিষ খাবারের সঙ্গে (চেঙ্গ-মৎস, চিতলের কোল, সউল, খাশি মাংস, চুড়া মৎস, বড়ি ভাজা, কদলীর মাজা) শাক সজিরও বর্ণনা পাই। আবার উত্তরবঙ্গের অনেক লোকাচারের চিত্র পাই। যেমন— লখীন্দরের বিবাহ বাসরের লোকাচারগুলি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতি বা অন্যান্য সম্প্রদায়ে প্রচলিত। এই সূত্রে বলা যায় লখীন্দরের বিয়েতে তুলসীপাতা হস্তান্তর রীতি, মেনকার জামাতা বরণ, কন্যা-জামাতাকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়ার লোকাচার, কন্যা বিদায়ের করুণ চিত্র বর্ণনায় উত্তরবঙ্গের রীতিনীতির প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। তাই বলা যায় জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গলের কাব্যে মনসাদেবীর পরিচয় দিতে গিয়ে লৌকিক জনজীবনের চিত্র যেমন জীবন্ত ও বাস্তব সম্মত ভাবে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তেমনি মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনীগুলিকেও বাঙালীর আত্মার সঙ্গে মিশিয়েছেন। যার ফলে মনসামঙ্গল ধারার এক স্বতন্ত্র কবি হিসেবে তিনি আজও বিশেষ স্থানের অধিকারী, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় মনসামঙ্গল কাব্যের— ১. পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ, ২. পশ্চিমবঙ্গের বা রাঢ়ের মনসামঙ্গল, এবং ৩. উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল। এই তিন ধারার কবিদের মধ্যে পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’, বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’, নারায়ণদেবের ‘পদ্মপুরাণ’ ও সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে মনসার যে কাহিনী আলোচিত হল। অল্প কিছু পার্থক্য থাকলেও চৈতন্য পূর্ববর্তী পঞ্চদশ শতকের মনসামঙ্গলের যে তিন কবির কাব্য কাহিনী ধারা অনেকটা একরকম। তবে সপ্তদশ শতকের উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমেই তার কাব্যের বন্দনাংশে চারটি পংক্তিতে দেবী অম্বুজা ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর বন্দনা গান করেননি। সমগ্র সৃষ্টিপত্তন প্রসঙ্গ বর্ণনায় যে কাহিনী জগজ্জীবন ঘোষাল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে সাজিয়েছেন তা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের বর্ণিত আখ্যান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিপ্রদাস পিপলাই, বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবের কাব্যে মনসা যেমন দেবী ডোমনী বেশে, পাটনী বেশে শিবকে ছলনা করেন, জগজ্জীবনের কাব্যে কিন্তু শিবই কয়ালী রূপে দেবীকে ছলনা করেন। মনসার জন্মবৃত্তান্তে স্বর্গের বিদ্যাধরীদের মনোহর রূপ দর্শনে শিবের মনে কামরসের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে পার্বতী মালঞ্চ বনে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে শিবের বক্তব্যে সমাজের রক্ষণশীলতার পরিচয় ও ইত্যাদি নতুন দিক পায় আমরা। নেতা

চরিত্রের পরিচয় আমরা ‘বানিয়া খণ্ডে’ প্রথম পাই, যা অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা। আবার লখীন্দরের মাতুলানীর প্রতি আসক্তি, এই রোমাঞ্চকর বর্ণনায় সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে অভিনব সংযোজন। সেই সঙ্গে মনসাদেবী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে বেহুলার স্বর্গে যাওয়ার উপায় বলে দেওয়া, শুধু তাঁর কাব্যেই পাওয়া যায়। এছাড়া বলা যায়, লখীন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়ার পর মনসাদেবীকে পূজা প্রদানের পন্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মনসা দেবীর সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব, মনসাদেবীর পূজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও চাঁদ সদাগরের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব-প্রায় সব কবির কাব্যেই একই রকমভাবে পেয়ে থাকি।

তথ্যসূত্র:

১. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি
প্রা:লি:, ১০ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, নতুন সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ-২০১২-২০১৩,
পৃ. ৩৮।
২. কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৫
৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, আর্য় ম্যানসন (নবম তল) ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩,
পর্যৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০০২/বি, পৃ. ১৯২
৪. VIPRADASA'S MANASA-VIJAYA, Sukumar Sen, The Asiatic Society,
1 park Street, Calcutta, P-3.
৫. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯,
প্রথম প্রকাশ: ১৯৪০, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ১৭৭
৬. VIPRADASA'S MANASA-VIJAYA, Sukumar Sen, The Asiatic Society,
1 park Street, Calcutta, P-3.
৭. তদেব, পৃ. ১৭
৮. তদেব, পৃ. ৬৫
৯. তদেব, পৃ. ১৪৬
১০. তদেব, পৃ. ১৬৯

১১. তদেব, পৃ. ২২৯

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী
প্রা:লি:, ১০ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ-১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ-২০১২-২০১৩,
পৃ. ৭২

১৩. VIPRADASA'S MANASA-VIJAYA, Sukumar Sen, The Asiatic Society,
1 park Street, Calcutta, পৃ. ৪৪

১৪. কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ৮

১৫. কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ-২০০৯, পৃ. ২৩

১৬. তদেব, পৃ. ৪৮-৪৯

১৭. তদেব, পৃ. ৯১-৯২

১৮. তদেব, পৃ. ১০৮-১০৯

১৯. তদেব, পৃ. ১১৩

২০. তদেব, পৃ. ১৪৮-১৪৯

২১. তদেব, পৃ. ১৯৪

২২. তদেব, পৃ. ২৫১

২৩. তদেব, পৃ. ২৯০

২৪. তদেব, পৃ. ৩১৩

২৫. তদেব, পৃ. ৩৪৬

২৬. তদেব, পৃ. ৩৪৮

২৭. তদেব, পৃ. ৪৩০

২৮. তদেব, পৃ. ৪৬৪

২৯. তদেব, পৃ. ৪৮৫

৩০. তদেব, পৃ. ৫৩৫

৩১. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
পুস্তক পর্ষৎ, আর্চ ম্যানসন (নবম তল) ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, তৃতীয়

মুদ্রণ-আগস্ট ২০০২, পৃ. ১৯৭

৩২. শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত: ‘সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ’ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, প্রথম মুদ্রণ-১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ-২০১১, পৃ. ২১।

৩৩. তদেব, পৃ. ৩০

৩৪. ড. ভূদেব চৌধুরী : ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়), দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে’জ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র-১৩৯১, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০০৫, আষাঢ় ১৪১২, পৃ. ১৮৮

৩৫. কবি জগজ্জীবন বিরচিত ‘মনসামঙ্গল’ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ৭৮

৩৬. কবি জগজ্জীবন বিরচিত ‘মনসামঙ্গল’, পৃ. ১১৪

৩৭. তদেব, পৃ. ১৪৮

৩৮. তদেব, পৃ. ৩৫৬

৩৯. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রা:লি:, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কয়ার), কলিকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, বইমেলা জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ৩০৯

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপ-এ মনসাকথার পরিচয় সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুপম অভিজ্ঞান প্রাগাধুনিক পর্বের রচনার বিশ শতকে ঘটেছে নানা অনুসৃজন। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মানুষের অস্থিরতা বাঙালির চিন্তাজগৎকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। একের পর এক রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে পড়ে মানুষ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। বিশ শতকের মধ্যভাগে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন, নকশাল আন্দোলনের উত্থান, প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, মিশ্র অর্থনীতির দুর্বল হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনা মানুষকে আরো জটিল ও দুর্বোধ্য করে তোলে। এই পরিসরে সাহিত্যেও চরম ক্ষয় ও শিল্পরূপের অবমূল্যায়ন চলতে থাকে। কিন্তু এই আপাত অবক্ষয়িত সাহিত্যরূপের অন্তরালে এক শ্রেণীর সচেতন বুদ্ধিজীবী মানুষ, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক সচেষ্টিত হয়েছেন আমাদের ঐতিহ্য, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শনকে পুনরুদ্ধার করতে। সাহিত্যের পুনর্নির্মাণের পথে তাঁরা অন্বেষণ করেছেন প্রাচীন ঐতিহ্যের। শুধুমাত্র বর্তমান নয়, তাঁরা সমাজকে প্রসারিত করেছেন সুদূর অতীতে এবং ভবিষ্যতে। জীবন ও ঐতিহ্যের সামগ্রিকতাকে উপলব্ধি করতে গিয়ে তাঁরা বৃহত্তর সমকালকে গ্রহীত্ব করেছেন। উত্তর আধুনিক সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতা হল ‘রূপান্তর’ বা ‘পুনর্নির্মাণ’। এই পথে সমালোচনার জগতেও এসেছে নির্মাণ, বিনির্মাণ, নবনির্মাণ ও পাঠক প্রতিক্রিয়ার মতো শব্দগুলি। বর্তমানে আমাদের চিরায়ত সাহিত্য বিশেষ করে চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা মঙ্গলকাব্য নিয়ে উপন্যাস, গল্প, নাটক ও কবিতা রচিত হয়ে চলেছে। চিন্তা চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে ঐ সব প্রাচীন রচনাকালগুলি নিয়ে লেখকরা অবাধ স্বাধীনতায় নির্মাণ করে চলেছেন এক একটি শিল্পরূপ। আর এই Construction, De-construction-এর পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে যেমন বাখ্তিন, রলাবর্ত, মিশেলফুকো, জ্যাক দেরিদার চিন্তাজগৎ আলোড়িত হয়ে চলেছে, তেমনি মধ্যযুগের সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসা, চণ্ডীর মিথকে নিয়ে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কাব্যকবিতা লেখা হয়ে চলেছে অসংখ্য; নবজাগরণের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মানুষের কাছে ব্যক্তি প্রধান হয়ে ওঠে। নিজস্ব আরাধ্য দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করার সঙ্গে যুক্ত হয় যুক্তি-বুদ্ধি নৈতিকতা ইত্যাদি দিকগুলি। এরপর প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা বিশ্ব সাহিত্যে মিথের ব্যবহার শুরু হয়। মানুষের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট, মূল্যবোধহীনতার মুহূর্তে মিথ চরিত্রের মধ্যে বাঁচতে চায়। মিথ চরিত্রগুলি আধুনিক চরিত্রের মধ্যে

রূপান্তরিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ শতকের জীবন সংগ্রামের চিত্র বিভিন্ন মিথ চরিত্রগুলির মধ্যে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যে। চরিত্রের অমরত্ব লাভের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের আবহ ও মিথীয় চরিত্রকে নিয়ে আসা হচ্ছে বর্তমান আধুনিক সাহিত্যে। দেব-দেবীকে নিয়ে যে মিথীয় ভাবনাগুলি নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উঠে আসে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে। যে মিথ ভাবনাগুলি মগ্নচৈতন্য থেকে বেরিয়ে এসে নানান কল্পনা উপলব্ধি ও অনুভূতির স্তরে একটা পরিকাঠামো গড়ে রাখে, লেখক বা শিল্পী সেই ঐতিহ্য সাহিত্য বা শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তবে এই প্রকাশ মাধ্যম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কখনো সমকালের মধ্যে এই পুরাণ প্রসঙ্গকে অস্পষ্টভাবে আভাস ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন, আবার কখনো বাইরে রেখে তার ভেতরে সমকালের সমস্যাকে প্রচ্ছন্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়। অর্থাৎ মিথকে বহিরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। আমাদের চিরপরিচিত মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে সমকালের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন বহু কবি সাহিত্যিকগণ। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে একাধিক সাহিত্য রচনা করলেও সেগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি নবনির্মাণ। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুনতর জীবন জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে উক্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আসলে যত দিন যাবে সাহিত্য নতুনভাবে আবিষ্কৃত হবে। তবে সাহিত্যগুলিকে আবার নতুন করে দেখা গেছে, এক একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের যে বিশালতা রয়েছে তা প্রত্যেক সাহিত্য সংরূপে অনুসরণ করে লেখকগণ নিজ নিজ গুণে মৌলিক সাহিত্য গড়ে তোলেন। এতে মনসা মঙ্গলকাব্যের মাহাত্ম্য কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রত্যেকটি ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, উপন্যাস এক গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপে উঠে এসেছে। এই রচনাগুলি আধুনিক ও উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং এক নতুনতর সাহিত্যশাখার দৃষ্টান্ত হিসাবে উঠে এসেছে।

আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসাকে তুলে ধরার জন্য বাঙালীর ঐতিহ্যের দিকে হাত বাড়ানোর প্রবণতা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দেখা গেলেও এই শতকের প্রথমেই কয়েকটি গদ্য আখ্যান নাটক ও কবিতা পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান সংরূপ, যথা— নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প পড়তির ক্ষেত্রে মনসা-কথার নবনির্মাণ আমরা দেখি। তবে বিংশ শতকের প্রথমেই শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মনসামঙ্গল কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গদ্যের আকারে সেই চাঁদসদাগর, বেথলা-লখিন্দরের কাহিনীকে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আধুনিক সাহিত্যসংরূপে মনসাকথা নবনির্মাণের ক্ষেত্রে মুখবন্ধ হিসেবে উক্ত গদ্যআখ্যানটি উপযুক্ত স্থানের

অধিকারী। তাই চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলাকে কেন্দ্র করে রচিত ‘বেহুলা’ (১৯০৭) নামক গদ্য আখ্যানটি আলোচনার প্রথমেই রাখলাম। তারপর নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প এই সংরূপগুলি পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আমার আলোচনায় এই ক্রমান্বয়ে ধরেই চলতে থাকবে।

মধ্যযুগের অন্যতম নারী চরিত্র বেহুলার পাতিব্রত, সতীত্ব ও একনিষ্ঠতাকে সম্মান জানিয়ে বর্তমান আধুনিক মনোভাবাপন্ন সমাজব্যবস্থায় তাঁকে নারীশক্তির প্রতীক হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর এই ‘বেহুলা’ গদ্য আখ্যানের আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা কথার নব নির্মাণে আমার আলোচনার বিষয় হবে নিম্নোক্ত চারটি নাটক।

১. ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯২৭)— মন্মথ রায়

উক্ত নাটকের শেষে আমরা দেখি মনসা চরিত্রের ত্রুরভাবের বদলে স্নেহময়ী ও ক্ষমাপ্রবণ হয়ে ওঠার চিত্র। তবে এখানে চাঁদ চরিত্রের উচ্চ দার্শনিকতায় নাটকের বণিক রাজাকে নাট্যকার নিয়ে যেতে পারেন নি। বেহুলা ও লখিন্দরের পূর্বরাগের চিত্র এখানে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

২. ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৭৬)— অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি দৃশ্যে নিম্নবিত্ত এক সংসারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিধ্বস্ত সময়ের পটভূমিকায়। চাঁদ চরিত্রের সরাসরি উপস্থিতি না থাকলেও চাঁদের আদর্শে উপস্থাপিত প্রসন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সময় বা কালের নিয়মের ফলে মানুষের যে পরিবর্তন তা দেখানো হয়েছে।

৩. ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৭৮)— শম্ভু মিত্র

উক্ত নাটকে শম্ভু মিত্র বিশ শতকের চার-পাঁচ দশকের সমাজ সমস্যা, ভাঙন, আদর্শহীনতা, শোষণ বঞ্চনা ও ব্যক্তিত্বের সংকটময় যুগে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছেন চাঁদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নাটকে মনসা হল বিশ শতকের সমস্ত প্রতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতীক। যা বারবার বাধা প্রদান করেছে চাঁদের বাণিজ্য যাত্রায়। লখিন্দর চরিত্রের আত্মসংকট দেখা দিয়েছে নাটকে বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে।

৪. ‘মনসাকথা’ (২০০১)— শেখর দেবরায়

নাটকটিতে শেখর দেবরায় চাঁদকে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা ভোগী মানুষে পরিণত করেছেন। অপরদিকে নাগ জনগোষ্ঠী দেবী মনসা এখানে কল্যাণময়ী, তার উগ্রতেজ

বা কপটতা নেই, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে গেছে তার নিষ্ঠুরতা। এইভাবে মনসাকথার কাহিনী হয়ে উঠেছে এক নতুন পাঠকৃতি।

মনসামঙ্গলের প্রাচীন অনুষ্ঙ্গ নিয়ে আধুনিককালে খুব বেশি কাব্য-কবিতা রচনা না হলেও বেশ কিছু কবিতায় আধুনিক কবিগণ মনসামঙ্গল, চাঁদ সদাগর ও বেহুলার অনুষ্ঙ্গ তুলে ধরেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়, আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণে যেগুলি কবিতার বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। সেগুলি হল—

১. ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯৩৮)— কালিদাস রায়

‘চাঁদসদাগর’ কবিতাটি ‘বৈকালী’ কাব্যগ্রন্থে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট কবি কালিদাস রায় ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতায় বিশ শতকের বিপন্ন সময়ে চাঁদ সদাগরকে পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেন। মানুষই যে দেবতা গড়ে, মানুষের কৃপার উপর যে দেবমহিমা নির্ভর করে তা এই কবিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রের পুনর্নির্মাণ করে সমকাল চেতনার প্রেক্ষাপটে চাঁদের ব্যক্তিত্বকে আহ্বান করেন।

২. ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ — জীবনানন্দ দাস

‘রূপসী বাংলা’ (১৯৫১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত জীবনানন্দ দাসের ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতাটি। বাংলার প্রকৃতি মध्ये অতীতকে অন্বেষণ করতে গিয়ে জীবনানন্দ মনসামঙ্গল কাব্যের পরিমণ্ডলে উপনীত হন। ‘চাঁদ সদাগর’, ‘বেহুলা’, ‘কালীদহ’, ‘গাঙুর’, ‘মধুকর ডিঙা’, ‘ফণিমনসা’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে তিনি মিথ ও লোকপুরাণের চিত্রকল্প রচনা করেন। কবিতায় বেহুলার ঘুঙরের মধ্যে দিয়ে রূপসী বাংলায় বিপন্নতা ও অসহায়তা চিহ্নিত হয়। কবি মনসামঙ্গলের মিথকে বাংলার প্রকৃতি রূপের মধ্যে স্থাপন করে এক অপূর্ব শিল্প নির্মাণ করেছেন।

৩. ‘বেহুলা নাচানো স্বর্গ’ — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উক্ত কবিতাটি ‘মৃত্যুভীর্ণ’ (১৩৬২) কাব্যে সংকলিত হয়। আজকের নারীর অসহায়তা ও বিপন্নতাকে তুলে ধরেছেন কবি এই কবিতায়। উত্তরআধুনিক যুগেও নারীকে পুরুষের কাছে নানা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। তা উঠে এসেছে এই কবিতায়।

৪. ‘বেহুলা’ — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

‘লখিন্দর’ (১৩৬৩) কাব্যগ্রন্থের এই কবিতায় বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশকের অবক্ষয়

ও অস্থিরতার একটি বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। সেই সময়ের হতাশা, সংকট ও অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই স্বপ্ন ও আশাবাদ, প্রতিবাদ করতে গিয়ে কবি রচনা করেন ‘বেহুলা’ কবিতাটি।

৫. ‘এবং লখিন্দর’ — বিষ্ণু দে

‘এবং লখিন্দর’ কবিতাটি ‘আলেখ্য’ (১৯৫২-৫৮) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। পরে বিষ্ণু দে-এর শ্রেষ্ঠ কবিতায় স্থান পায়। ২০টি চরণে রচিত পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত সনেটধর্মী এই কবিতায় কবিহৃদয়ের রোমান্টিক আবেগ ও দার্শনিক মনোভাব বিকশিত হয়েছে। নদীর গতিমানতা এবং নানারূপের বৈচিত্র্য ও ‘ভাঙন-গড়নের’ পরিবর্তনশীল রূপ সম্পর্কে সত্য উপলব্ধির জন্য কবি মনসাপুরাণের বেহুলার উপর নির্ভর করেছেন।

৬. ‘লখিন্দর’, ‘বেহুলা’, ‘সনকা’, ‘চাঁদ সদাগর’ ও ‘মনসা’ — জিয়া হায়দার

কবি জিয়া হায়দারের ‘কৌটোর ইচ্ছেগুলো’ (১৯৬৪) কাব্যের অন্তর্গত উক্ত কবিতাগুলি। তৎকালীন যুব সম্প্রদায়ের আত্মসংকট, নারীর অধিকার চেতনা, পুরুষের দাপ্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। ‘ও বেহুলা’ কবিতাটি প্রত্নচেতনা অনুসারী নয়, এখানে তিনি অন্বেষণ করেন নতুন এক পৃথিবী যা মানুষের মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়।

জিয়া হায়দারের কবিতায় লোকজ সংস্কৃতির পাশাপাশি প্রাগাধুনিক সাহিত্য এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের প্রাচীন বলে পৃথক করা যায় না। কবিতায় লখিন্দরের মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ প্রতীকীভাবে যুবশক্তির অসহায়তা চিহ্নিত হয়েছে।

৭. ‘বেহুলা’ — সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১৩৭৫ বঙ্গাব্দে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ‘অলিন্দ’ পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘বেহুলা’ কবিতাটির প্রকাশ। আটিটি চরণে রচিত ‘বেহুলা’ কবিতাটির গঠনে মঙ্গলকাব্য নেই, রয়েছে মঙ্গলকাব্যের মিথ ও লোকপুরাণ অনুসরণে সমকালের বিদ্বাস্ত সময়ের মূল্যায়ন। বিশ শতকের ছয়ের দশকে অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যে বিপন্নতা, কবি তাকেই তুলে ধরেছেন নিজের অনুভূতিতে।

৮. ‘ও বেহুলা’ — অরুণ মিত্র

অরুণ মিত্রের ‘ও বেহুলা’ কবিতাটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯৯ সালে। এই কবিতাটি প্রত্নচেতনা অনুসারী নয়, এখানে তিনি অন্বেষণ করেন নতুন এক পৃথিবী, যা মানুষের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়।

৯. ‘হেতালের লাঠি’ — শঙ্খ ঘোষ

‘হেতালের লাঠি’ কবিতাটি ১৩৯০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। ‘হেতালের লাঠি’ কবিতায় চাঁদের ব্যক্তিত্বকে নির্মাণ করেছেন কবি অন্যভাবে। বিশ শতকের আটের দশকের সমাজ, ইতিহাস ও জাতীয়তার চেতনাকে তিনি এখানে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন।

১০. ‘মনসা মঙ্গল’ — শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

‘অনন্ত ভাসানে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘মনসা-মঙ্গল’ কবিতাটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার গ্রন্থে সংকলিত হয় ১৯৯৫ সালে) জলা-জঙ্গলময় পূর্বাঞ্চলের মানুষের চেতনায় প্রচলিত মনসাপুরাণের ‘মিথ’ এত গভীরভাবে প্রোথিত যে তাকে কখনোই পৃথক করা যায় না। কবি আশ্চর্য কৌশলে লোকপুরাণের আবহ তৈরী করেন বিশ শতকের আটের দশকের পটভূমিকায়।

১১. ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ (২০০৩)— উত্তম দাস

কবি উত্তম দাস তাঁর ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ কাব্যগ্রন্থের ৮টি কবিতায় মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তুলেছেন।

১২. ‘বেহুলার ভেলা’ — দীপঙ্কর মাহমুদ

রফিক উল্লাহ খান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা’ (২০০৫) গ্রন্থের অন্তর্গত হয় দীপঙ্কর মাহমুদের ‘বেহুলার ভেলা’ কবিতাটি। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র ‘বেহুলা’কে অনুসরণ করে রচনা করেন অসাধারণ ব্যঞ্জনাধর্মী এক কবিতা প্রচলিত ‘বেহুলা’র অনুযায়ী বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের সমাজ ও নারী চেতনার মূল্যায়ন ঘটে নতুনভাবে।

১৩. ‘ডিঙা’ — জয় গোস্বামী

জয়গোস্বামী তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার (২০০৮) অন্যতম এই ‘ডিঙা’ কবিতাটিতে মনসামঙ্গল কাব্যের বলিষ্ঠ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাঁদ সদাগরকে বর্তমানের সমস্যা দীর্ঘ পৃথিবীর কাণ্ডারি হিসেবে দেখিয়েছেন।

১৪. ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ — কৃষ্ণা বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘একালের কবিতা সংকলন’ (২০০৯) গ্রন্থ থেকে প্রকাশিত হয় এই কবিতা এবং পরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়। ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ কবিতায় প্রতীকীভাবে বর্তমানের আশা, স্বপ্ন ও সমৃদ্ধ জীবনের ঐতিহ্য ডিঙার রূপকে প্রতিফলিত হয় যা

মনসার চক্রান্তে উড়তে ভাসতে ভুলে গেছে। চারিদিকে উগ্র ভোগবাদী জীবন বোধের সময় চাঁদ বণিকের ডিঙা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে বোঝাই করে আসবে সমৃদ্ধি।

মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে লেখা বেশ কয়েকটি আধুনিক বাংলা উপন্যাস পাওয়া যায়। তা সপ্তম অধ্যায়ের অন্তর্গত আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসাকথার নব নির্মাণে আলোচনা করা হবে। সেগুলি মধ্যে হল—

১. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৮৪)— সেলিনা হোসেন

বাংলাদেশের খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা সেলিনা হোসেন ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের চাঁদ চরিত্রকে এক প্রতিবাদী চরিত্ররূপে দাঁড় করিয়েছেন তৎকালীন দুর্ভিক্ষ অস্থিরতাময় পরিস্থিতিতে। সেই সঙ্গে জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি আজু মৃধাকে দাঁড় করিয়েছেন মনসার প্রতিভূ রূপে। ১০টি পরিচ্ছেদে রচিত এই উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের অভিনব ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।

২. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩)— অমিয়ভূষণ মজুমদার

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আবির্ভাব ৬০-এর দশকে এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেন। ২৯টি অধ্যায়যুক্ত বৃহত্তর এই এপিক উপন্যাসে অষ্টাদশ-নবম শতকে নৌবাগিজ্য এবং চোল-পল্লব সাম্রাজ্যের ছবি উঠে এসেছে। উপন্যাসটিতে এক নবতর দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র ফুটে উঠেছে।

৩. ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’ (১৯৯৫)— অভিজিৎ সেন

মনসামঙ্গলের লখিন্দরকে এক অন্যতর যুবা রূপে উপস্থিত করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

৪. ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ (১৯৯৯)— সত্যপ্রিয় ঘোষ

উক্ত উপন্যাসে দেশভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়া মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে কঠিনতম সময় অতিক্রম করতে চাওয়া এক মানুষের এগিয়ে চলার কাহিনি। দশটি পরিচ্ছেদে রচিত ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ উপন্যাসটির সর্বত্র মনসামঙ্গলের প্রচলিত মিথকে মূল্যায়িত করার প্রচেষ্টা রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে অন্তর্গত আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নব নির্মাণে আমরা যে

ছোট গল্পগুলো পেয়েছি সেগুলো হল—

১. ‘বেহুলা’ — মহাশ্বেতা দেবী

‘প্রমা’ (১৯৭৮) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এই গল্পটি। পরে ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন’ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আড়াই ঘন্টার পথে হাঁটা দূরত্বে ২৪ পরগনার ইরফানপুর ব্লকের বেহুলা গ্রামের অত্যাচারিত সাধারণ মানুষদের বেঁচে ওঠার কাহিনীকে লেখিকা তুলে ধরেছেন উক্ত ছোটগল্পে। ‘কালাজ সাপ’ অর্থাৎ শিয়রচাঁদা বা শিকড়চাঁদা সাপের কামড় থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য গ্রামের জোতদার সুবিধাভোগী, স্বার্থপর নিষ্ঠুর মানুষ হোদো নক্করের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সাংকেতিকভাবে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নামও বেহুলা রাখা হয়েছে। মনসামঙ্গলের সতী, শুদ্ধ রমণী বেহুলার মতো এই নদীও সব পাপ অমঙ্গল ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়ে বেহুলা গ্রামকে শুদ্ধ করে তোলে। এইভাবে লেখিকা প্রচলিত মিথ ও মনসাপুরাণের অন্ধকার প্রাচীনতম ও রহস্যময়তার দিকটি কাটিয়ে উঠে তৈরী করেন এক নতুন সাহিত্য। পুরাণের মিথকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিরোধের ভাষা জুগিয়েছেন লেখিকা।

২. ‘বেহুলা’ — বিমল কর।

১৯৯২ বঙ্গাব্দে শারদীয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত এই গল্পটি। ‘বেহুলা’ নামকরণের অনুশঙ্গে গল্পটির মধ্যে মঙ্গলকাব্যের ‘মিথ’ ছায়া ফেলেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী ইন্দুমতীর সঙ্গে কাজের মেয়ে বেহুলাকে কেন্দ্র করে গল্পটি নির্মিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের বেহুলার মত এই বেহুলার সেবাপরায়ণতা, সৎভাব, একনিষ্ঠতা দেখা যায়। যার ফলে বৃদ্ধের ছেলেমেয়েদের থেকেও আপন হয়ে উঠেছে সে। মনসার কথা না থাকলেও মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলার মড়া নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার কথা রয়েছে। পুরাণের বেহুলা সেভাবে চাঁদ সদাগর ও লখিন্দরের মুক্তি কামনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তেমনি এই গল্পের বেহুলাও ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী ইন্দুমতীর সেবাযত্ন করে তাদের সারিয়ে তোলে।

৩. ‘সতত বেহুলা’ — সাধন চট্টোপাধ্যায়।

‘পরিকথা’ (ডিসেম্বর, ২০০৫) পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত হয় এই গল্প। ও ‘গল্প ৫০’ (২০০৯) গ্রন্থে সংকলিত। একুশ শতকের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংকট এবং মনোবিশ্লেষণের নানা অভিব্যক্তি ‘সতত বেহুলা’ গল্পটিতে। পঁচাত্তর বছরের

শান্তিনাথের জীবনে না পাওয়ার বাসনা নিয়ে রচিত গল্পটি মনসামঙ্গলের লোকপুরাণ আশ্চর্যভাবে
সম্বন্ধিত হয়ে কাহিনীকে প্রতীকী করে তুলেছে।

উপরিউক্ত বিষয়বস্তুর ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনাগুলি অগ্রসর
হবে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসাকথার নবনির্মাণ ঘটেছে কতটা তা আলোচিত
হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যানে মনসা-কথার নবনির্মাণ

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও এর যথাযথ প্রয়োগ ঘটে উনিশ শতকের সূচনালগ্নে (১৮০১)। পোর্তুগীজ মিশনারীদের (মানোএল দা আসসুন্স সাঁও, দোম আন্তোনিও-দো-রোজারিও) হাতে বাংলা গদ্যের প্রসারের সূত্রপাত হলে পূর্ণতালাভ করে শ্রীরামপুর মিশনারীর পণ্ডিতবর্গ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের হাতে। এই বাংলা গদ্যের হাত ধরেই অবসান ঘটে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গতানুগতিক কাব্য মাধ্যমের। আধুনিককালের নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধাবলী রচিত হয় এই গদ্যের আকারেই। মানুষের মনের অভিব্যক্তিগুলি সহজভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এই গদ্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। এমনকি পদ্যের আকারে রচিত প্রাগাধুনিক রচনাগুলিও নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হতে থাকে গদ্যের আকারে। এরকমই একটি রচনা হল শ্রদ্ধেয় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বেহুলা’ নামক গদ্য আখ্যানটি। প্রাচীন যে মনসামঙ্গলের ধারা, তাকে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেওয়ার যে প্রয়াস, তা গদ্যের আকারেই শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার কারণেই সার্থক হয়ে উঠেছে আধুনিক গদ্য-আখ্যানে মনসাকথার নবনির্মাণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসাকথার নবনির্মাণের আলোচনায় আমরা প্রথমেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বেহুলা’ (১৯০৭) আখ্যানটির কথা বলতে পারি। প্রথম দিকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা, প্রখ্যাত সাহিত্যাধ্যাপক এবং অন্যতম এই সাহিত্য স্রষ্টার প্রাগাধুনিক সাহিত্যের প্রতি ছিল ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতুহল। যার পরিচয় পাই ‘পৌরাণিকী’ (১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থটির ‘বেহুলা’, ‘জড়ভরত’, ‘সতী’, ‘ফুল্লরা’, ‘ধরা-দ্রোণ’ ও ‘কুশধ্বজ’ প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্য দিয়ে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন আমাদের চির পরিচিত প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যকে নিয়ে রচনা করেন ‘বেহুলা’ উপাখ্যানটি। কাব্যের আকারে রচিত যে মনসামঙ্গল আখ্যান, বাঙালীর সেই ঘরের কথাকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে নানা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে গদ্যের আকারে রচনা করেন এক আধুনিক আখ্যান।

কানা হরিদত্তকে মনে করলে প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে এই মনসাগান রচিত হয়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, এমনকি আসাম-বিহারেও এই গানের মহাভাব অনুরণিত হয়। এখনও বাঙালির অনেক ঘরে শ্রাবণ মাসে এই মনসাপূজা হয়ে থাকে। তবে বাংলার আত্মার আত্মীয় ঐতিহ্যশালী এই সম্পদটি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মধ্যেই থেকে গেছে। যে গান শত শত বছর ধরে দেশের মানুষকে

আনন্দ দিয়ে এসেছে, এই গানের লহরী বাংলার বাতাসে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে। অথচ অনেকেই এই সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ‘বেহুলা’ রচনাটির ভূমিকায় বলেছেন—

“স্বদেশের এরূপ পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সংস্রব
নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে এবং তাঁহারা ই বা দেশের
প্রতিনিধি বলিয়া সর্বত্র পরিচয় দিবেন কি ভরসায়?”

মনসা ভাসানে অনেক কথাই আছে, সমস্ত বিষয় বর্ণনা করতে গেলে রচনাটি অযথাই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাই তিনি অনেক অংশই বাদ দিয়েছেন। প্রাচীন পুঁথির স্বামী-বিরহ-বিধুরা, আশ্চর্য-সাধনা-তৎপরা, একান্ত বিপন্না অথচ নিভীকহৃদয়া স্বাধীর চরিত্র চিত্রণে গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে বাণ্মীকি রামায়ণের সীতা চরিত্রের মতোই বেহুলাও ভক্তির রসে অভিষিক্ত হয়েছে লেখকের মানসপটে। আখ্যানটি আলোচনা করলে আমরা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি দেখতে পাবো।

মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের ২২ টি অধ্যায়ের সুবৃহৎ আখ্যান ‘বেহুলা’। মনসার সাথে বিবাদের কারণে চাঁদ ছয়পুত্র ও বৈদ্যরাজ ‘শঙ্কুর গারুড়ী’কে হারায়। নিরাশ্রয় চাঁদ তবুও শিবভক্ত বলে নিজ সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। অন্যদিকে লক্ষ্মীর প্রাসাদতুল্য চাঁদের বিশাল প্রাসাদ সনকার হাহাকার ও ছয় বিধবা পুত্রবধূর নীরব ক্রন্দনে শ্মশানে পরিণত হয়। এতে চাঁদের বজ্রকঠোর পণ শিথিল না হয়ে বরং শোকাক্ত হৃদয়ে হেতালের লাঠি নিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় চাঁদ চট্টগ্রামের নাবিকগণের সাহায্যে সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে বাণিজ্যে যান। কালীদহের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ডুবে যায় তাঁর সপ্তডিঙা মধুকর। চাঁদ মনসার সাহায্য না নিলে গভীর জলে নিমজ্জিত হয়ে কোনো রকমে প্রাণটুকু নিয়ে নগ্নদেহে বেঁচে ওঠে। পরে বন্ধু চন্দ্রকেতুর বাড়িতে গিয়ে উঠলে সেখানে মনসার ঘট দেখে বেরিয়ে পড়েন। এই অবস্থায় ক্ষুধিত চাঁদ গ্রামে ভিক্ষা করে রান্নার সামগ্রী জোগাড় করলে মনসাদেবী মুষিকের সাহায্যে তা নষ্ট করে ফেলেন। ক্রুদ্ধ বণিককুল চক্রবর্তী চাঁদ শেষে নদী তীরে বসে কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। কিছু টাকা উপার্জনের জন্য কাঠুরিয়াদের সাথে কাঠ কাটতে গেলে দেবীর চক্রান্তে চাঁদ সেই কাঠ বহন করতে পারেননি। এমনকি ব্রাহ্মণ বাড়িতে কাজে নিযুক্ত হলেও সেখান থেকে বিফল হয়ে ফিরে আসেন। একে একে সমস্ত বিপদের মধ্য দিয়ে নিঃস্ব হাতে কোনরকম প্রাণটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। চাঁদ বাড়িতে ফিরে এলে সনকা মনসাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেন এমন একজনকে এনে দিতে যে চাঁদ সদগরকে মনসা পূজার জন্য প্রেরণা যোগাতে পারবে। দেবীর আশীর্বাদে সনকা পুত্র সন্তান লাভ করেন। লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখার ফাঁদ-স্বরূপ পুত্রের নাম

‘লক্ষ্মীন্দ্র’ রাখেন। আদর করে লোকে বলে ‘লখাই’। এর থেকে আরো সংক্ষিপ্ত হয় ‘নখা’। তবে দৈবজ্ঞের কাছে চাঁদ জানতে পারেন বাসর ঘরে লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে। একা চাঁদ এই মহা পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করেন কাউকে কিছু না বলে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা চাঁদ-সনকার পুত্র লখীন্দরের রূপ বর্ণনার কথা পাই। নবযৌবনে উত্তীর্ণ লখাই সদাগরের গৃহে দীপশিখার মতো। চাঁদের বিরাট প্রাসাদ গৃহ লক্ষীন্দরের রূপে গুণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র ‘চন্দ্রধরের’ বাড়ির গৌরব নয়, বিশাল চম্পক নগরীরও গৌরব। গল্পের শুরু থেকেই মনসামঙ্গল কাব্যের ধারাবাহিক অনুসরণ করলেও এই স্থলে লেখক নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সনকা পুত্রের বিয়ের জন্য চাঁদ সদাগরকে অনুরোধ করেন। নানা আপত্তি সত্ত্বেও সদাগর শেষে বিয়ে দিতে সম্মত হয়।

অন্যদিকে নিছনিগরের বণিক সায় সদাগরের চতুর্দশ বৎসরের কন্যা ‘বেহুলা নাচুনি’। বেহুলাকে লেখক এখানে চণ্ডীদাসের সেই ধ্যানশীলা রাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বেহুলা স্বয়ং যেন এক কল্যাণময়ী দেবী। আখ্যানভাগের বর্ণনায় আমরা পাই—

“মেয়ে দেখিয়া চাঁদের চক্ষু জলপূর্ণ হইল; মেয়ে ত নয়, এ যেন পদ্মাসন
ছাড়িয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণী ভূতলে দাঁড়াইয়াছেন, পায়ের আলতা নহে, উহা রক্ত
পদ্মের প্রভা। এই বধূকে পাইলে সনকার প্রাণ সত্য সত্যই জুড়াইবে।”

আসলে হিন্দু গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তা এই আখ্যানে উঠে এসেছে। তার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। বেহুলার জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যা পরবর্তী আলোচনাগুলিতে আরো তুলে ধরতে পারব। মেয়ে মনোমত হলেও কৌলিক প্রথা অনুযায়ী বেহুলাকে লোহার কলাই রান্নার কথা বলেন চাঁদ। মনসার পূজারী বেহুলা দেবপ্রসাদে এই লোহার কলাই সিদ্ধ করে লখীন্দরের যোগ্য প্রমাণিত হয়। দৈবজ্ঞের বাণীকে মাথায় রেখে চাঁদ সাঁতালী পর্বতে লোহার বাসর-ঘর নির্মাণ করেন। কিন্তু মনসা নানা ছল চাতুরী করে, কামিলাকে ভয় দেখিয়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র তৈরি করিরে নেন। আবার বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ের সময় নানা অশুভ লক্ষ্মণগুলিও চাঁদ সদাগরকে চিন্তিত করে তোলে। যেমন বরযাত্রী বেরোনোর সময় টোকাঠে লেগে লখীন্দরের মুকুট খুলে যায়, আবার বিবাহ সভায় হেমছত্র ভেঙে পড়ে। শেষে বিবাহ সম্পন্ন হলে চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে সাঁতালী পর্বতে লোহার বাসর ঘরে নিয়ে যায়। এই অধ্যায়ে বেহাই সাইবেনের সাথে কথোপকথনে চাঁদের পিতৃহৃদয়ের হাহাকার উঠে এসেছে। অন্যদিকে দেখা যায় লোহার বাসর ঘরে বেহুলা একে একে বঙ্করাজ, কালদন্ত ও উদয়কাল সাপকে বন্দী করলেও শেষ রাত্রে কালনাগিনী লখীন্দরকে দংশন করে। আর এই স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলা কলার

মান্দাসে ভেসে যায় গাঙ্গুড়ের জলে। এখান থেকেই বেহুলার সত্যের পথে যাত্রা শুরু। যারা এতক্ষণ তাকে খণ্ড কপালিনী, চিরণদাতিনী বলে গালিগালাজ করেছে, তারাই বেহুলার জন্য ‘হায় হায়’ করে চোখের জল ফেলে। সবাই বেহুলাকে সতী সাবিত্রী সাধবী রমণী বলে গুণগান করতে থাকে। বেহুলা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাসর ঘরে হৈমথালায় যে ভাত রেখেছিলেন তা দাড়িম গাছের তলায় পুঁতে রাখার কথা বলে। সেই সঙ্গে স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে মৃতদেহ নিয়ে নদীতে ভেসে যায়। পুত্র লখীন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলা ভেলায় ভেসে গেলে চাঁদ সদাগর উন্মাদের মতো সাঁতালী পর্বতের বনে বনে ভ্রমণ করে বেড়ায়। অন্যদিকে নিছিনিগরের বেহুলার মা অমলা কর্কশকণ্ঠে কাকের ডাক শুনে বেহুলার অমঙ্গলের কথা ভেবে চিন্তিত হন। বেহুলার একনিষ্ঠতা ও পাতিব্রততার পরিচয় পাই আমরা, যখন বড়দাদা হরি সাধু বাড়ি ফিরে যেতে বললে তার উত্তরে বেহুলা বলে—

“মাকে বলিও, যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার সঙ্গেই
আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তেও বাঁচিতে পারিব না।”

লখীন্দরের গলিত শব নিয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যাওয়ার সময় নানা বিপদের মধ্যে পড়ে বেহুলা। গোদার ঘাটে গোদার কুপ্রস্তাব, কলার ভেলা পচে যাওয়া এবং ফেরু ও ব্যাঘ্রদলের সম্মুখে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়ে। তবে দেবীর কৃপায় নতুন ভেলা প্রস্তুত হয়। বেহুলার নিজের রূপ ও দেহের বল নিঃশেষ হয়ে পড়লে, মাতা অমলাকে স্মরণ করে বিষহরির কাছে প্রার্থনা করলে সমস্ত কিছু ফিরে পায়। ছয়মাস ধরে মৃতদেহ নিয়ে যাত্রাকালে লখীন্দরের হাড়মাত্র অবশিষ্ট থাকলেও বেহুলা অন্তর থেকে বুঝতে পারে তার স্বামী জীবিত হয়ে উঠবে। এই সময় বেহুলার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। গত সাতজন্ম ধরে বাসর ঘরে সে স্বামীকে হারিয়েছে এবং চিতান প্রাণ ত্যাগ করেছেন। অতীতের এই পুণ্যফলে এইবার স্বামীকে ফিরে পাবে বলে বিশ্বাস। তাই স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য মৃত্যুর দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, আশা ছাড়েনি। যার ফলে প্রতিবাদী দেবতাও তাঁর তপস্যার প্রীত হয়েছেন।

চৌদ্রতম অধ্যায়ে আমরা দেখি বেহুলা নেতা ধোপানীর সাহায্যে দেবসভায় গিয়ে উপস্থিত হয়। দেবতাদের সম্মুখে বেহুলার নৃত্য, স্বর্গের নর্তকীদের নৃত্য থেকে আলাদা। এই নৃত্য সম্পূর্ণ আলাদা। এর রস স্থায়ী। স্বর্গে দ্বিতীয় অমৃতভাণ্ডের সৃষ্টি। এই নৃত্যের কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা দেবতাদের উপর পুণ্য প্রভাব ফেলে। আখ্যানের মতো, দেবতারা নিজেদের উপভোগের জন্য নয়, বেহুলাকে পরীক্ষা করার জন্য নৃত্যের আদেশ দেন। পরীক্ষায় বেহুলা উত্তীর্ণ হলে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আশীর্বাদ

দেন দেবতারা। এই স্থলে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে বেহুলার পাতিব্রত্যা, সতীত্ব, আদর্শ, সত্যতা, একনিষ্ঠতার জন্য দেবতারা আগে থেকেই মুগ্ধ হয় এবং লখীন্দরকে জীবিত করার সংকল্প করেন। তাই দেবসভায় আগেই প্রতিশ্রুতি দেন দেবী মনসা লখীন্দরকে জীবিত করার। তবে মহাদেবের আদেশ, চাঁদ সদাগর পূজা না দিলে দেবীর পূজা জগতে প্রচার লাভ করবে না। মনসা চাঁদের পূজা পাওয়ার চেষ্টা করেন, যার ফলে তাকে অনেক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। চাঁদের দুর্ব্যবহারের জন্যই তাঁর ছয়পুত্রকে সর্পে দংশন করেছে, বন্ধু শঙ্কর গারুড়ীকে সর্পে দংশন করেছে। সপ্তডিঙা মধুকর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরকে সর্পে দংশন করে। চাঁদ অনায়াসেই ‘হিস্তালের লাঠি’ দ্বারা মনসার ঘট ভাঙেন, দেবীকে কীটপতঙ্গের ন্যায় নগন্য মনে করেন, ঘৃণা করেন। এই অবস্থায় মনসাদেবী কোন যুক্তিতে চাঁদের পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিবেন? এই দোলাচলতার মধ্য দিয়ে দেবীর চোখ জলে টলটল করতে থাকে। এমতাবস্থায় মহাদেব আশ্বস্ত করলে দেবী লখীন্দর সহ চাঁদের অন্য ছয় পুত্র এবং সপ্তডিঙার বদলে চৌদ্দডিঙা মধুকর ফিরিয়ে দেন। তবে বিষহরি দেবী বেহুলাকে শর্ত করিয়ে নেন। যেমন—

“তোমার শ্বশুর যদি আমার পূজা না করে, তবে যাহা দত্ত হইল, তাহা সকলই হারাইবে।”^৪

বেহুলা জীবিত স্বামী ও ভাসুরদের নিয়ে প্রথমে যোগি-যোগিনী বেশে নিছনি নগরে যায়। পরে চৌদ্দডিঙা নিয়ে চম্পক নগরে উপস্থিত হয়। চাঁদ সদাগরের বাড়িতে ‘লখাইয়ের ষড়মাসিক’ শ্রাদ্ধ-কার্যে মূল্যবান ব্যজনী হাতে সুন্দরী ডুমুনী ছদ্মবেশে উপস্থিত হয় বেহুলা সবাইকে নিয়ে। বেহুলা শ্বশুরকে পূজা দিতে অনুরোধ করলে, চাঁদ শিবভক্ত বলে মনসাপূজা করতে অসম্মত হন। এই আখ্যানের নতুনত্বের দিক হল শিব স্মরণ গলিতচর্ম্ম শীর্ণকায় বৃদ্ধের ছদ্মবেশে চাঁদকে উপদেশ দেন শিবমায়া স্বরূপা মনসাদেবীকে স্বীকার করে নিতে, তাঁকে প্রণাম করতে। এই বৃদ্ধ পরে শিবের মহামূর্তি ধারণ করে আকাশ পথে দেদীপ্যমান হয়ে চাঁদকে বলেন—

“তুমি মনসাকে আমার আত্মজা বলিয়া জানিও, তুমি তাঁহার মুখ দেখিবে না ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পূজা দিবে না বলিয়াছ, মুখ ফিরাইয়া বামহস্তে অঞ্জলি দিলেই তিনি প্রীতা হইবেন।”^৫

চাঁদ শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিবাত্মজা দেবীর পূজা নিজ হাতে করে জীবন সার্থক করার অঙ্গীকার করেন এবং মনসাদেবীর সুবর্ণবিগ্রহ তৈরি করে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পঞ্চমীতে পূজা করতে প্রস্তুত হন। পরে হেতালের লাঠি আগুনে পুড়িয়ে সেই কাঠ মনসাপূজার

ধূনাতে ব্যবহার করেন।

আখ্যানের শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখি চাঁদ সদাগরের বাড়িতে আনন্দ উৎসবের মধ্যে চন্দ্রধরের জ্ঞাতি ভ্রাতা উচ্চ বংশের দর্পে স্ফীত নীলাম্বর বণিক ও কুটিল সমাজনীতি প্রাজ্ঞ নরখণ্ডবাসী জনার্দন রায় বেহুলায় সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। সভায় সতীত্ব পরীক্ষার প্রশ্ন উঠলে বেহুলা নিজে থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সভাগৃহ থেকে আলৌকিক ভাবে বদ্যুৎমালায় অলঙ্কৃত হয়ে বেহুলা ও লখীন্দর স্বর্গপথে যাত্রা করেন। বেহুলা-লখীন্দর যে দেব সভায় দেবরাজের অভিশাপগ্রস্ত উষা-অনিরুদ্ধ, তা আখ্যানের শেষে বর্ণিত হয়েছে। আটজন্ম ধরে মর্ত্যের বিরহ ব্যথা সহ্য করে শেষে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ‘বেহুলা’ গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—

“আধুনিক রুচিতে স্ত্রী চরিত্রের আদর্শ যেরূপ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রাচীন একনিষ্ঠ পাত্তিব্রতের এই অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্তের প্রতি বঙ্গসাহিত্যে অবহেলার ভাব না আসিয়া পড়ে, ইহাই প্রার্থনীয়। বেহুলা প্রায় সাত শত বৎসর কাল বঙ্গীয় নারী-সমাজের আরাধ্য হইয়া আছেন এবং আশা করি চিরকালই থাকিবেন।”^৬

লেখক আরাধ্য এই নারীর জীবনচিত্র অঙ্কন করাই মুখ্য হিসাবে নিয়েছেন উক্ত আখ্যানে। চাঁদ সদাগরকে দেবী মনসার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রথম থেকেই তুলে ধরলেও বেহুলায় পতিভক্তি স্নেহশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা, একনিষ্ঠতা আখ্যানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের রসকে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই আখ্যানটি রচনা করলেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিনবত্বের দিকটি উঠে এসেছে অনেক ক্ষেত্রে। সেগুলি হল—

১. আখ্যানের প্রথম দিকেই আমরা পাই, চাঁদের স্ত্রী সনকা দেবীর কাছে সন্তান প্রার্থনা করে যার মাধ্যমে চাঁদ মনসা পূজা করতে উজ্জীবিত হবেন। এখানে মাতার সন্তান লাভের থেকে দেবীর পূজা প্রদানই মুখ্য হয়েছে সনকার কাছে। যার ফল স্বরূপ দেবী চাঁদ সদাগরের বিরোধিতা না করে বরং সদয় হবেন।

২. লখীন্দর জন্মানোর পর, চাঁদ সদাগর নিজে দৈবজ্ঞের কাছে জানতে পারেন লখীন্দ্রের বাসর ঘরে সর্পাঘাতে মৃত্যুর কথা। প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যে সনকার পুত্র লাভের সময় মনসা তাকে এই কথা বলেন।

৩. স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় বেহুলায় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। গত

সাতজন্ম ধরে সে বিবাহ রাত্রে স্বামীকে হারিয়েছে এবং দেখা যায় প্রতিবারেই স্বামীর সঙ্গে সহমৃত্যু হয়েছে। তাই লখীন্দর মারা যাওয়ার পরে বেহুলা মৃতদেহ সংস্কার করতে বাধা দিয়ে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলে। নিজেও স্বামীকে জীবিত করার সংকল্প নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যায়। আসলে চিতায় দক্ষ হয়ে স্বামী প্রেমে শাস্তি পাই না বেহুলা। প্রেমপিপাসা মেটানোর জন্য স্বামীকে ইহজন্মেই পেতে চেয়েছে সে। তাই স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য ব্রত নিয়েছেন বেহুলা। এই দিক দিয়ে আখ্যানকাব্যটি হয়ে উঠেছে নতুন মঙ্গলকাব্য, অর্থাৎ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের আধুনিক নবনির্মাণ।

৪. মঙ্গলকাব্যের নবনির্মাণের আরেকটি পরিচয় পাই আমরা এই আখ্যানে। সেটি হল— নেতা ধোপানীর সঙ্গে দেব সভায় উপস্থিত হয় বেহুলা। সেখানে দেবকূলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা যায়। দেবতারা সুন্দরী বেহুলা নাচুনীকে নৃত্যের কথা বলেন— নৃত্য দর্শনের আগ্রহ বশত নয়, বেহুলার স্বামীভক্তি পরীক্ষা করার জন্য। তবে বেহুলার এই নৃত্য একেবারে অন্য প্রকারের। বেহুলার এই নৃত্যের প্রভাবে দেবকূল কামাসিক্ত না হয়ে বরং পবিত্র হন। এই দিক দিয়ে গদ্য আখ্যানটিতে একটি অভিনবত্বের দিক উঠে এসেছে।

৫. ‘বেহুলা’তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনটি হল শৈব চাঁদের ধর্মচিন্তার পরিবর্তনে স্বয়ং শিবের উদ্যোগ। শিব গতিত চর্ম শীর্ণকায় বৃদ্ধের ছদ্মবেশে এসে, চাঁদের মনসাপূজা না করার যে অহংবোধ তাকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। চাঁদের ধর্মবোধের যে কুপমুগ্ধতা তা দূর করার চেষ্টা করেন এবং মনসাপূজায় নিয়োজিত করেন। প্রাচীন কবিদের কাব্য থেকে এই দিক দিয়ে সরে এসেছেন লেখক। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনভাবে উঠে এসেছে এই দিকটি।

৬. বেহুলার চরিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রেখেছেন কবি। বেহুলার যে দীর্ঘ পথের সাধনা, তা তুলে ধরতে গিয়ে অতি-মানবিক দিকও উঠে এসেছে। বেহুলার ভেলা গলে পচে গেলেও দেবীর কৃপায় তা নতুন হয়ে ওঠে। আবার বেহুলার সৌন্দর্যের দিকটিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বেহুলার পূর্বজন্মের কথা এবং তাঁর শরীরে শিবজ্যোতি: প্রসঙ্গটিও অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত। বেহুলা ও শিব যেন একাকার হয়ে উঠেছে। সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা’ গ্রন্থে বেহুলা সম্পর্কে আলোচনায় যা মন্তব্য করেছেন সেটি হল—

“লেখক বোধ হয় এ গদ্য রচনাটিতে সতীত্বের সেরা মূর্তি বেহুলার মানবিক দিকটির তুলনায় বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন তার অতি-মানবিক সাধনার দিকটি, আর তাতে যে তাঁর সফলতা চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নেই।”^৭

আখ্যানের শেষভাগে বেহুলার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তা আমাদের বাল্মীকি রামায়ণের সীতার কথা মনে করিয়ে দেয়। বেহুলাও সীতার মতো নিজ সিদ্ধান্তেই সভাগৃহ থেকে বিদায় নেয়। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের যে মন্তব্য বেহুলার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সেখানে সমাজ চিত্রের দিকটি উঠে এসেছে।

প্রাচীন কবি দ্বিজ বংশীদাস এবং কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পাঠকে অনুসরণ করে বেহুলা রচনা করলেও, গল্পের মধ্যে লেখক নিজের কল্পনা অতি সামান্যই প্রয়োগ করেছেন বলে স্বীকার করলেও, মনসামঙ্গল কাব্যকে আধুনিক গদ্যের রূপ দিতে গিয়ে এক নতুন আখ্যান রচনা করেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন—

“একটা দ্রব্যের রস স্বয়ং আস্বাদন করা এক কথা এবং অপরকে তুল্যরস

রস-ভাগ প্রদান করিতে পারা, আর এক কথা।”^৮

তাই বলা যায় প্রাচীন কাব্যকে অনুসরণ করলেও লেখকের অজান্তেই হয়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের নবনির্মাণ। অন্যদিকে চাঁদ সদাগরকে প্রাধান্য না দিয়ে বেহুলার চরিত্র অঙ্গনে লেখকের বেশি আগ্রহ, আখ্যানটিকে আরো বেশি স্বতন্ত্র করে তুলেছে, যা লেখক নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। তাই বলা যায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মনসামঙ্গল কাব্যধারার নতুন রূপ দিতে গিয়ে হয়ে উঠেছে এক অভিনব পথের দিশারী।

তথ্যসূত্র:

১. দীনেশচন্দ্র সেন, পৌরাণিকী’, জিজ্ঞাসা, ১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা সংস্করণ, মার্চ ১৯৬৫ খ্রী:, পৃ. ৪
২. তদেব, পৃ. ২৭
৩. তদেব, পৃ. ৪৬
৪. তদেব, পৃ. ৬১।
৫. তদেব, পৃ. ৭৫
৬. তদেব, পৃ. ৮
৭. সনৎকুমার নস্কর, ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা’, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৫.০৮.২০১২, পৃ. ২০৪
৮. দীনেশচন্দ্র সেন, পৌরাণিকী’ জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, প্রথম জিজ্ঞাসা সংস্করণ ১৯৬৫, পৃ.৫

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা-কথার নবনির্মাণ

১৭৯৫ সালের ১৭-ই নভেম্বর কলকাতার চিনেবাজারের কাছে ডোমতলায় রুশ নাট্যরসিক হেরাশিম লেবেডফের উদ্যোগে বেঙ্গলি থিয়েটারে দুটি বাংলা অনুদিত নাটকের মঞ্চস্থকে কেন্দ্র করে সূচনা হয় বাংলা নাটকের। তবে মৌলিক বাংলা নাটকের প্রবেশ্যক রূপে পাওয়া যায় রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীণ-কুল-সর্বস্ব’ (১৮৫৭) নাটকটি। এরপরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারদের হাতে বাংলা নাটক পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ট্রাজেডি, কমেডি, রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার রূপ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে বাংলা নাটক।

পৌরাণিক নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা। বাংলায় গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাট্যরচনার প্রাণপুরুষ। উনিশ শতকের শেষে যাত্রা-কথকতা-হাফ আখড়াইতে অভ্যস্ত সাধারণ বাঙালি দর্শকের মনের কথা সঠিকভাবে আঁচ করে এ ধরনের নাটকের সূচনা করেন গিরিশচন্দ্র। এর পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের হাতে এই পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকের অগ্রগতি ঘটে।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসকে লক্ষ করলে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাত ধরে দেবতার আধিপত্য, অলৌকিকতাবাদ, অদৃষ্টবাদ কমতে থাকে। ভক্তিবাদের জায়গায় যুক্তিবাদ, দৈবী আধিপত্যের বদলে দ্বন্দ্বময়তা প্রখর হয়ে ওঠে। জন্মলগ্নে পৌরাণিক নাটকে অলৌকিকতা ও মিথের প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তীকালে যুক্তি অনুশাসনের দ্বারা তাকে বিচার করে প্রয়োগ করা হয়। আর এই কারণেই দেবত্ব অপেক্ষা পূর্ণ মানবত্ব ক্রমে বেশি প্রাধান্য পায়। পৌরাণিক নাটকে ক্রমশ দ্বন্দ্বই প্রাণ হয়ে ওঠে। দেবতার সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, আস্তিকতার সঙ্গে নাস্তিকতার বিরোধ দেখা যায়। পৌরাণিকতার ছদ্মবেশে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়বাদ প্রচারিত হতে থাকে। পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যা ক্রমে পৌরাণিক নাটকে উপজীব্য হয়ে ওঠে। নিছক ঐতিহ্যের অনুবর্তনের জন্য আর পুরাণ ফিরে এলো না। পুরাণকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন এবং পুরাণের পুনর্জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেন নাট্যকারেরা।

তবে রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত পুরাণকে অবলম্বন করেই শুধু নাটক লেখা হয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষের কাব্য তথা লোকপুরাণকে কেন্দ্র করেও নাটক রচিত হয়। বিশেষ

করে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে আধুনিককালে কতকগুলি নাটক রচিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে মনসার কাহিনীর। এই নাটকগুলির মধ্যে প্রথমেই মন্মথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’ নাটকটির কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৭৬), শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৭৮) এবং সবশেষে শেখর দেবরায়ের ‘মনসা কথা’ (২০০২) নাটকটি পেয়ে থাকি।

উক্ত নাটকগুলিতে মনসা-কথার নবরূপায়ণ কীভাবে ঘটেছে, বর্তমান অধ্যায়ে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রী মন্মথ রায়ের (১৬ জুন, ১৮৯৯-২৬ আগস্ট, ১৯৮৮) নাটক রচনার নানা শাখা-প্রশাখায় ছিল অবাধ বিচরণ। পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, বাণিজ্যিক একাক্ষ নাটক, রূপক নাটক— সব বিষয়েই তিনি লেখনী ধরেছেন। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক রচনায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটক পৌরাণিক হয়েও সমকালের সঙ্গে অধিত। দেশ ও সমাজকে বুঝবার জন্যেই তিনি পুরাণকে প্রতীকের আকারে গ্রহণ করেছেন, পুরাণকে নতুনের বাতাবরণে হাজির করেছেন। ভক্তিবাদের জায়গায় যুক্তিবাদ, আধুনিক জীবনবোধ, স্বাধীনতা কামনা, স্বদেশ প্রীতি, স্বজাত্যবোধ উঠে এসেছে প্রতিটি নাটকে। আসলে ঊনবিংশ শতকের পৌরাণিক নাটকের গতানুগতিকতাকে মন্মথ রায়ই ভাঙার চেষ্টা করেছেন প্রথম। তাই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে পুরাণের বিশেষ ঘটনা বা কাহিনী থাকলেও নেই পৌরাণিক ভাব, আদর্শ ও নীতি। চির ধর্মাদর্শ বা ভক্তিভাবের পরিবর্তে এসেছে গতানুগতিক পৌরাণিক সংস্কার ও নিষ্ঠার প্রতি বিদ্রোহের ইঙ্গিত। ‘চাঁদ সদাগর’, ‘দেবাসুর’, ‘সাবিত্রী’ ইত্যাদি তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অন্যতম।

সচেতন নাট্যকার রূপে মন্মথ রায় অত্যন্ত সতর্ক পর্যবেক্ষণ নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এমন নাটক লিখতে হবে যাতে নাট্যসৃষ্টির প্রধান চমক যেন শুধু অভিনয় কেন্দ্রিক না হয়— নাট্য বিষয় এবং উপস্থাপনার অভিনবত্বের পাশাপাশি তা যেন যুগোপযোগী ও সমকালীন হয়েছে। এই বিশ্বাস থেকেই ১৯২৭ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক রুচি, জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গলের কাহিনী নিয়ে তিনি লিখলেন ‘চাঁদ সদাগর’। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে প্রতিভাষিত করে তুললেন সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তা, স্বাধীনতার কামনা, স্বদেশপ্রীতি, সমানাধিকারের দাবি এবং সর্বাধিক কামনাকে। ১৯২৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিপুল সমারোহে মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় ‘চাঁদ সদাগর’ নাটকটি। ১৯১৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত

মন্মথ রায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মিলিয়ে মোট পঁচিশটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে মনসামঙ্গলের সুপ্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করে তিন অঙ্কের মোট ১৫টি দৃশ্যের লিখিত নাটক ‘চাঁদ সদাগর’। নাটকের প্রথমেই আমরা দেখি কালীদহ তীরে কুঞ্জবীথিতলে বটবৃক্ষের গুড়িতে মাথা রেখে মনসাদেবী অর্দ্ধশায়িতভাবে বিশ্রাম করছেন এবং সপসঙ্গিনীরা গান গেয়ে তাঁর চোখে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। পুত্র আত্মীক সেই মুহূর্তে চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের মনসা পূজা নিষেধাজ্ঞা জারির খবর নিয়ে আসে। পূজা না পাওয়ার যে দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা, সেই সঙ্গে আত্মিকের সংবাদে মনসা আরো ভেঙে পড়েন। এই ঘৃণা, অপমান পাওয়া সত্ত্বেও পূজা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। দান্তিক সদাগরের দর্প চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করেন। কারণ শিবের বিধান অনুযায়ী চাঁদ পূজা না করলে মর্ত্যে মনসা পূজা হবে না। অন্যদিকে চাঁদ সদাগরের সিংহ দুয়ারে বিরাজমান শিব-চণ্ডীর স্বর্ণমূর্তি, সেখানে মনসাপূজা রাজাজ্ঞায় নিষেধ করে দেয়। পূজা দিলে দেবী তাকে ধরণীশ্বর করবে শুনেও চাঁদ নিজের সিদ্ধান্তে অটল, পূজার কথায় থুৎকার দেয়। নাটকের প্রথমেই মনসা ও চাঁদের সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে—

“মনসা। শোন সদাগর ... যদি আমার পূজা কর, ধনরত্ন পুত্রকলত্রে তুমি স্বর্গসুখের অধিকারী হবে। আর যদি পূজা না কর... তোমার সর্বনাশ। চাঁদ। (ঘৃণায় রাগে উত্তেজনা) থুৎ। (নিষ্ঠাবন ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল— হঠাৎ ফিরিয়া) শোন কানী! স্বর্গের শিবশঙ্কু আর মর্ত্যের ধ্বন্তুরী আমার জাগ্রত রক্ষা-কবচ। দেবতা যার সহায়, সে অপদেবতাকে ভয় করে না।”

কুঞ্জবীথি বনে সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে ছলনা করে শিবের মহাজ্ঞান হরণ করেন মনসা। তবুও চাঁদ চেঙ্গমুড়ী কানীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে অপদেবতা বলে। সর্পদেবীর সঙ্গে লড়াই-এ চাঁদের অন্যতম শক্তি ধ্বন্তুরি ওঝার বাড়ির দুয়ারে ধনা ও মনা পাহারা দেয় শনিবারে অমাবস্যায় অশ্লেষা নক্ষত্রে কালবেলায়। মনসার বোন নেতা গোয়ালিনী ছদ্মবেশে ধনা-মনাকে বোকা বানিয়ে দধিভাঙে সাপ রেখে আসে। ধ্বন্তুরি ওঝা, মনসা প্রেরিত সাপের দংশনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেই সঙ্গে সনকার বুক খালি করে চাঁদ-সনকার ছয় পুত্রেরও সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। যায় যাক, তার ছয় পুত্র। কিন্তু ধ্বন্তুরিকে বাঁচাতে বলে চাঁদ ধ্বন্তুরিকে পুনরায় ঘরে বন্ধ করার কথা বলে। ধ্বন্তুরিকে বাঁচাতে না পারলে ছয় পুত্রের পুনর্জীবনের কথা না ভেবে দামামা বাজিয়ে নগরে নগরে প্রচার করে, রাজ্যে যে মনসাপূজা করবে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। ছয়পুত্রের মায়া, বন্ধন, মোহ সব কাটিয়ে সে আপন

শৌর্ষে উজ্জ্বল হয়। রাজপ্রাসাদে শিব মন্দিরের সামনে চাঁদ শোকে ভেঙে পড়লে দেবী চণ্ডী স্বয়ং এই শোককে গর্বের ও গৌরবের শোক বলে উল্লেখ করেন। চাঁদ মৃত্যু কামনা করলে এই দুর্দশাকে কঠিন পরীক্ষা বলেন গৃহদেবী চণ্ডী। চাঁদের নিজের বাড়িতেই মনসার ঘট স্থাপিত হয়েছে জেনে দেবী চণ্ডী বাড়ি থেকে বিদায় নেন। চাঁদের মতে সেই সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবও গৃহত্যাগ করেছেন। সনকা গর্ভের সন্তানের মঙ্গল কামনায় শিব-চণ্ডীর বিগ্রহের নিচে যে মনসার ঘট স্থাপন করেন, চাঁদ জানতে পেরে তা ভেঙে ফেলে এবং রক্ষী সৈন্যগণকে আদেশ দেয় গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার করতে যে চাঁদের রাজ্যে শুধু মনসাপূজাই নিষেধ নয়, যে যেখানে মনসার ঘট দেখবে, পদাঘাতে তা ভেঙে ফেলে। সনকাকে উদ্দেশ্য করে বলে—

“চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট অটুহাস্য) পুত্র হবে। সোনার চাঁদ পুত্র হবে! ছয় ছয় পুত্রের শোক ভুলিয়ে দেবে— তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে মনসার পূজা চাই! (সনকাকে লক্ষ্য করিয়া) কেমন পূজা হলো! চেষ্টামুড়ী কানীর এমনি পূজা দেশে দেশে প্রচার করার জন্য আমি বাণিজ্যে যাব। দুর্যোধন, আমার সপ্তডিঙা মধুকর সাজাও ...”২

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আমরা দেখি মধুকর, শঙ্খচূড়, রত্নাবলী, দুর্গাবর, খরসান, উদয়তারা ও কাজলরেখা ইত্যাদি সপ্তডিঙা নিয়ে চাঁদ সদাগর দক্ষিণ পাটনের তীরে মিত্র চন্দ্রকেতুর দেশে যায় বাণিজ্য করতে। মিত্র চন্দ্রকেতু দক্ষিণ পাটনে মনসাপূজার প্রচলন করেছে। তাঁর মনে মনসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঞ্চার করবে চাঁদ এই ভয়ে দেবী কালিদেহে বাড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত সহ তুফানের সৃষ্টি করে সপ্তডিঙা মধুকর ধ্বংস করে দেন। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ চন্দ্রকেতুর প্রাসাদে গিয়ে উঠবেন, তারপর নিজের কপালে পদাঘাত ও থুংকার মিলবে ভেবে দেবী মনসা মনোবল হারিয়ে ফেলেন। নেতা হয় মারতে নয় মরতে বললে মনসা দুঃখের সহিত বলেন—

“মনসা। মরবার উপায় নেই নেতা। শিব যখন জন্মদাতা, তখন দেবতা বইকি। ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে, অত্যাচারে সহস্রবার মৃত্যুকামনা করলেও মরণ নেই... মরণ নেই।”৩

অন্যদিকে সরাসরি না মেরে মায়াযুদ্ধে চাঁদকে শায়েস্তা করার সংকল্প করেন। কালীদেহের তুফানে চাঁদকে ডুবিয়ে দিয়ে নেতা কর্তৃক কালীদেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরণের দৈববাণী শুনিয়া প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন। মায়াবলে দেবী চাঁদকে পদ্মফুলের দ্বারা বাঁচিয়ে তুললে চাঁদ মনসার কৃপায় বাঁচতে নারাজ। চাঁদের এই নিষ্ঠা দেখে মনসা মুগ্ধ হয়েছেন, বিস্মিতও হয়েছেন। এই জন্যই চাঁদের হাতে

পূজা পাবার লোভে মনসা আজ মাতাল হয়ে চললেন। কোনরকমে প্রাণটুকু নিয়ে বন্ধু চন্দ্রকেতুর প্রাসাদে গিয়ে উঠলে সেখানে মনসা পূজার আয়োজন দেখে চাঁদ অতিক্রান্ত বেরিয়ে পড়েন।

নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই দেখি নিছনিগরের সায় সদাগর তথা বেহুলার পিতা বাণিজ্য থেকে ফিরে প্রাসাদ ভবনের মধ্যস্থ নাটমন্দিরে পুরোহিতের সঙ্গে নগরের ইন্দ্রপূজা সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত। সেই সঙ্গে দৌবারিকের মুখে সর্পহত্যার কথা শুনলে তিনি আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে নিজ রাজ্যে সর্পনাশের জন্য মনসা দেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নিজের অজ্ঞতার জন্য দেবীর কাছে মিনতি করে। সায় সদাগরের কাছে পিতার সংবাদ জানতে এলে লখীন্দরের সঙ্গে সদাগর কন্যা তথা নগরের শ্রেষ্ঠ নর্তকী বেহুলার সাক্ষাৎ হয়। বেহুলা-লখীন্দরের সূক্ষ্ম রোমান্টিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। বেহুলা ময়ূর ও হাতীর দাঁতের সিঁদুর কৌটা আবদার করে লখীন্দরের কাছে। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত বেহুলার বিবাহের বাকদান করেন সায়বনে লখীন্দরের কাছে ইন্দ্রদেবতা ও মনসার কাছে আশীর্বাদ নিয়ে। অন্যদিকে লখীন্দরের ময়ূর নিছনিগরের সাপ মেরেছে শুনে দেবী চণ্ডীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রাসাদে মনসার যজ্ঞের আয়োজন করে সনকা। চাঁদের পুরীতে এই মনসা পূজার আয়োজন, চণ্ডীর এই পুরীতে মনসার যজ্ঞ, ধন্বন্তরীর দেশে সর্পপূজা এই সমস্ত মেনে নিতে পারেনি চাঁদ ভৃত্য নেড়া। তার অন্তরের হাহাকার নাটকে অন্যমাত্রা নিয়ে এসেছে। যজ্ঞস্থানে সর্পের জন্য দুধ-কলার আয়োজন করলে সেখানে আকস্মিকভাবে বেহুলা উপস্থিত হয়। লখীন্দরের অনুরোধে সে পিতাকে নিয়ে চম্পক নগরে শিবপূজা দেখতে এসেছে। এই দৃশ্যেই সব কিছু হারিয়ে, খিড়কির পথে, ছিন্ন ভিন্ন বেশে চম্পকনগরের অধিপতি চাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ঘটে এবং পুত্র লখীন্দরের সঙ্গে চাঁদের সাক্ষাত হয়। মনসার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে মহাসমারোহে বেহুলা লখীন্দরের বিবাহের আয়োজন করে। সাঁতালি পর্বতে লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ এবং লৌহের ভিত্তিযুক্ত ঘরেও কর্মকার কালুকে সর্পদংশনের ভয় দেখিয়ে সূচ প্রমাণ ছিদ্র রাখতে বাধ্য করান নেতা ও দেবী মনসা। বাসরঘরে সতী বেহুলা অহীরাজ, মহীরাজ, সাপকে বন্দী করতে পারলেও কালনাগিনী সাপের দংশনে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হয়। চাঁদ এখানে চেঙ্গমুড়ী কানীর উচ্ছিষ্ট দেহ জলে ভাসিয়ে দিতে বলে এই আশায় যে অনেক সময় জলের গুণে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। যা পুরাণেও রয়েছে এবং তিনি গল্পেও শুনেছেন। নাটকে দেখি বেহুলাকে চাঁদ নিজে ভেলা প্রস্তুত করে দেয়। সাবিত্রী যেমন যমরাজকে জয় করে স্বামী সত্যবানকে পুনর্জীবিত করে, বেহুলাও তেমনি গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায় স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য। বেহুলার এই কষ্ট দেবী মনসা সহ্য করতে না পেরে বেদনাগ্রস্ত হন এবং নেতা ধোপানীকে

পাঠান বেহুলাকে স্বর্গের পথ দেখাতে—

“মনসা। আর তো ও দৃশ্য দেখতে পারিনে বোন। ঐ গলিত-চন্দ্রাবৃত কঙ্কাল,
তাই নিয়ে চলেছে— দিনের পর দিন-রাত্রির পর রাত্রি— ক্ষুধার তাড়না সহ্য
করে, ঘুম জয় করে, ভয় ভাবনা বিসর্জন দিয়ে চলেছে— পথের শেষ নেই—
তবু চলেছে। ওর ঐ কষ্ট আর তো আমি সহ্য করতে পারছি নে বোন।”^৪

স্বর্গের ধোপানী নেতা কর্তৃক পুত্র-বৃশ্চিককে চপেটাঘাতে মেরে ফেলা এবং পুনরায় জীবিত করার
দৃশ্যে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার পথ খুঁজে পেয়ে নেতার কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চায়।
নেতার সহযোগিতায় বেহুলা স্বর্গে দেবসভায় উপস্থিত হয়ে নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সকলের
মন জয় করে এবং পুরস্কার স্বরূপ স্বামীর পুনর্জীবন চায়। চাঁদ সদাগর মনসার পূজা না করায় লখীন্দরের
জীবন ফিরিয়ে দিতে দেবতাগণ ইতঃস্তত করলে এবং উপায় খুঁজতে মরিয়া হলে মনসা নিজেই
পুরস্কার প্রদানের কথা বলেন। চাঁদ পূজা করেনি জেনেও বেহুলার মতো তাপসী, সতীকুলনারীর
চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দেন। যে নারী স্বামীকে পুনর্জীবিত
করার লক্ষ্যে নিজের জীবন ত্যাগ না করে অনির্দিষ্ট পথে ভেসে যেতে পারে— তাকে পুরস্কৃত
করতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে যদি নিজের পূজা পাওয়ার আশা চিরকালের মতো
অন্তর্হিত হয় হোক। তাতে কোনো দুঃখ নেই। মনসা নিজেই পূজা পাওয়ার আশা ত্যাগ করলে
বেহুলা-লখীন্দর মহাদেবী মনসার পূজা করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। নাটকের শেষে দেখি বেহুলা
চম্পকনগরের প্রাসাদে উপস্থিত হয় এবং প্রাসাদের মন্দিরেই সনকার সঙ্গে মনসা পূজার আরাতি
দেয়। চাঁদ মনসা প্রতিমা চূর্ণ করতে গেলে হতশাবা বাঘিনীর মতো সনকা বাধা দেয়। তার হারানো
শেষ সন্তান লখীন্দর বেঁচে উঠবে এই আশা নিয়ে সনকা উজ্জ্বল প্রতিমা মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করে
বিষহরি দেবীর পূজা করছে, স্বামী চাঁদ তাতে বাধা দিতে গেলে কান্নার সহিত তাঁর প্রতি অভিযোগ
জানায়—

“সে তোমার আদরের খেলনা ... আমার কষ্টের ধন... তুমি বোঝ না ... তাকে
পাওয়া কতখানি কষ্ট! ... পূজার বাজী রেখে তোমার খেলনা হারিয়েছ আর
আমি হারিয়েছি ... আমার দুঃখের মাণিক... কষ্টের ধন।”^৫

নিজের স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে এবং নিজের প্রাসাদ মন্দিরে মনসার প্রতিমা দেখে দুঃখে কষ্টে চাঁদ
রাজ্যে মনসা পূজা করার কথা ঘোষণা করতে আদেশ দেয়। কিন্তু নিজে ভৃত্য নেড়ার সঙ্গে গৃহ
ত্যাগ করে, রাজ্য ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় যেতে উদ্যত হয়। চম্পমুড়ী কানী মনসাকে ভীষণ

দেবতা, কাপুরুষের দেবতা, দুর্বলের দেবতা বলে। চাঁদের মতো সামান্য মানবের জন্য মনসার ভক্তরা এতদিন পূজা করতে পারেনি। আজ সেই শাসনের দড়ি আলগা করলেন, ওরা ছুটেছে দেবীর পায়ে পদ্মফুলের ঢিল ছুঁড়তে।

নাটকের শেষে দেখা যায় ব্রহ্মা নয়, বিষ্ণু নয়, শিব নয়— মা মনসার দয়ায় লখীন্দর পুনর্জন্ম পেয়ে চম্পকনগরে ফিরে আসে, প্রতিদানে দেবীকে চাঁদ সদাগরের পূজা নিবেদনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তবে যে হাতে দেবাদিদেব মহাদেবকে পূজা নিবেদন করেছেন, সেই হাতে মনসা পূজা করবেন না চাঁদ। এই সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে শিবের আবির্ভাব ঘটে এবং চাঁদকে মনসা পূজা করার আদেশ দেন। মনসার সঙ্গে বিরোধের কারণে চাঁদ শিবের শিরোভূষণ থেকে সর্প বাদ দিয়েছেন। নিজের খেয়াল বশে অসম্পূর্ণ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দাঙিকতার, অহঙ্কারের ও আত্মস্তুরিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পূজা দত্তের সামগ্রী নয়— পূজা আত্মার বিনয়। যা বহুকাল ধরে চাঁদের পূজা থেকে নির্বাসিত হয়েছে। নাট্যকার এই প্রসঙ্গে শিবের মুখে যে সংলাপটি দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“যদি শিব বিরাট হন— যদি শিব অসীম অনন্ত হন... তবে ঐ মনসাদেবী ...
তিনিও কি তারই বিরাট অসীম অনন্ত রূপের অন্তর্ভুক্ত নন?... মনসা যে
শিবাত্মজা। সকল দেবতাই যে সেই দেবাদিদেবের আংশিক রূপান্তর মাত্র।
... যার এই জ্ঞান নেই অথবা যার ভেদজ্ঞান এত প্রবল ... সে শিবপূজা
করে না... মূর্ত্তার পূজা করে ... সে ক্ষুদ্রতার পূজা করে ... তার পূজা—
পূজা নয় ... তার পূজা ব্যভিচার।”^৬

চাঁদ অনুশোচনাগ্রস্থ হয়ে ইষ্টদেবতা মহাদেবকে দেখা দিতে বললে পদতলে মনসা আসীন শিবমূর্ত্তির প্রকাশ পায়। শিব এখানে মনসাকে নিজের মানস কন্যা রূপে অভিহিত করেছেন। আরো বলেন—
বেহুলার অলৌকিক তপস্যা, অস্বাভাবিক সততায় মুগ্ধ, বিস্মিত ও প্রীত হয়েছেন মনসাদেবী। নিজের পূজা পাওয়ার আশা ত্যাগ করে মহাদেবীর মতো বিপুল ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে লখীন্দরকে জীবিত করে তোলেন। আপাত দৃষ্টিতে দেবী মনসার পরাজয় মনে হলেও মহাদেবী থেকে মহত্তর হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই দেবীকে পূজা করা আসলে শিবকেই পূজা করার নামান্তর মাত্র।
চাঁদ অত্যন্ত সকাতিরভাবে শিবের কাছে নিবেদন রাখেন— যে হাতে তাঁর পূজা করে, সে হাতে মনসার পূজা কীভাবে করবে। মনসা এখানে স্পষ্টভাবে বলেন যে— বাম হাতে পূজা পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন— “বাম হাতেই আমায় পূজা দাও চাঁদ ... আমি তাতেই প্রীত হব।”^৭ মনসার এই

প্রস্তাব ও সনকা-বেহুলার আবেগপ্রবণ অনুরোধে চাঁদ নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে বাম হাতে পূজা দিতে সম্মত হয়। ডান হাতে চোখ বন্ধ করে বাম হাতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চাঁদ যেন ভেঙে পড়ে।

প্রবল হৃদয়বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে যেখানে নাট্যঘটনা প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন সেখানেই মন্থরায়ের নাট্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির অন্তহীন সংগ্রামকে ক্ষতবিক্ষত মানুষের চরিত্র চিত্রণেই অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আপাত অসামঞ্জস্য ক্রিয়াকলাপ পর্ব তাঁর নাটকে ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। চরিত্রের বলিষ্ঠতা, দার্ঢ্য, স্পর্ধিত মহিমা ও চমকপ্রদ আচরণ দেখানোতেই তাঁর শৈল্পিক উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। সেই জন্য পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশেই তাঁর নাট্যপ্রতিভা এক মহিমান্বিত স্তর স্পর্শ করেছে। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জগতের পাত্র-পাত্রীদের বর্ণাঢ্য জীবন এবং হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ডতা যেখানে তিনি দেখিয়েছেন সেখানে অতিনাটকীয়তা সত্ত্বেও ঘটনার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর প্রথম দিকের সৃষ্টি আলোচ্য ‘চাঁদ সদাগর’ সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ ‘মন্থরায়ের গ্রন্থাবলীর ভূমিকাংশে যা বলেছেন এখানে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“চাঁদ সদাগর নাটকে কংসের ন্যায় দেবদ্রোহী চাঁদ সদাগর চরিত্রের ট্রাজিক মাহাত্ম্য নাট্যকার সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। চাঁদ সদাগরের বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও অপরাজেয় পৌরুষ নাটকের মধ্যে ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। নাটকের মনসা চরিত্রের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবীর অকারণ নীচতা এক উদ্দেশ্যহীন ক্ষতিকারকতার নিদর্শন দেখা যায় না। বলা বাহুল্য মন্থরায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির ন্যায় এই নাটকেও ভক্তিরস অপেক্ষা মানবীয় রসই প্রধান হয়ে উঠেছে।”^৮

মনসামঙ্গলের সুপ্রচলিত কাহিনীকে অনুসরণ করে ‘চাঁদ সদাগর’ রচনা করলেও নাট্যকারের ভাবনায় নতুনরূপে গড়ে উঠেছে নাটকটি। আসলে তিনি শিল্পী ও স্রষ্টার সামাজিক, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী থেকেছেন আজীবন। দুই-এর দশক থেকে আটের দশক—এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের অসংখ্য ওঠানামা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে বিচিত্র-টানাপোড়েন ও পটপরিবর্তন। সময়ের সঙ্গে সব সময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। ফলে তাঁর সমাজচিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন বিবর্তিত হয়েছে— দেশাত্মবোধক জাতীয়বাদী গান্ধী নীতি পরিবর্তিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটক নির্মাণের (১৯২৭-১৯৩৮)

মধ্যে উঠে এসেছে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী ভাবনা এবং স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই যুগধর্মকে অস্বীকার করে নয়, অঙ্গীকার করে লিখেছেন। তবে লক্ষণীয় এই যে, তাঁর সর্ববিধ চিন্তা ও সৃষ্টির মূল কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে, সবার উপরে স্থান দিয়েছেন মনুষ্যত্বকে, মানবতাকে। ১৯২৭ সালে আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, নাট্যকার, ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার কর্ণধার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি লেখেন পৌরাণিক শৈলীতে তিন অঙ্কের ‘চাঁদ সদাগর’ নাটক। পৌরাণিক কাহিনী কাঠামোর মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেন আধুনিক মনন ও সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদ। মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধকে এ নাটকে প্রতিভাত করা হয়েছে বৃহত্তর শক্তির দ্বন্দ্বের প্রতীক হিসেবে। মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে চাঁদ সদাগর ও মনসার বিরোধ ও তার ফলে চাঁদের জীবনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়— সপ্তডিঙ্গা মধুকর জলে তলিয়ে যাওয়া, ছয় পুত্রের মৃত্যু, লখীন্দরের মৃত্যু, মৃতস্বামীকে নিয়ে পুত্রবধূ বেহুলার কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার অনমনীয় তপস্যা— কিছুতেই চাঁদের অকল্পিত দৃঢ়তাকে আন্দোলিত করতে পারে না। দেবদ্রোহী চাঁদ সদাগরের বজ্রকঠোর অমিতবীর্য, অসম্ভব সাহস পাঠক এবং দর্শককে অবগে উদ্বেল করে। বিদ্রোহী চাঁদের সংগ্রামী মনোভাব বহন করে আনে আধুনিক জীবনচেতনা। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ ও চাঁদ সদাগরের বিরোধের মধ্যে আভাসিত হতে দেখে শাসকের সঙ্গে শোষিতের দ্বন্দ্বের ছবি। এই প্রসঙ্গে সমালোচক ড. জয়ন্তী ঘোষ তাঁর ‘মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন’ বই-এ যে মন্তব্যটি করেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“মন্মথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে মানবিক সংগ্রামী চরিত্রের নাট্যরূপ। চাঁদ সদাগর দেবী মনসার বিরুদ্ধে যে কঠিন সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা নিয়ে অটল চরিত্রশক্তির পরিচয় দিয়েছিল, বিংশ শতকের পরাধীন বাঙালী চরিত্রে সেই তেজ ও বীর্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলেই নাট্যকার সুদৃঢ় পুরাণের পরিবর্তে বাঙালীর পুরাণকেই তাঁর প্রথম আদর্শ করেছিলেন।”^৯

কিন্তু এই সবকিছু ছাপিয়ে এ নাটকে বড় হয়ে উঠে পৌরাণিক দেবী চরিত্রের আধুনিক মানবীকরণ। ‘মনসা’ হয়ে ওঠে নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি। চাঁদবেনে বেহুলা লখীন্দরের পুরোনো কাহিনীকে নতুন শৈলীতে মন্মথ রায় নতুন করে আধুনিক সংলাপে, চরিত্রায়ণের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উপস্থিত করলেন। বেহুলা প্রচলিত বিধি নিয়মকে অস্বীকার করে পরিচয় দেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির। আর মনসাকে মনে হয় বাংলার অবহেলিত নারীত্বের এক অশ্রুসজল প্রতিমা।

হাজার চেষ্টা করেও মনসা চাঁদের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে পারে না। এই দুঃখে-কষ্টে-যন্ত্রণায় তার ঘুম আসে না। কারণ চাঁদ পূজা না করলে মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচলন হবে না। তবে মনসামঙ্গলের দেবী মনসার মতো এখানে মনসা সরাসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আসে না চাঁদের সঙ্গে। অপমান, দুঃখ, যন্ত্রণা, ঘৃণা পেয়েও পূজা পাওয়ার চেষ্টা করে। নাটকে দেখা যায়— মনসা পুত্র আন্তিকের সাহায্য নিয়েছেন। আন্তিক দেবীর পূজার অনুমতির জন্য সরাসরি চাঁদ সদাগরের কাছে যান। চাঁদের প্রাসাদ মন্দিরে দেবী চণ্ডীর মূর্তি দেখে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে। যে চণ্ডীর সঙ্গে মায়ের বিরোধ, এবং যার কৃতকাজের জন্যে মায়ের কমল আঁখিতে আঘাত চিহ্ন, তার স্বর্ণমূর্তি দেখে ক্রোধিত হয় আন্তিক—

“সেই চণ্ডী... সেই চণ্ডীর স্বর্ণমূর্তি দেখে এলুম— তুমার মূর্তি শিবের বাম পার্শ্বে ...এই চাঁদ সদাগরের সিংহদ্বারের পুরোবস্তী মন্দিরে। আমি ভেঙে এলুম না কেন সেই স্বর্ণ-মূর্তি। আমি চুরমার করে দিয়ে এলুম না কেন রাক্ষসীর মিথ্যা প্রতিবিশ্ব।”^{১০}

নাটকে এই আন্তিক পর্বটি অভিনব সংযোজন করেছেন নাট্যকার। নেতা চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। মনসা যেখানে সরাসরি সংগ্রামে না গিয়ে মায়াযুদ্ধের দ্বারা চাঁদকে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক সময় নেতাকে দেখা যায় মনসা পূজা প্রচারের জন্যে চাঁদকে চ্যালেঞ্জ করতে। মনসার পরামর্শদাত্রী এবং ভগিনী রূপে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলকাব্যে নেতাকে পেয়ে থাকলেও আলোচ্য নাটকে নেতা হয়েছে মনসার সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে কয়েকগুণ এগিয়ে। মনসার সঙ্গে কখনো ‘সপ্তডিঙা মধুকর’ ভাসিয়ে দেয়, আবার কখনো নিজে গোয়ালিনী বেশে ধন্বন্তরি ওঝার বাড়িতে দধি ভাঙুর মধ্যে সাপ রেখে আসে যা ওঝার প্রাণ নাশ করে। বেহুলার সঙ্গে কথোপকথনে নেতার মুখে যা শোনা যায়, তা আমাদের সাধারণ ঘরের নারীর পরিচয় দেয়—

“ভারি দরদ যে আমার পেটের ছেলে আমি বেশ করেছি, মেরে ফেলেছি, তোমার কি! মায়ের চেয়ে যে মাসীর দরদ দেখছি বেশী। আবার সে মাসীও যেমন— তেমন মাসী নয়, কার মাথা খেয়ে এসেছেন। কে ওটি? কার হাড় চিবিয়েছ? সোয়ামী?”^{১১}

ছলনা করে বেহুলাকে দেবসভায় নিয়ে যাওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটি নাট্যকার অতি সাধারণ সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। নেতা চরিত্রটি যেন নতুনভাবে উঠে এসেছে এখানে। নাটকে ধনা-মনার মতো লোভী চরিত্রও বিদূষকের মতো কাজ করেছে। ধন্বন্তরি বাবার ভক্তদের কাছ থেকে দক্ষিণার

ফলমূল নিজেরা খেয়ে ফেলে, আবার গোয়ালিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তিত্বহীন এই চরিত্র দুটি নাট্যঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে যা নাটকটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। নাটকে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব এবং চাঁদের সঙ্গে কথোপকথন, চাঁদকে সাহসপ্রদান ও প্রাসাদে মনসা পূজা হওয়ার জন্য দেবীর গৃহত্যাগ করা প্রভৃতি দৃশ্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়— নিছনিগরের সাপের চিরন্তন শত্রু ময়ূরকে চমৎকার নাটকীয় কৌশলে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকে দেখা যায়— বেহুলার পিতা সায়বেনে নাকি মনসাপূজক এবং চাঁদসদাগরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহের ব্যাপারে নাকি পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছিলেন। কালীদহে ‘মধুকর’ ডুবে যাবার পর পিতৃ-অম্বেষী লখীন্দর সায়বেনের কাছে নিখোঁজ পিতার সংবাদ পান। এই রকম অনেক নতুন তথ্য নাটকটির মধ্যে পাব। নাটকটিতে রয়েছে— রোমান্সের সূক্ষ্ম এক তন্তুজাল, যার বয়নটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে উদ্ভিন্ন যৌবন নর-নারী লখীন্দর ও বেহুলার প্রেমের পূর্বরাগে। লক্ষ্যযোগ্য চরিত্র হিসেবে নাট্যকার এখানেই গড়ে তুলেছেন সদ্য তরুণ লখীন্দরকে। লখীন্দর এ নাটকে দৈব-দুর্যোগের অসহায় বলি হয়েই কেবল দেখা দেয়নি, তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রেম বুভুক্ষু এক পুরুষ সত্তা। নাটকে মানস কাহিনী উপস্থাপনা ও ঘটনা বয়ন কৌশলের মধ্যে অভিনবত্ব এনে সেই সঙ্গে মিথের নতুনত্বের ব্যাখ্যা নাটকটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। নাটকের শেষের অঙ্কে আমরা যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে শিবের আবির্ভাব এবং মনসার পূজা করা হল তারই পূজার নামাস্তর, মনসাকে নিজের আত্মজা বলে স্বীকৃতি ইত্যাদি নতুনতর ব্যাখ্যায় নাট্যরস চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রাচীন কাব্যের মতো শর্তারোপের পথে নয়, নাট্যকার চাঁদকে দিয়ে মনসাপূজা করিয়ে নেওয়ার যে ভিন্ন কৌশল নাটকটিকে মনসামঙ্গল কাব্যের এক নতুন নাট্যরূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে। মনসাদেবী সম্পর্কে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা’ গ্রন্থে যে বক্তব্য রেখেছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“নাটকের উপান্তে মনসাচরিত্র পূর্বের ত্রুরভাব কিছুটা বদলে স্নেহময়ী ও ক্ষমাপ্রবণ হয়ে উঠেছে। বেহুলার অপরিসীম দুঃখ অনুভব করেই বোধহয় মনসার এ পরিবর্তন।”^{১২}

চাঁদের কাছে পূজা প্রচারের আবেদন রাখলেও, তাকে মায়াজালে বিপদে ফেললে তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন। তাই নেতার সামনে অনায়াসেই বলতে পারেন— পূজা আমার চাইনে, চাঁদ বেঁচে উঠুক এটাই চাই। সদ্য বিবাহিতা, স্বামীহারা বেহুলার একনিষ্ঠতায়, পাতিব্রতায় মুগ্ধ হয়ে লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দেন। চাঁদের প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে নিয়তিকে অস্বীকার করার যে পন্থা, দেবী মনসার

কাছে আত্মসমর্পণ নয় বরং ছলে বলে দেবী মাহাত্ম্য মানিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ— যাই হোক না কেন? সবকিছুর উর্দ্বৈ মানবতার জয়গান ঘোষিত হয়েছে নাটকের মধ্যে। তাই এখানে পৌরাণিক নাটক হয়ে উঠেছে আধুনিক নাটক। সেই সময়ের পরাধীন ভারত জীবনাকাঙ্ক্ষাই যেন ফুটে উঠেছে। ভক্তি বিশ্বাসের পথে নয়— তাঁর আগে যে দুজন নাট্যকার পুরোনো পথ ত্যাগ করে তাঁদের নাটকে মানবিক চেতনার যে ধারা আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সেই ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চেতনার ধারাটাই মন্মথ রায় আরও প্রসারিত করেছিলেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের কাব্যের বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে নাটক রচনা করতে গিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে অভিনব নাটকের সৃষ্টি করেছেন। ‘চাঁদ সদাগর’ নাটকটি নাট্যকারের ভাবনায় যেমন, তেমনি প্রকরণের দিক দিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের আধুনিক রূপায়ণ হয়ে উঠেছে।

মনসা দেবীর মিথকে গ্রহণ করে মন্মথ রায়ের ‘চাঁদসদাগর’ নাটকের পরে নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৭৬) নাটকটি আমরা পেয়ে থাকি। এই নাটকে মনসা কথার মিথ কীভাবে রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তবে প্রথমে নাটকার সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

বাংলা নাট্যশিল্প ও নাট্যমঞ্চের জগতের অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩) মানভূম জেলার বোপো গ্রামে ১৯৩৩-এর ৩০ শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কুলটি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আসানসোল কলেজে আসেন আই.এ. পড়ার জন্য। এখানেই তাঁর নাট্যজীবনের গোড়াপত্তন হয়। পরে কলকাতায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে বি.এ. পড়ার সময় ১৯৫৬ সাল থেকে গণনাট্য সংঘের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। এই পর্বে তিনি ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ নামে একটি নাটক রচনা ও নির্দেশনা করেন। ১৯৬০-এর ২৯ শে জুন গণনাট্য সংঘের একটি শাখা হিসেবেই তিনি গড়ে তোলেন ‘নান্দীকার’ নাট্যসংঘ। এই নাট্যসংঘকে কেন্দ্র করেই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিস্ফুটন ঘটে। এই সময় তিনি বহু মৌলিক নাটক এবং রূপান্তরিত নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন। এগুলির মধ্যে আছে— ‘সেতুবন্ধন’, ‘সওদাগরের নৌকা’, ‘মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরী’, ‘শের আফগান’, ‘তিন পয়সার পালা’, ‘বীতংশ’, ‘নট্যবিনোদিনী’, ‘শাহী সংবাদ’, ‘ভালোমানুষ’, ‘মুদ্রারাক্ষস’, ‘হে সময় উত্তাল সময়’ প্রভৃতি নাটক। এছাড়া ‘অগ্নি বিষয়ক সতর্কতা’, ‘ফুটবল’ ইত্যাদি নাটক কোথাও নির্দেশনা ও অভিনয়, কোথাও বা শুধু নির্দেশনা বা শুধু অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নান্দীকারে থাকাকালীন তিনি

অন্যান্য যে সব নাটকের নির্দেশনা বা অভিনয়ে যুক্ত হয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— ‘অন্ধযুগ’, ‘একটি রাজনৈতিক হত্যা’, ‘বাঘিনী’, ‘থানা থেকে আসছি’, ‘এই অরণ্যে’ ইত্যাদি। তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত ‘নাট্যকারের সন্ধান ৬টি চরিত্র’ অভিনয় নিয়ে মূল সংস্থার সঙ্গে বিতর্কের ফলে ১৯৭৭-এর ৯ই সেপ্টেম্বর ‘নান্দীকার’ থেকে বেরিয়ে ‘নান্দীমুখ’ নামে স্বতন্ত্র নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর রূপান্তরিত, নির্দেশিত ও অভিনীত শেষ অসামান্য অবদান তলস্তয়-এর ‘পাওয়ার অব ডার্কনেস’ অবলম্বনে রূপান্তরিত নাটক ‘পাপপুণ্য’।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যগীত রচনা এবং সুরসৃষ্টিতে যে অনায়াস দক্ষতা ছিল তা তিনি প্রমাণ করেছেন— ‘তিন পয়সার পালা’, ‘হে সময় উত্তাল সময়’, ‘ভালোমানুষ’, ‘আমরা সবাই যাবো কুল পাড়তে’, ‘ইচ্ছা’ ইত্যাদি নাটকে। তিনি যে মঞ্চ সজ্জাতেও হাত লাগিয়েছিলেন তার প্রমাণ ‘পরিণীতা’ নাটকটি। এই নাট্যকর্মের পাশাপাশি তিনি উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ইত্যাদিও লিখে গেছেন। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে তিনি দুটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নাট্যকর্মে নিবেদিত করেন। যদিও বেশ কয়েকটি হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্র, এমনকি যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তবুও তাঁর প্রথম ও একমাত্র প্রেম ছিল বাংলা নাট্যমঞ্চ। তিনি সংগীত ও নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মস্কো নিউজ ক্লাব, ক্রিটিক সার্কল অফ ইণ্ডিয়া, দিশারী, বঙ্গসভা ইত্যাদি বহু সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি আবার চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই অসামান্য অভিনেতা, নির্দেশক ও সার্বিক নাট্যকর্মীর ব্যস্ততম কর্মজীবনের উপর আকস্মিকভাবে ছেদ পড়ে ১৯৮৩-র ১৪ই অক্টোবর।

‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৭৮) নাটকে নাট্যকার শম্ভু মিত্র যেমন মধ্যযুগের কাহিনীকে অনুসরণ করে বর্তমানের সমস্যা দীর্ঘ মানবসভ্যতার মূল্যায়ন করেন, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আগেই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি করেন আর এক নতুন মঙ্গলকাব্য— ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৭৬, ৩০ শে অক্টোবর) তিনি মনসা-পুরাণের কাব্যাদর্শকে ব্যবহার করে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলেন নাট্য শিল্পের এক নতুন আদর্শ। তাঁর ‘সওদাগরের নৌকা’ অভিনয়ের এক মহান চরিত্রের বেদনাময় পরিণতি নিয়ে রচিত নাটক হয়ে ওঠে নিজস্ব এক সময়ের দর্পণ। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের নেতা, নাট্যশিল্পের সর্বক্ষেত্রের কর্মী ও আপোষহীন সংগ্রামী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটি রচনা করেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিধ্বস্ত সময়ের পটভূমিকায়। ‘নান্দীকার’ প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৬

খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর। বাংলা অ্যাকাডেমিতে অভিনীত এই নাটকের প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নাট্যকার নিজেই। নাটকটিতে প্রসন্ন চরিত্রকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ চরিত্র উঠে আসে। সেখানে মনসামঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণ না হলেও মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সওদাগরের অনুসঙ্গে নির্মিত হয়েছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। মূল নাটকের ক্ষেত্রে কোন অঙ্ক বিভাজন আমরা দেখি না, প্রচলিত রীতি না মেনে টানা একটি দৃশ্য নাটকের কাহিনী এগিয়ে গেছে। মূল চরিত্র প্রসন্ন, তার স্ত্রী সতী, ছেলে কালো, এছাড়া আশা, হরিসাধন, মাধব গড়াই, প্রতিবেশিনী, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্র। নাটকটিতে বৃদ্ধ প্রসন্ন নিম্নবিত্ত সংসারের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। নাটকের শুরুতেই আমরা চাঁদ সদাগরের অনুসঙ্গ দেখতে পাই। বৃদ্ধ প্রসন্ন তার নিজের ঘরে ঢুকতে মাথা নিচু করতে নারাজ। কারণ চাঁদ সদাগর কখনো কোনদিন মাথা নিচু করেননি। তাই একসময়ের যাত্রাদলের অভিনেতা যিনি কিনা চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, নিজেকে এখনো চাঁদ সদাগরের সঙ্গে একাত্ম মনে করেন; চাঁদের দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা পৌরুষত্বকে আত্মস্থ করতে চান, চাঁদ সদাগরের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে অনুভব করেন তাই অনায়াসেই তার মুখে শোনা যায় যখন স্ত্রী মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকতে বলে— “মাথা নিচু করলে বড়ো লাগে। চাঁদ সদাগর কিনা মাথা নিচু করেনি।”^{১০} এভাবেই আমরা লক্ষ্য করি যে প্রসন্নের চেতনায় মঙ্গল কাব্যের মিথিক্যাল আদর্শ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। দীর্ঘ দিনের অভিনেতা প্রসন্ন পালাগানের আসরে রাতের পর রাত মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সওদাগরের চরিত্রে অভিনয় করে হাজার হাজার মানুষের মনোরঞ্জন করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তে কখন চাঁদ সওদাগর হয়ে উঠেছে জানে না। তার প্রত্যেকটি কথায়-বার্তায়, কর্মে ভাবনায়, আচার-আচরণে অতীতের স্মৃতি ভেসে ওঠে। অভিনয় করতে করতে বৃদ্ধ বয়সেও সে অভিনয়ের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। নিজের জীবন-যৌবন ফিরে পেতে চায়। পাগলাগারদে থাকা জীবনের অন্ধকারময় সময় ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় সে। চুলে কলপ লাগিয়ে নিজের বয়স কমাতে চায়। চাঁদ সওদাগরের মতো বৃদ্ধ বয়সেও সে নিজেকে ব্যর্থতার পথে যেতে দেয় না। নিজের মধ্যে আবার হারিয়ে যাওয়া উদ্যম খুঁজে পেতে চায়, পালাগানে চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে চাঁদ চরিত্রের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে চায়। এখানে আমরা দেখি, প্রায় অথর্ব হয়ে পড়া প্রসন্নের হৃদয়ে ভিড় করে আসে অভিনয় জীবনের নানা ঘটনা। জীবনের সাফল্যময় দিনগুলি হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তীব্র অসহায়তা ও হাহাকার বুকে নিয়ে অনুভব করে— অভিনয় তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। সেই অভিনয় জগতের চরিত্রের সংলাপই তার অন্তরের ভাষা, তার

মানসিক আশ্রয় হয়ে ওঠে। তাই অতীত জীবনে বহু অভিনীত চরিত্রগুলির অনুজ্জল ও জীর্ণ পোশাকগুলি ঘরের দড়িতে মেলে ধরে। নাট্যকারের ভাষায় উঠে আসে—

“সম্প্রতি তিনি একজন ক্লান্ত নাবিকের মতো দড়িটা কাঁধে নিয়ে এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে পোশাকগুলি আটকে দিচ্ছেন।”^{১৪}

অভিনয়কে ভালোবেসেছিলেন বলেই অভিনয় জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সারাজীবন কাটাতে চায়। যার ফলে বাস্তব জগতকে উপলব্ধি করতে, নিজেকে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে খুব কম পেরেছে; সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব তিনি কখনোই করতে পারেনি। তার সংসারে ছায়া ফেলেছে চরম দারিদ্র্য ও অসম্পূর্ণতা। ঘর-বাড়ি, জমি-জমা, টাকা-কড়ি, কিছুই করতে পারেনি। পারেনি স্ত্রীকে সুখী করতে। একমাত্র সন্তান কালোকে মনের মতো করে মানুষ করতে পারেনি। ম্যাট্রিক পাশ করা, ইংরেজি জানা প্রসন্ন শুধুমাত্র পাগলামির নেশার জন্য মানুষের কাছে সমীহ পায়নি, কোন সম্মান পায়নি। তবুও প্রসন্ন আশার আলো দেখতে চায়। হবু পুত্রবধূর সেবায়ত্ন পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়, যা উদ্দীপকের কাজে লাগবে। বৃদ্ধ প্রসন্ন আবার আসরে নেমে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে লোককে হাসিয়ে-কাঁদিয়ে মাতিয়ে তুলবে। অন্যদিকে আবার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে সে। কল্পনার জগতে বিচরণ করতে চায় না। নিজের জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করে জীবন সম্পর্কে যে, মানুষ কেন দিবাশ্বপ্ন দেখে? মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। দিবাশ্বপ্নের বজ্রধ্বনিতেই সে উন্মাদ হয়ে পড়ে, স্বপ্নের পতঙ্গ তাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়, প্রসন্নে থাকতে চায়। আরো পাঁচজনের মতো তাস খেলে, জোরে হেসে, মড়া পুড়িয়ে, পুজো-উপবাস করে সে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু বর্ষার ফলার মতো সজীব স্বপ্ন তাকে বারবার বিদ্ধ করে যন্ত্রণার অশ্রুতে মাখিয়ে তাকে ভিজিয়ে রাখে, তা থেকে কোন নিস্তার নেই।

পুত্র কালোর মধ্যেও এক আত্মসংকট ও আত্মজিজ্ঞাসা দেখা দেয়। বাস্তব জগতের সত্যগুলিকে অনুভব করে সে নিজের জীবনের অগ্রগতির প্রতি সন্দিহান। বেঁচে থাকার জন্য সে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে চায়। সমাজের যারা অন্য লোকের ভালো করার কথা বলে, তারা নিজেরাই আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে। দেশে এমন কোন লোক নেই যে অন্যকে খেতে পরতে দেবে। কারণ একটা ভুঙা নাস্তা লোক সে আরেকটা লোককে কীভাবে খেতে পরতে দেবে। মানুষের মূল্যবোধ, আত্মসম্মান, আত্ম মানবতার থেকে অর্থই যে সব থেকে বড় মানুষের কাছে তা কালোর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। লেখাপড়া করতে না পারার যন্ত্রণা, জীবনে সুখ না পাওয়ার যন্ত্রণায় তার মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। উচ্চ বংশের ছেলে হয়েও কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে, বেশি

টাকার লোভে ওভারটাইমও করে সে। তার মতে বাঁদর নাচানোতে সবচেয়ে বেশি টাকা হলে মানুষের কাছে বাঁদর নাচানোই সবচেয়ে সম্মানের কাজ। নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবে মরিয়া হয়ে ওঠে কালো এবং মাকে বলে—

“মা, তুমি আমাকে কেন জন্ম দিলে, মা? যদি দিলে তাহলে কেন এমন করে মুখ্য করে, গরিব করে এমন নোংরায় আমাকে বড়ো হতে দিলে! মা, না হয় বামুনের ছেলে হয়ে, পূজো করে সারাজীবন খেয়ে বেড়াতুম। কিন্তু এ কী হল! এ যে পুরোনোটাও ছাড়তে পারি না, নতুনটাকেও বিশ্বাস করতে পারি না। আমি যা, আর যা হতে চাই—এ দুটোতে যে দু-দিক ধরে ধরে ছিঁড়ছে আমাকে।”^{১৫}

নাটকটিতে অনেক ক্ষেত্রেই কালোকে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের পুত্র লখীন্দরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নাট্যকার মধ্যযুগের সাহিত্যের লখীন্দর চরিত্রকে মাথায় রেখেই কালো চরিত্রের নির্মাণ করেছেন, একথা নিঃসন্দেহ। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য পিতাকে দায়ী করে কালো, অনায়াসেই পিতাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেয়; এমনকি, পিতার উপরে হাত তুলতেও পিছপা সে হয় না। এই সমস্ত হতাশাময় অভিব্যক্তি ও আচরণ যখন সংসারের বুকে আছড়ে পড়ে তখন তা শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি থাকে না, তা সাতের দশকের অস্থির সময়ের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকা যুবসমাজের অন্তরের হাহাকার হয়ে ওঠে। শেষে কালোর পিতৃবিদ্বেষী মনোভাবের পরিবর্তন হয়। নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়, পিতার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। লখীন্দরের মতোই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অস্তিত্বের সংকটে পড়ে কালো। এটা আসলে বিশ শতকের সাতের দশকের বিপন্নতাই যেন তরুণ সমাজের সামনে অস্থিরতা, যন্ত্রণা, ক্ষোভ ও অভিমান হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই সময়ের সংকটকে তুলে ধরতে গিয়ে কালো চরিত্রের নির্মাণ করেছেন শিল্পী।

মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের ‘সপ্তডিঙা মধুকর ডুবে’ যায়, ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটে, সপ্তম সন্তান লখীন্দরকে সর্পে দংশন করে। সবকিছু হারিয়েও চাঁদ আত্মশান্তিতে অটুট থাকেন, নিজেকে হারিয়ে দেয় না। পুনরায় সচেতন হয়— পাড়ি দিতে, বাণিজ্যের নৌকা ভাসাতে। এই আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে অটল চাঁদ প্রতীকীরূপে প্রসঙ্গর কাছে হয়ে ওঠে আদর্শ। চাঁদ বণিক যেমন নতুনকে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, তাই আরাধ্য দেবতা শিবকে ছেড়ে লৌকিক দেবী মনসার পূজা করতে নারাজ। প্রসঙ্গও যাত্রাদলের সঙ্গী হরিসাধনের কাছে মেয়েদের যাত্রা করার কথায় চমকে ওঠে। তৎকালীন মেয়ে মানুষের চরিত্ররক্ষার চেয়ে জীবন ধারণই যে মুখ্য তা হরিসাধনের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক স্বদেশী যাত্রা সমস্ত স্তিমিত হয়ে গিয়ে এসেছে নবযুগ। যত দ্রুত পাল্টানোর কথা তারও থেকে অনেক তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে। অত্যন্ত আশঙ্কার সুরে প্রসন্নর মুখে শোনা যায়—

“মহাকাল রথে আসেন, চাকার ঘর্ঘর শুনে যদি বরণমালা নিয়ে পথের
পাশে দাঁড়াও তো টিকলে, নয় স্পর্ধা করে রুখতে যাও তো বুকের পাঁজরা
গুড়িয়ে দিয়ে যাবে রথ।”^{১৬}

এতকিছুর মধ্যেও নিজস্ব মনোবল হারায় না প্রসন্ন। তাই পুনরায় সে বন্ধু হরিসাধনের কথায় মাধব গড়াই-এর যাত্রাদলে চাঁদ চরিত্রের অভিনয় করতে চায়। যাত্রাদলের লাইনে পাগল বলে তার দুর্নাম রটে গেলেও আসরে দাঁড়ালে আবার অমনি করে আসর কাঁপিয়ে দিতে পারে বলে তার আশা। বর্তমানকে ভালোবেসে পুনরায় ভবিষ্যতের ওপর ভরসা করতে ইচ্ছে করে, আশা-আনন্দে ভরে ওঠে, মন ভালো হয়ে যায়। তার এই অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বিশ্বানুভূতিতে পরিণত হয়। প্রসন্নর উক্তি তে তাই উঠে আসে—

“আমি থাকব না তাতে কী? মানুষ থাকবে। যতদিন আমার ভোগ ছিল
আমি ভোগ করেছি, এখন আমার গান গাওয়ার পালা ফুরিয়েছে এখন
অন্য কবি গান গাইবে। তানপুরোটা তার হাতে তুলে দিয়ে বাকি রাতটুকু
অন্ধকারে বসে তার গান শুনে কাটিয়ে দেব।”^{১৭}

তবে সাধারণ মানুষের মতো সে নিজেকে হারায়, নিজেরই কাছে। অন্তরের শুভ রাম আর অশুভ রাবণ তার মধ্যে প্রতিনিয়ত খোঁচা মারতে থাকে। নিজেকে স্বার্থপরের মতো ভালোবাসে বলেই শুভর জয়বার্তা যা মানুষের চিরকালের বাণী, তাকে হারায়। তাই সারাজীবন শান্তি পায়না অথচ খুঁজে মরে চিরকালটা। চিরকালের সব মানুষের মতো সেই সার্থকতার তীর্থে চিরকালের যাত্রী বলে ধ্বংসের ধারালো খজ্ঞের সামনে থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। তবুও যখন মনের আলো ঝলকায় তখনও আহত দেহে, রক্তাক্ত শরীরে, চোখে চাবুক খাওয়ার আরবি ঘোড়ার মতো সে লড়াই করে। নিজে ক্ষয় হতে হতেও মিথ্যার দশ আঙুলে কণ্ঠনালী ছিন্ন হতে দিয়েও সত্যের জয়গান করে। চাঁদ সদাগর একসময় যেমন পাগল হয়ে বনে বনে ফেরেন দেবী মনসার সঙ্গে বিরোধিতায় গিয়ে, নাটকেও যাত্রাদলের অভিনয়ের নেশা প্রসন্নকে পাগল করে ছাড়ে। মনসামঙ্গল কাব্যে যেমন দেখি চাঁদ সদাগর সবকিছু হারিয়ে একসময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, নিজের দুর্দশার জন্য নিজেকেই দায়ী করেন। সন্তান-সন্ততিদের হারিয়ে, ধনসম্পত্তি হারিয়ে নিঃশ্বাস হয়ে পড়েন। ‘সওদাগরের নৌকা’

নাটকের প্রসঙ্গ চরিত্রের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। নিজেকে দায়ী মনে করে সে। যতটা বিদ্যে সে আহরণ করতে চেয়েছে অথচ কাজে লাগায়নি কিছুই। তার এটাই দুঃখ যতটা কাজ ও ক্ষমতা ছিল এই বিদ্যেকে কাজে লাগানোর তা করতে উঠতে পারেনি। সেই সঞ্চিত পুঞ্জিভূত বিদ্যে নিজের মধ্যে অব্যবহৃত দাহ্যশক্তির মতো অগ্নিক্রিয়া করে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে সম্পূর্ণ মানুষ, স্বাভাবিক মানুষ হয়ে থাকতে পারেনি। হারিয়ে যাওয়া সোনালী দিনগুলি ভেবে আনন্দে-দুঃখে মন ভরে ওঠে। জীবনের পরিপূর্ণতা না চেয়ে প্রতাপ চেয়েছিল সে। হয়তো একচক্ষু হরিণের মতোই গর্বিত ছিল, তাই প্রতিযোগিতার মৃত্যুবাণে মারা পড়ল সে। নবযুগের পথিকদের সঙ্গে পুরনো দণ্ড নিয়ে লড়াইতে গিয়েছিল, শেষে নিজেই পাগল প্রমাণিত হল। তার মতে বর্তমানের মজে যাওয়া, মরা, ধসা সময়ের সাগরের বালিয়াড়িতে তার মন জ্বলে শেষ হয়ে গিয়ে শুধু শরীরটা বেঁচে রয়েছে। ভালো হতে চেয়েও পারেনি। পাঁচজনের মতো হতে চেয়েও নিজেরই অজান্তে পাঁচজনের থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছে হারতে হারতে। এতদিন ধরে ভাবনা ও কিছু করার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পায়, কোন মিলই নেই। তাই তার মনে হয় বেঁচে থেকেও বন্ধু সাধনের মতো মরে গেছে।

নাটকের শেষে দেখা যায় নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে এবং অনেকটা অর্থের তাগিদে কালিকৃষ্ণের ‘নব যুগ অপেরা’য় ‘চাঁদ সদাগর’ যাত্রাপালায় কমিক চরিত্র গোদামালোর ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হয়। কালের নিয়মে নায়ক হয়ে পড়ে বিদূষক। প্রসঙ্গের মতে, মহাকাল নায়কের সাজ খুলে ফেলে দিয়ে মুখে অনেক বলিরেখা এঁকেছেন যে, এতাবৎ কাল তাকে স্বচ্ছন্দে বিদূষক মানায়। বিদূষকের অভিনয় করতে করতে তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হলেও আসরের মধ্যে হাততালি বেজে ওঠে সার্থকতার অধ্যায়ে। তবুও সে নিজে বাঁচার জন্য, ছেলের অভিশাপ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য যাত্রাদলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। প্রসঙ্গ তার স্ত্রীকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচার দুর্মর প্রত্যাশায় এবং রোজগার করতে পারলে কালোও তাদেরকে ‘মান্য’ দিবে এই ভেবে আবার কাজে যায়। কারণ জীবনে যা কিছু মানুষ চাই সবই টাকার মধ্যে প্রতীকে আবদ্ধ হয়ে আছে। এখানে আমাদের ফিরে যেতে হয় মনসামঙ্গলের শেষের দৃশ্যে। সেখানে চাঁদ যে অসহায়ের মতো কনিষ্ঠ পুত্রবধু বেহুলার পরামর্শে বাম হাতে হলেও মনসার পূজা দিতে বাধ্য হন, এখানেও তেমনি সময়ের ব্যবধানে ‘চাঁদ সদাগর’ থেকে ‘গোদা’ চরিত্রের অভিনয় করতে হয় প্রসঙ্গকে। আশার আলো তবুও দেখা যায় যখন স্ত্রী সতীর মুখে শোনা যায়—

“তুমি ভালো করে কাজ করলেই আবার চাঁদ সাজতে পারবে একদিন

না একদিন।”^{১৮}

নাটকে দেবী মনসাকে লৌকিক দেবী, সাধারণ মানুষের দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেশিনী কন্যা ও প্রসন্নর হবু পুত্রবধূ আশার কাছে মনসা যেন মানুষের মতো জেদি, অন্য ঠাকুর দেবতার মতো না। আশার বক্তব্যে কথাটি ফুটে উঠেছে এভাবে—

“মনসাকে আমার ভালো লাগে না, কেমন যেন। ... কেমন জেদি,

কেমন ঠাকুর দেবতার মতো না, কেমন যেন মানুষের মতো।”^{১৯}

আবার প্রসন্নর দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসা চরিত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে অন্যভাবে। মনসা যে সাধারণ মানুষের দেবতা তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। প্রসন্নর মুখে খুব যুক্তিপূর্ণ ও সমাজনির্ভর মনোভাব প্রতিষ্ঠা করে জানান মানুষই ভেবেছে মনসাকে। আর সব দেবতারা সাবেকি, মনসা নতুন ঠাকুর। অন্য দেবতাদের কল্পনা করেছে ব্রাহ্মণ ঋষিরা, মনসাকে কল্পনা করেছে লোকেরা। তার যে মানুষের মতো ব্যবহার, দেবতার এই কল্পনাই যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের নতুন স্বর্গ কল্পনা। এ যে প্রচণ্ড শক্তির মানুষের সঙ্গে অল্প শক্তি মানুষের কল্পনা। ফলাফল নিশ্চিত। তবু চাঁদ যখন দেহের শক্তিতে হারেন তখন মনসাও আত্মার শক্তিতে হেরে তার সমান হন। তখন সে হেরেও তারই জিৎ। এইভাবে নাট্যকার মিথের ঐতিহ্যকে আজকের মানুষের চরিত্র মহিমার সঙ্গে মিলিয়েছেন। মনসার পরিচয় দুইভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন নাট্যকার।

চাঁদ প্রসন্নর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ চরিত্রের আইডিয়া ও আদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায় নাটকে, সেখানে চাঁদের সঙ্গে তাকে পৃথক করা যায় না। নাটকটি আরো জীবন্ত হয়ে উঠে সেই মধ্যযুগীয় বাণী যখন ভেসে ওঠে ‘সওদাগর, নৌকা ভাসাও’। শেষ বয়সে প্রসন্ন বিরাট গাঁয়ে যে অভিনয় করতে যায়। সেখানে সন্ধ্যার পরে খেয়েদেয়ে হ্যারিকেন হাতে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে হাজার হাজার লোক। অসময়ের মেঘ ও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে যেন ধ্বনিত হচ্ছে এই একটাই কথা— যে কথা শুনে মানুষ বারবার পাগল হয়ে ঘর ছেড়েছে, যে কথা আসরে মানুষের মনে মাঠে ঘাটে, শিশিরে ঘাসের পাতায়, রাতের পাখিদের বাসায় বাসায় জাগ্রত পাহারাওয়ালার চোখের পাতায় শিহরণ তুলে— ‘সওদাগর, নৌকা ভাসাও’-এর সঙ্গে সঙ্গে সাপের বাঁশি বেজে ওঠে, দুলতে থাকে শঙ্খচূড়ের নাচের তালে হিংস্র ঘরছাড়ানো সুর। প্রিয় জনেরা যেন বলতে থাকে— ও লখীন্দরের মা, তোমার স্বামীকে বোঝাও। সাত-সাতটা ছেলে যে তোমার মনসার রোষে মরেছে সপ্তডিঙার মারণলীলায়, ঘরে তার সাত-সাতটি পূর্ণ যৌবনা পুত্রবধূ। মনসামঙ্গলের আবহ রয়েছে নাটকটির পরতে পরতে। কাহিনীর পরিণতিতে দেখি নাট্যকার অদ্ভুত এক সাংকেতিকতার পরিমণ্ডল

তৈরি করেন। সেখানে কম্পিত ঢেউ-এর উপর ভেসে ওঠে নৌকা, সুদীর্ঘ অতীত আছড়ে পড়ে বর্তমানের পরিসরে। প্রসন্নকে মনে হয় ‘চাঁদ’ এবং তার স্ত্রীকে মনে হয় ‘সনকা’।

কাহিনীর এই পরিণতিতে যাওয়ার জন্য অবশ্য নাট্যকার সূচনা থেকেই গভীর আবেগধর্মী পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন। শিল্পী প্রসন্নের জীবনের পূর্ণতা খোঁজা তার অভিনয় জগতের মধ্যেই। তাই প্রসন্ন শিল্পকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়। একদিন শিল্পের মধ্যে দিয়েই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায়। অতীতে অভিনীত চরিত্রের অনুজ্জ্বল পোশাকগুলি সাজাতে সাজাতে তাই মগ্ন হয়ে পড়ে। সেই সব জরি আর ভেলভেটের পোশাক আঁকড়ে ধরে ক্লান্ত নাবিকের মতো পথ খোঁজে। নাগিনীর ছোবলের মৃত্যুকে আটকানোর চেষ্টা করে। নতুন করে বাঁচার অবলম্বন খোঁজে। প্রসন্ন যেমন বন্ধু হরিসাধনের কাছে অনুতাপ করে বলে যে— আবার সেই রঙিন ঘরে, সেই চলচ্চিত্র দিয়ে ছাওয়া চন্দ্রাতাপের নিচে, ময়ূরপালকের মতো বিচিত্র আসরে, সব উৎকর্ষিত বিচিত্র চোখের সামনে চরিত্র সেজে দাঁড়ানোর দিন কি আর ফিরে আসবে। এই বিষণ্ণতা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে পালাগান অভিনয় করতে যায়। মাধবগড়াই-এর সঙ্গে চুক্তি করে চল্লিশ টাকা সম্মানী ও দেড় টাকা জলখাবারের বিনিময়ে আসানসোল থেকে মধুতটি হয়ে চিনাসুর অতিক্রম করে তেরো ক্রোশ দূরের গ্রামে ‘চাঁদ সদাগর’ পালায় চাঁদের চরিত্রে অভিনয় করতে যায়। এইভাবে শিল্পী প্রসন্নকে একদিন চলে যেতে হয় পালাগানের আলোকিত জগৎ পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আসলে নাট্যকার বোঝাতে চেষ্টা করেন যে শিল্পীদের কোথাও ধরে রাখা যায় না। যারা শিল্পী জীবনের আলোকিত পথের যাত্রী তাদের চাঁদ সদাগরের মতো এককভাবে পাড়ি দিতে হয়। তাই কাহিনীর অন্যতম এক চরিত্র কালীকৃষ্ণের কথায় প্রসন্ন পালাগানের জন্য নিরুদ্দেশের স্রোতে ভাসতে যাত্রা করে। অসহায়ভাবে পড়ে থাকে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সংসার। সে চাঁদ বণিকের মতোই জীবন সমুদ্রে সওদাগরের নৌকা ভাসায়। স্ত্রী সতীকে বলে—

“বড়ো বউ, শুনতে পাচ্ছ, ময়ূরপঙ্খী দুলছে? নাগিনীর মতো ঢেউ উঠছে ফুলে ফুলে, পালে দক্ষিণের হাওয়া লেগে সামুদ্রিক জলচরের পেটের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমার চারিদিক থেকে মহতী ধ্বনির বেগবান গান উঠছে প্রকম্পিত হয়ে, সেই আদিমতম পরমতম ঘর ছাড়ার ডাক ‘সওদাগর, নৌকা ভাসাও—’”^{২০}

নাটকে কালীকৃষ্ণের মুখে শোনা যায় যে এবার তবে, সওদাগর নৌকা ভাসাও। এই হার-জিতের পার্থক্য হারিয়ে যাওয়া জীবন যেন চাঁদ সদাগরের সমুদ্রে যাত্রা। এই অকূল পাথারে যাত্রার আবেগ আরো ঘনীভূত হয় যখন তার স্ত্রী সতী বলে সে কখনোই একা থাকবে না— একথা ভেবে স্বামী

প্রসন্নকে খুশী থাকতে বলে। বর্ষার জন্য জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে পুরানো কালের মতোই, অনেকদিন ধরেই অনেক কাল ধরেই, অনেক সময় ধরেই। প্রসন্ন ও সতীর এই মনোভাব ও অফুরন্ত আবেগ যখন ঝরে পড়ে তখন এই দুই চরিত্র যেন হয়ে ওঠে পুরাণের চরিত্র। তারা যেন মনসামঙ্গলের পরাজিত, ব্যর্থ অথচ আপন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল চাঁদ সদাগর ও সনকা হয়ে ওঠে। নাট্যকার প্রচলিত মিথের এই ঐতিহ্যকে আরো গভীরতর করার উদ্দেশ্যে আবহ নির্মাণ করেন সেভাবেই—

“দিকবিদিক থেকে ‘নৌকা ভাসাও’ এই ঐক্যতান যেন তাদের ডুবিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। অদৃশ্য সূত্রের আলোতে প্রসন্নকে চাঁদ এবং কালোর মাকে সনকার মতো পৌরাণিক মনে হয়। ওঁদের দুজনের উপরে আলোর ঢেউ কাঁপছে এবং বর্তমান কাল যেন আলোতে ঐক্যতানে অনন্ত সময়ের গুহায় বারংবার উচ্ছলিত আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিরন্তর।”^{২২}

এইভাবে নাট্যকার প্রচলিত ‘মিথ’ ও মনসামঙ্গলের কাহিনীকে সমকালের বিধ্বস্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরে তৈরি করেন প্রত্ন ঐতিহ্যের নতুন রূপ। প্রতীকীভাবে এর মধ্যে পুনর্নির্মিত হয় প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যের আর এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আধুনিক নাটকের সংরূপে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী মনসা ও চাঁদ বণিকের মধ্যকার যে সংঘাত সেই মিথকে আর একভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে। এই নাটকের বিশ্লেষণের পূর্বে নাট্যকার শম্ভু মিত্র সম্পর্কে দু’চার কথা বলা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপকার শম্ভু মিত্রের (১৯১৫-৯৭) অন্যতম মৌলিক নাটক ‘চাঁদ বণিকের পালা’। বিশ শতকের মধ্য পর্বের নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি কামনা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। প্রথা ও এক ঘেয়েমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেতু ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ‘শ্রীরঙ্গম’ নাট্যমঞ্চের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন এবং অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ-এর মধ্যে তিনি ‘জবানবন্দী’, ‘অভিলাষ’, ‘নবান্ন’, ‘মুক্তধারা’ প্রভৃতি নাটক পরিচালনা করেন। বিশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকটি গ্রন্থাকারে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস) প্রকাশিত হলেও ‘বহুরূপী’ নাট্য পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়। বটুক ছদ্মনামে লিখিত নাটকটি ‘বহুরূপী’ পত্রিকায় ২৪, ২৬, ৩৩ ও ৪৩

সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় নাট্যকারের স্বনামেই তা ছাপা হয়। মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারা মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকটি রচিত।

‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। তৃতীয় পর্বটি আবার দুটি উপপর্বে বিন্যস্ত।

যথা—

১. প্রথম পর্ব

২. দ্বিতীয় পর্ব

৩. তৃতীয় পর্ব

i. তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশ

ii. তৃতীয় পর্বের শেষাংশ

প্রথম পর্বের সূচনাতেই দেখা যায়— অতীত বাংলার গাঙ্গুড় নদীর তীরের চম্পক নগরী। এই চম্পক নগরীর যৌবনের প্রতীক সমস্ত লোকজন। অন্ধকারের মধ্যে অনেকের কণ্ঠে একটা উল্লাস-চিৎকার শোনা যায়। উচ্ছল কোলাহলের মধ্যে চাঁদ সদাগরের নৌবহরের এক সাথী লাফিয়ে উঠে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবার কথা ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গী-সাথীরাও দূর-দূরান্তের পথে পাড়ি দেওয়ার সংকল্প করে। এই সমুদ্র যাত্রার প্রধান কুলিক চাঁদ বণিক এসে সবাইকে সত্যের পথ, জ্ঞানের পথ এবং কর্মের পথের কথা বলেন। সত্যের পথে চলতে গেলে প্রচুর বাধা আসবে, সমাজ সংসারের মানুষ শুধু অপবাদ দিবে। এমনকি, নিজের ঘরের লোক, আত্মীয়-স্বজনের কাছে গালমন্দ ছাড়া কোন জয়ধ্বনি পাওয়া যাবে না। এই অস্থিরতাময় সময়ে সত্য শিবের পূজক হলে মানুষের প্রীতিভাজন হওয়া যায় না, চ্যাংমুড়ী কানী মনসারও ভজনা করতে হবে। তবে চাঁদ এই দ্বিচারিতায় বিশ্বাস করেন না। চম্পক নগরের সৃষ্টিকর্তা বাপ পিতামহদের দল নিজের সাহস, কৌশল ও বুদ্ধির জোরে সুবর্ণভূমি ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন দক্ষিণ সাগরে। তারা কেডার বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তাম্রপত্রির তীরে গিয়ে নোঙ্গর করেছেন। প্রাণ দিয়ে তারা নিজ নিজ প্রাণের সওদা করেছেন। তাই অন্যের কুৎসা না করে, অপরের দোষ না দিয়ে, শৃগালের মতো ধূর্তামি না করে সত্যের পথে পাড়ি দেওয়ার উপদেশ দেন। সমুদ্র যাত্রার প্রধান পুরোহিত চাঁদ সদাগর হাঁক দিয়ে বলেন—

“এ চম্পক নগরীর যতো নিডরিয়া সদাগর ভাই,— সেই সব আত্মার

তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য।

আমাদের জয় কেউ ঠেকাতে পারে না।”^{২২}

সকলে মিলে নায়ক চাঁদ সদাগরের সাথে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হলে সেইসময় করালীচরণ মারফৎ

খবর পান চম্পকনগরের মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্যনগরে এসে পৌঁছেছেন। স্থানীয় মাণ্ডলিক বেণীনন্দন চাঁদ বণিক ও তার সঙ্গীসাথীদের সমুদ্রযাত্রাকে পণ্ড করার জন্য সংবাদ দিয়ে মহামাণ্ডলিককে নিয়ে এসেছেন। বেণীর মতে, ব্যক্তিগত কোন অভিপ্রায় থাকাই উচিত নয়। সমাজের যে আকার তাকে নিয়মশৃঙ্খলায় বেঁধে পরিপাটি করে রাখে শাসনবিধি। তাই এই শাসনবিধিকে অস্বীকার করা যায় না। নিয়মভাঙার যে উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা তা সমাজে কখনই প্রশংসিত পথে পাবে না। আর যদি পায় তাহলে দেশে যেটুকু ভালো আছে সাধারণের কাছে তা শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়বে। তাতে দেশের মঙ্গলের পথে বাধা আসবে। এইরূপ নানাভাবে কৌশল করে চাঁদের নৌযাত্রায় বাধাস্বরূপ বল্লভাচার্যকে দাঁড় করায়। চাঁদ গুরু বল্লভাচার্যের মুখে সমুদ্র যাত্রার নিষেধাজ্ঞার কথা শুনে আশ্চর্য হন। নিজেকে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করেন এবং রাজ্যের ন্যায়, ধর্ম, শৌর্য বাঁচানোর কথা বলেন। ভট্টপাটকবাসী আচার্য বল্লভের এই ইন্দ্রপতন দেখে চাঁদ সত্যের জয়গানের কথা বলেন গুরুকে। চাঁদের বিরুদ্ধে বেণীনন্দনের মনের সংকল্প মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্যের হুকুম নামে ঘোষিত হয়। এতে বল্লভাচার্য ব্যথিত হন। জগতে যে এক অন্ধকার অকাল নেমেছে। যেখানে জ্ঞানের সম্মান নেই, বিদ্যার মর্যাদা নেই, সুভাষণ নেই, মাংসসুখ ছাড়া মানুষের অন্য কোন সুখের চিন্তা নেই। তাই শিষ্য চন্দ্রধরকে মহৎকার্যের কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেন। কালের বিপক্ষে না গিয়ে, আদর্শের পিছনে না ছুটে বাস্তবকে মেনে নেওয়ার কথা বলেন। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সহজ আশার কথা ভাবতে বারণ করেন। শিষ্য চন্দ্রধরকে উপদেশ দেন—

“এ জীবন অর্থহীন। অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, তারা বলো, সব যেন বুদ্ধদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়। সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিলা আন্ধার। এই অভিযান তুমি ছেড়ে দেও চন্দ্রধর, আদর্শের পিছে ছুটো কোন লাভ নাই।”^{২৩}

কিন্তু চাঁদ ও তাঁর সঙ্গীরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে বলে উল্লেখ করেন। তারা নিজেদের জীবনযাপন নিজেদের মতো করেই করতে চান। অন্যের ঘোষণা জারী নিজেদের উপর চাপিয়ে দিলে সেটা মানতে রাজি নয়। তাই তারা সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে ভাগ্যকে ছিনিয়ে আনার সংকল্প করেন। বনমালী, শিবদাস, নরহরি, করালীচরণ ও অন্যান্য সাথীরা সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তখন বনমালীর সঙ্গে চাঁদের সমুদ্র যাত্রায় বালিশ নেওয়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে। চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বের উপর প্রশ্ন তোলে। চাঁদ সদাগরকে ভুয়ো এবং ফন্দিবাজ বলে। গোপনে চুপি চুপি নাকি মনসাপূজা করে।

এরপর নাটকের কাহিনীধারা চাঁদের ঘরের দিকে মোড় নেয়। সনকাকে দেখা যায় মনসার ঘট স্থাপন করে স্তবগান করতে। কাহিনীধারা দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হয় যখন চাঁদ চম্পক নগরীকে চ্যাংমুড়ি কানী মনসার ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্য শিবের কাছে মিনতি করেন। এবং সনকা এই বাক্যে আঁতকে উঠেন। চাঁদ সনকার মনসা পূজার অনুমতি অগ্রাহ্য করে, নানা বাধা সত্ত্বেও মনসার ঘট ভেঙে ফেলেন। এখানে চাঁদ ও স্ত্রী সনকার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে। ধর্মপত্নীর বিশ্বাসাঘাতকতায় চাঁদ অস্থির হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সনকাও স্বামীপুত্র সকলের কল্যাণের জন্য মনসা-পূজা করেছেন। তার মতে রাত্রির অন্ধকারে হিংসা, পাপ, রোগ বৃদ্ধি পায়, অকারণে শত্রুবৃদ্ধি, অকারণে অর্থহানি, শুভঘটনা আকস্মাৎ বিফলে যাওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে পাতালবাসিনী অন্ধকার মনসার পূজা দেন। অকারণে চাঁদের সাধের গুয়াবাড়ির প্রসূতি গাছ, ফল-ফুল-মূল সব একদিনে নষ্ট হয়ে যায়, চাঁদের সবচেয়ে বড় বন্ধু শঙ্কর গারুড়ীর সর্পাঘাতে মৃত্যু, হঠাৎ করে অর্থের সামর্থ্য কমে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনায় সনকা ভেঙে পড়েন। তাই রক্ষা পাওয়ার আশায় মনসাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান, অন্ধকারের পূজা করেন। অন্ধকারের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হন।

অন্যদিকে একই বিছানায় শুয়ে যে নারী অন্য কথা ভেবে গেছেন, জ্ঞানের পূজার ঘরে অজ্ঞানের পূজা করে গেছেন, তাকে চাঁদ কিছুতেই ভরসা করতে পারছেন না। এভাবেই প্রথম পর্বের ঘটনা Climax সূচকে পৌঁছায়।

এই সময় চাঁদ সদাগরের বিশ্বস্ত ভৃত্য ন্যাড়া এসে খবর দেয় চাঁদ-সনকার ছয়পুত্র সর্প বিষে প্রাণ হারিয়েছে। শঙ্কর গারুড়ী মনসার কোপে মারা গেছে তাই ওঝাদের ঘরে ঘরে গিয়ে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেউ আসতে রাজি হয়নি। এই সময় মহাজ্ঞান হারানোর জন্য স্বামীর দিকে প্রশ্ন তোলেন সনকা। অন্যদিকে ঘোষক এসে ঢ্যাঁটারা পিটিয়ে ঘোষণা করেন—

“আজ হ’তে পুনরায় অন্য দেশ না দেয়্যা পর্যন্ত গাঙ্গুড়ের সকল নৌঘাট
হতে নৌকার নোঙ্গর ধুলা এই ঘোষণার দ্বারা মানা করা যায়— ... বিনা
ছাড়পত্রে নৌকার নোঙ্গর খুল্যে যাত্রা করা সুকঠোর দণ্ডযোগ্য অপরাধ
হিসাবেই গণনীয় হয়—।”^{২৪}

কিন্তু চাঁদ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, ছয়পুত্রের মৃতদেহ কলার ভেলায় করে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। বেণীনন্দন নোঙ্গর খোলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করলে চাঁদ ও তার সঙ্গীসাথীরা নোঙ্গরের কাছি কেটে দেওয়া মনস্থির করেন। চাঁদের মতে, ছয়পুত্র মারা গিয়েছে, হয়তো বা আরো পুত্র যাবে। এমনকি তাদের মধ্য থেকেই হয়তো অনেকজন যাবে।

তবুও সকলে মিলে যদি পাড়ি দিতে পারেন তারই মধ্যে আরো অনেক পুত্র বেঁচে উঠবে। সেইসব বীজ একদিন গাছ হবে, মহীরুহ হবে, ফল দিবে, ছায়া দিবে, চম্পক নগরের মুখ হাসিতে ভরাবে। কারণ এখনো এই দেশের অন্তর মরেনি, চম্পক নগর এখনো তাদের ডাকে। অবশেষে সপ্তডিঙার কাছি খুলে মাঝিমাল্লা নিয়ে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন চাঁদ। তবে মাঝিমাল্লাদের অনেকে সমুদ্রযাত্রা নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। যে চম্পক নগরীর জন্য তারা জীবনযৌবন ত্যাগ করছে সেই চম্পকনগরী তাদের কথা কি ভাবছে? জয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাবে বারে বারে সাধারণ নাবিকেরা, আর চাঁদ সদাগর যাবেন বারে বারে বাক্যজাল বুনে, যুক্তি দিয়ে, কথকতা দিয়ে। তাদের পড়ন্ত মন উৎসাহিত করে যাবেন। চাঁদ এভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। নাবিক শিবদাসের কথায়-পাড়ি দিলে সমস্ত মনের ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাঁদ এইভাবে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, অজানা আলোর সন্ধানে, মানুষের সুস্থ পরিবেশের জন্য পাড়ি দিতে থাকেন। কিন্তু মনসা বাম হওয়ায় হঠাৎই সপ্তডিঙা অগাধ কালিদহের ঘূর্ণাচক্রে এসে পড়ে। সাথীরা প্রাণের ভয়ে বাঁচার পথ চাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে চাঁদের মুখে শোনা যায়— “শুধু উদ্দেশ্যটা জানি আমি। পথ তো জানে না কেউ।”^{২৫} একথা শুনে কেউ হতাশ হয়ে হাহাকার করছে। কেউ বা চাঁদকে গালিগালাজ করছে, কেউ আবার হাঁটু গেড়ে বসে আত্মারী মনসা মাতার স্তব করছে। এমতাবস্থায় চাঁদ বিস্মস্ত সিন্ত কেশে একলা ডিঙার মাস্তুল আঁকড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো আরাধ্য শিবকে ডাকতে থাকেন—

“শিব, শিব, শিবাই আমার, পথ কয়্যা দেও, পথ কয়্যা দেও, শিব
মহেশ্বর, পথ কয়্যা দেও।”^{২৬}

প্রথম পর্বের শেষে সনকাকে দেখা যায় শিশু লখীন্দরকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইছেন। একা নারী, সমাজের সমস্ত পুরুষপুঙ্গদের সাথে লড়ে, ছল করে, মিথ্যা কথা বলে কোলের সন্তানকে বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা করে সে। কারণ জন্তু হোক কিংবা যাই হোক ভগবান এই ভার দিয়েছে শুধু মায়েদের উপর। এইভাবে নাটকের প্রথম পর্বের সমাপ্তি টানেন নাটককার।

নাটকের দ্বিতীয় পর্বের ঘটনা শুরু হয়েছে প্রথম পর্বের ঘটনার অনেক বছর পরে। লখীন্দর তখন উদ্দাম বালক, সে সবে যৌবনের ‘অশান্ত আরম্ভের’ দোরগোড়ায়। মায়ের স্নেহবন্ধন লখীন্দরের কাছে পরাধীনতার বন্ধন বলে মনে হয়। বাড়ি থেকে সে চলে যেতে চায় পিতার মতো সেও দূর দেশে পাড়ি দিতে চায়। লখীন্দরের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব কাজ করে। মায়ের বুক মুখ রেখে সে গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা অনুভব করে। আবার অনেক সময় মাকে শত্রু বলে মনে হয়, রাক্ষসী মনে হয়। নিজে যা ভালো বাসেন সেটাই দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে ছিড়ে তছনছ করতে ইচ্ছা করে। তার মতে—

‘কোনটা আমার সত্যকার অনুভব? আমি কিছু বুঝি না মোটেই। আমি যেন
কতোগুল্যা প্রতিক্রিয়া খালি। আমার অঙ্গাতে যেন কীসব ঘটনা ঘটে
আমার ভিতরে— ... কী এটা হয় যেন— অত্যন্ত অস্থির লাগে—’^{২৭}

মায়ের সঙ্গে লখীন্দরের মান-অভিমানের পালা চলে। ইতিমধ্যে চাঁদ বিধ্বস্ত অবস্থায় নিঃশ্ব হাতে
গৃহ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেন। ভৃত্য ন্যাড়া ও সূয়া প্রথমে চাঁদকে চোর বলে প্রতিপন্ন করে। সনকাও
প্রথমাবস্থায় স্বামীকে চিনতে পারেন না, পরক্ষণেই প্রদীপের আলোয় চিনতে পারেন। উপস্থিত
সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করে। কিন্তু আনন্দের এই সদাগরবাড়িতে দরিদ্রতার কারণে
তিনজন ব্যতীত অন্য আর কেউ নেই।

এরই মধ্যে বেণীনন্দন ও তার অনুচরেরা চাঁদের ডিঙাহীন, নিঃশ্বভাবে ফেরৎ আসাতে
চোর-জোচ্চোর বলে নানা কুৎসা-অপপ্রচার রটনা করে সাধারণ লোকসমাজে। সেই সঙ্গে কেবট
ও তার সঙ্গীসাথীরা বনমালীকে নিয়ে চাঁদের স্ত্রী সনকার কলঙ্ক প্রচার করে বেণীনন্দনের সঙ্গে।
সনকাকে গণিকা ও লখীন্দরকে গণিকা সন্তান বলে চিহ্নিত করে। এই মুহূর্তে চাঁদ ও সনকার
কথোপকথনের মাঝখানে ন্যাড়া চাঁদের সম্মুখে লখীন্দরকে এনে হাজির করে। পিতাকে সম্মুখে
পেয়ে হেরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে লখীন্দর। ছোট থেকে যাকে মহাবীর বলে জানত, আজ
তিনি কেন নেউটিয়া হয়ে, ধর্ম পরিবর্তন করে ফিরে আসে সামান্য গৃহস্থ হতে। লখীন্দরের মতে,
মানুষের নিজের একটা পরিচয় থাকে। কিন্তু তারা কি শুধু মুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম ভূমিকায়
অভিনয় করে যাবে। মানুষের মুখ নেই কোন? শুধুই কি মুখোশ? মানুষ কি শুধু প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি?
এর বাইরে মানুষের কোন সত্ত্বা নেই? তাদের উৎস— পিতা, পিতামহ, তারাও জানে না নিজের
পরিচয়। নিজের সত্ত্বাকে তারা এখনো ভালো করে চিনতে পারেনি। শুধু অভিনয় করে যায়।
ইতিহাসও আত্মস্থ রূপের কোন সন্ধান পায় না। শুধু মুখোশের পরে মুখোশ বদলে গেছে। তাই
তাদের কোন পরিচিতি নেই। শুধু নাটুকিয়া খেলা চলে। পিতা-মাতার প্রতি লখীন্দরের নিম্নোক্ত
সংলাপটি নাটকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—

“কেন যে তোমরা সন্তানের জন্ম দেও? এই হেন কুৎসিত জগতে কেন
আমাদের আনো? কোন্ প্রতিশোধ নিতে চাও— আমাদের পরে? এটু ভেবে
কয়্যা দিও একদিন।”^{২৮}

পুত্রের এই বক্তব্য শুনে সদাগর স্বপ্নোথিতের মতো চারিদিকে চেয়ে থাকে। কম্পিত হাত থেকে
হেতালের লাঠি পড়ে যায়। অবলম্বনহীনের মতো বসে পড়ে হঠাৎ অস্ফুট সুরে ‘হায় হায়’ বলে

উঠে।

নাটকের ঘটনা আবার মোড় নেয়— বেণীনন্দন ও বল্লভাচার্যের পুনরায় প্রবেশ ঘটলে। সমাজ কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়, সমাজ শুধু ফল চায়। কিন্তু বৃদ্ধ বল্লভাচার্য শিষ্য চাঁদের ব্যর্থতায় দুঃখিত হয়। কথা সূত্রে জানা যায়— বল্লভাচার্য নয়, বর্তমানে স্থানীয় মহামাণ্ডলিক বেণীনন্দন। রাজনীতির কূটনৈতিক চালের জন্য চাঁদকে নিজের দলে আনতে চেষ্টা করে। বেণীনন্দন নিজের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায় সম্মতি আনার জন্য যে শুধু বিশ্বাসের লগি নিয়ে এ সমুদ্র পার হওয়া কঠিন। কারণ শুধু পাড়ি দিলেই হবে না, দেশে অর্থ আনতে হবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সম্মানের জয়ধ্বনি আনতে হবে। তাহলে যতোই পাপ করো না কেন, চম্পকনগরী তা ক্ষমা করে দিবে। এ সংসারের মানুষ বিচার হয় গাছের মতন বা গাভীর মতন। যত বেশী ফল বা দুগ্ধ দিবে, সমাজে তত বেশি তার মূল্য। তাই চাঁদকে পুনরায় সমুদ্রে পাড়ি দিতে বলেন। ময়ূরপক্ষী ডিঙা তৈরি করে দিয়ে অর্থ, জন, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য যা প্রয়োজন সব দিবে। আসল উদ্দেশ্য হল রাজভক্তের অধিকার পাওয়ার জন্য কিছু লোক বেণীনন্দনের প্রতিপক্ষ হিসাবে একত্র হয়েছে। চাঁদ যাতে কোনভাবেই এই বিপক্ষ দলের সঙ্গে যোগ না দেয়— তাই এই কৌশল। সেই সঙ্গে সম্মতি থাকলে বেণীনন্দনের গৃহের মনসাপূজার আসরে যেতে বলেন বল্লভাচার্য।

দ্বিতীয় পর্বে এরপর চাঁদ ও সনকা একান্ত আপনভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত। চাঁদ এই জটিল পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে চান। শিবভক্ত চাঁদ সত্যপথে এগিয়ে জীবনে জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বস্ব খুইয়ে দিয়েও চ্যাংমুড়ি কানীর কাছে মাথা নত করেননি। তবুও জীবনের এই পরাজয়— চাঁদ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে সনকা স্বামীকে দোষারোপ করেন। কর্তব্যবোধের জোরে চাঁদ শুধু নিজের কাঠিন্যই দেখিয়েছেন। নিজের গর্বের যুপকাঠে পত্নী, পুত্র, সংসার সবকিছুই বলি দিয়েছেন। একসময় সনকার মিনতিপাশ ছিড়ে চলে গেছেন আপনার পৌরুষ দেখাতে। মহাজ্ঞান হারানোর জন্য স্বামীকে অপবিত্র লম্পট পুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন। একদিকে সদাগরের ‘পাড়ি দেওনের’ দায় ও অন্যদিকে সনকার নারীত্বের চাওয়া-পাওয়া— এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব যখন চূড়ান্তমাত্রায় পৌঁছেছে তখন চাঁদ বারবার সনকাকে পুরানো স্মৃতি ভুলে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সনকা নারীত্বের অবমাননার যন্ত্রণা থেকে ক্রোধে ব্যঙ্গ প্রায় উন্মাদিনীর মতো চাঁদ সদাগরকে অভিমানে বলে ওঠেন—

“লম্পট, লম্পট তুমি। তোমার যে পরিচয় তুমি, সমাজে দেখাতে চাও,

সেটা তুমি নয়। আদর্শ-নিষ্ঠার এই অন্তরালে যে মানুষ আছে, সেটা ওই

অহঙ্কারী কুচরিত্র চাঁদ সদাগর। ... দুস্তর সাগর পাড়ি দিয়া জয় নিয়া
আসতের নাবিক প্রধান? হাঃ। হাসি পায়। মিথ্যাবাদী তুমি। কুচরিত্র,
স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী-মিথ্যাবাদী—”২৯

এরপর নাটকের কাহিনী নতুন মোড় নেয়, যখন করালী এসে চাঁদকে জানায়, চম্পকনগরের মধ্যে সে বেগীর বিপক্ষ দল গঠন করেছে। অন্যায় ও অসৎ-এর প্রতীক বেগীনন্দনকে তাড়িয়ে চম্পকনগরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাই চাঁদকে সে অনায়াসেই বলে ওঠেন— তুমি আমাদের দলে যোগ দাও নাবিক প্রধান, তারা চাঁদকে পুনর্বীর পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে। করালী চাঁদকে নিয়ে সম্মান প্রদানের আসর বসাবে। সেখানে চাঁদের সমুদ্রযাত্রা পণ্ড করার জন্য বেগী কিভাবে সচেষ্ট হয়েছিল, চাঁদকে পীড়ন করেছিল এবং বাধাদানের জন্য ঘোষণা জারি করেছিল— তা সবার সম্মুখে বলতে অনুরোধ করে। সেইসঙ্গে বেগীর বিপক্ষ দলের নেতা ভৈরব চাঁদকে তাদের মনসার পূজার আসরে যেতে বলেন। সাধারণ মানুষ যেহেতু মনসাকে বিশ্বাস করে। তাই বেগীর বিপক্ষে শক্তিশালী সংগঠন করতে গেলে এইসব ছোটখাটো পন্থা অবলম্বন করতে হয়। আবার অসৎ মানুষ বেগীর পতন ঘটাতে গেলে অন্যায় পথ অবলম্বন করতেই হবে। ভৈরবের সংলাপে আরো জানা যায় যে, শুদ্ধচিত্ত আদর্শবাদীরা এসে মারপিট করে না। তার জন্যে মদ্যপায়ী দুর্বৃত্তের পোষণের প্রয়োজন হয়। সেরকম আবার সাধারণ মানুষের মন বেগীর বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর প্রয়োজন হয়, তখন তাদের সমস্ত দুর্বদ্ধ সংস্কারগুলি মেনে নিতে হয়। এটাই বাস্তব অবস্থা এগুলি মেনে নিয়েই ন্যায়-নীতিকে স্থির করতে হবে। তাহলেই জয় আসবে, এছাড়া উপায় নেই।

নাটকে দেখা যায়, উভয়পক্ষের রাজনীতির যূপকাঠে বলি হতে হয় চাঁদ সদাগরকে। চাঁদের মধ্যে শুরু হয় দোলাচলতা। আদর্শবাদী চাঁদ বুঝতে পারেন না কোন পথ অবলম্বন করবেন। পথভ্রষ্ট হওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। শেষে দিশেহারা হয়ে পড়েন চাঁদ এবং রাজনীতির খেলার পুতুল হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগত জয়লাভের জন্য সে সমুদ্রে পাড়ি দেয়নি। নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদ্রে সে কোনদিন পাড়ি দেয়নি। তবে আজকে সে কী করে মনসার নাম নিয়ে পাড়ি দিবে। এরই মধ্যে লখীন্দর এসে অভিযোগ করে— পিতার জন্য তাকে ও তার মাকে সকলের কাছে কেন অপমানিত হতে হবে? দুর্বল-লখীন্দর বাস্তবের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় না, তার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারে না। তাই এই দুর্বলতার সাক্ষী ন্যাডাকে তার মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। মানুষকে কৃমির চেয়ে আরো জঘন্য কীট মনে হয়েছে তার। পুত্রের কাছে নিজেকে নিরাপরাধ প্রতিপন্ন করলে এবং তার মধ্যে অপরাধবোধ ঢুকাতে নিষেধ করলে লখীন্দর পিতার

দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ জানায়—

“নিজেরে যে মানুষের চায়্যা কিঞ্চিৎ বিরাট আকৃতি বল্যে মনে কর্যেছিলে
এই অপরাধ। নাটুয়ার মতো রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা
হয়্যা গেছ, ... ভুলপথে চল্যে এল্যে চাঁদ সদাগর, আদ্যোপান্ত ভুল হয়্যা
গেল।”^{৩০}

এই প্রশ্নের উত্তর সদাগরও খুঁজে পায় না। তাই ন্যাড়াকে উদ্দেশ্য করে প্রকারান্তরে নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেন— সনকা, লখাই এরা কেন কষ্ট পায়? তার মধ্যে পাপবোধের জন্যই হয়তো এমতাবস্থা। তাই তার সমস্ত কাজকর্ম ভিতরে ভিতরে মিথ্যা হয়ে যায়। পায়ের গোড়ালির ভেতর দিয়ে হয়তো কোনো শনি ঢুকে বসে আছে তার অন্তরে। এইভাবে চাঁদ যখন নিজেতে নিজে দিশেহারা, তখন আবার নতুন এক অপবাদ এসে জোটে তাঁর কপালে। চাঁদের যৌবন বয়সের নৌযাত্রার সাথী বনমালী শত্রুতা করে মৃত নাবিক দঙ্গদাস, ভবদেব, শিবদাসদের বৃদ্ধ পিতাদের তাঁর সামনে এনে উপস্থিত করে। চাঁদ এদের কোথায় রেখে এসেছেন? তাদের হৃদিশ জানতে চান। শুধুমাত্র কৈফিয়ৎ নয়। চাঁদ তাদের মেরে ফেলে সমস্ত ধনরত্ন, নিজে লুণ্ঠ করে নিয়ে এসেছেন বলে অভিযোগ জানান। সকলকে বচনে-বাচনে ভুলিয়ে, ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্য হবে বলে সবাইকে মুগ্ধ করে বাণিজ্যে নিয়ে গিয়েছিল চাঁদ। ধোঁকা দিয়ে অনেকগুলি মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়, তাদের জীবন ইচ্ছা করে নষ্ট করেছে। অনুগামী হস্তারক, আত্মসুখ সর্বস্ব চাঁদ বণিক বলে অভিযোগ জানায়। এভাবে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের কাছ থেকে একের পর এক অভিযোগ, অপবাদ, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা পেতে থাকেন চাঁদ। চাঁদের মতে, কর্মের চাকায় যদি পাপপুণ্য একসূত্রে গাঁথা হয়ে থাকে, তাহলে বেণী বা ভৈরবের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায়? জীবনের সবকিছু আলুথালু হয়ে গেল বলে উল্লেখ করেন। ন্যাড়ার সঙ্গে কথোপকথনে আরো বলেন যে—

“পরাজিত হয়্যা মনে তো যন্ত্রণা লাগে, পত্নী নাই, পুত্র নাই, তারেপর এই
অপরাধবোধ। তারা ছাড়া আর কোনো বন্ধুজন ছিল না তো কখনো আমার,
ভেবে দেখ, আত্মঘাতী হয়্যা এইসব সমস্যার যন্ত্রণা মিট্যাতে পারি।”^{৩১}

কোনো স্বপ্ন না দেখে, কল্পনার আদর্শ না করে, পাপপুণ্যের বিচার না করে শুধু বেঁচে থাকার কথা ন্যাড়া বললে এর প্রত্যুত্তরে চাঁদ বলেন যে, জীবনে শুধু বেঁচে থাকা বলে কোন কথা নেই। চাঁদ যখন নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু চাঁদের মতো লড়াকু মানুষ এভাবে আত্মহননের পথে যেতে পারে না, তাই পরক্ষণেই পুত্র লখিন্দর তার পিতাকে পুনরায় পাড়ি দেওয়ার কথা

বলে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। বীর চাঁদ যে পাড়ি দেওয়া ছাড়া জীবনে শান্তি পাবে না। পিতার অনুচর হয়ে সঙ্গে যাবে লখীন্দর। তাই তাকে অনুচর করে নিয়ে যেতে বলে। পুত্রের এই আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও সাহচর্য শেষ পর্যন্ত মৃতপ্রায় চাঁদকে আবার নতুন করে প্রাণদান করে। তাঁর অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। পুত্র লখীন্দরকে বীর হওয়ার কথা বলেন। জীবনের যা কিছু আছে সমস্ত দিয়ে, যা সম্মতি আছে তার অর্থ দিয়ে বংশের একমাত্র ভবিষ্যৎ লখীন্দরকে পাড়ি দেওয়ার কথা বলেন। ভবিষ্যৎ একদিন রঙেতে রঙীন হয়, চম্পকনগরী যাতে সুস্থ, মুক্ত, অনর্গল হয়ে যেতে পারে, তাই চাঁদ নিজের যা কিছু আছে সমস্ত উৎসর্গ করে দেউলিয়া হওয়ার কথা বলেন। তাতে যদি চম্পকনগরীর লোক চাঁদকে ভুলে গেলে কোন দুঃখ নেই। নতুন বীরের পাড়ি দেওয়ার পথে জয়ধ্বনি দিয়ে আনন্দে উন্মত্ত হোক চম্পকনগরী। শুধু ভবিষ্যৎ সত্য হোক, এর বাইরে কিছু চায় না চাঁদ। তাই পুত্রকে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য, বীর হওয়ার জন্য আকুতি জানান। এইভাবে পুনরায় পাড়ি দেওয়ার সংকেত দিয়ে নাট্যকার দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটান।

নাটকের তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশের শুরু হয়েছে সূত্রধরের মুখে লখীন্দরের দুস্তর সাগরে পাড়ি দেওয়ার সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। গহ্বরা, গামিনী, ধারিণী, যোগিনী— এই মতো ভিন্ন চাঁদে ভিন্ন নামে চাঁদের সর্বস্ব দিয়ে নৌকা তৈরি হয় লখীন্দর পাড়ি দিবে বলে। কাঠুরিয়ার দল অরণ্যের গর্ভে ঘুরে ঘুরে পাকা পাকা গাছে ‘ঢারা চিহ্ন’ দেয় ভালো কাঠের জন্য। ভলুয়া সর্দার ডিঙা বানানোর যাবতীয় সবকিছু দেখাশোনা করেছেন। শিবাই তার পূজা প্রত্যাখান করেছে ভেবে চাঁদ নেশাগ্রস্ত হয়ে এই কর্মব্যস্ত জীবনের শব্দ শুনে মনে মনে ভাবেন এই তপোবনে তাঁর প্রবেশের অধিকার নেই। শুধুমাত্র মুদ্রাভরা থলি নিয়ে অকাতরে অর্থের যোগান দেন।

অন্যদিকে ভলুয়া সর্দারের মুখে শোনা যায়, দেশে এমন নেতা নেই যাকে সশ্রদ্ধায় চাওয়া যাবে, যাকে বীর বলে মনে হবে। অত্যাচারী বেণীকে সরিয়ে নেতা হয়েছে আরেক অত্যাচারী দল করালী ভৈরবরা। বেণীনন্দন পাজী হলেও, ঘুষঘাষ নিলেও কিন্তু কাজে শক্ত ছিল। দেশের উন্নতি তার সময় অনেক তাড়াতাড়ি হয়েছে। তার কালে ধনী আরো ধনী হয়, দরিদ্র ভিক্ষুক হয়, চটুভট্টরা আরো লালে লাল হয়। আজও ভলুয়া সর্দারের মতো লোকেদেরও লাভ হতো। কিন্তু এখনকার করালী ভৈরবদের মতো সুরা ও বিলাস-ব্যসনে প্রচুর অর্থ খরচ কোনদিন করেনি। দেশে তাই অরাজকতা চলছে। এই নেতা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লটবর নেতা নামে এক নারীকে নিয়ে আসে কাজের মধ্যেখানে। এ নেতাকে দিয়ে লটবর প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ভলুয়া, লটবর ও

নেতার কথোপকথনে অনেকটা যেন Dramatic Relief ঘটে। এখানে পুনরায় সুত্রধর প্রবেশ করে ঘোষণা করে বেহুলা-লখীন্দরের সংবাদ। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর মতো বেহুলা-লখীন্দরের মৃত্যু আশঙ্কায় চাঁদ লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেন। সবাই এ নিয়ে সম্মুখ, কালসর্প যাতে কোনভাবে লখীন্দরকে দংশন করতে না পারে তাই সবাই সচেতন থাকে। ঘটনাধারা এরপর সরাসরি বেহুলা-লখীন্দরের বাসর ঘরের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করে। সনকা পুত্রবধূ বেহুলাকে প্রতিজ্ঞা করায় যে আমৃত্যু সর্বদা লখীন্দরের কাছাকাছি থাকবে। যদি কোনো সর্বনাশ আসে তাহলে নিজের জীবন দিয়ে তাকে রক্ষা করবে। সনকা লখীন্দরকে পাটনে না যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করাতে বললে; চাঁদ বণিকের বংশধরকে কীভাবে পাড়ি দিতে বাধা দিবে? এবং তা অন্যায় হবে বলে বেহুলা মন্তব্য করে। বেহুলা ইষ্ঠদেবতার নামে প্রতিজ্ঞা করে স্বামীর কাছেই থাকবে বলে। সনকা বাসর ঘরের পিছনে মনসার ঘট রাখেন যাতে কালসর্প লখীন্দরকে দংশন না করে। চাঁদ উগ্র মদ্যপ অবস্থায় শিবের নামজপে ব্যস্ত। সনকা তাঁর এই অবস্থা দেখে পুরনো সেই আদর্শস্থানীয় শ্রদ্ধাযিত চাঁদ সদাগরের কথা বলেন। চাঁদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, আজকের এই চাঁদ সেই চাঁদ নয়। এই চম্পকনগরী যৌবনের চম্পকনগরী নয়, যার জন্য তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন। আজকের এই নগরীতে মনসা সর্বত্র। এই মনসার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবে কে?

এরপর নাটকে পাই লখীন্দর বেহুলার কথোপকথনের দৃশ্য। চম্পকনগরে বুদ্ধিহীন, বোধহীন এবং মিথ্যাবাদী মানুষদের দেখে চম্পকনগরীর উপর ঘৃণা হয় লখীন্দরের। সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু কর্তব্য করার কথা বলে। পরক্ষণেই আবার চলে চাঁদ সনকার কথোপকথন, সেই সঙ্গে পুনরায় দেখানো হয় বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। লখীন্দর চায়— বেহুলা যেন আজ রাতে নিজেকে উন্মুক্ত রেখে তাকে গ্রহণ করে, অকাতরে ভালোবাসে। বেহুলাও অন্তরের আবেগে সবকিছু ভুলে যখনই স্বামীর অনেক নিকট হতে চায় তখনই সনকার নির্দেশ যেন তাকে আবেগের রাজ্য থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড় করায়। ভগ্নকণ্ঠে তাই বেহুলা উচ্চারণ করে যে মোহের জাল বিস্তার করে সে লখীন্দরকে পথভ্রষ্ট করতে চায় না। কিন্তু লখীন্দর চায়— জীবনের আদিম শিকড়ে মুখ দিয়ে জীবনকে সার্থক করতে। এভাবে তারা যখন একান্ত আলাপচারিতায় ব্যস্ত তখন একদল যুবক ঝাঁপিতে করে নাগিনী নিয়ে রেখেছে বাসর ঘরের দিকে। গুপ্তপথে ভয়িলকে এগিয়ে দেওয়া হয় কাজ হাসিল করার জন্য। এদিকে বেহুলা লখীন্দরের মধ্যে এই সময় চলে ভুল বোঝাবুঝির পর্ব। অন্যদিকে চাঁদ ও সনকাকে দেখা যায় নিজেদের আত্মসমালোচনায় ব্যস্ত। সনকার সংলাপের মধ্য দিয়ে নারীসত্তার হাহাকার ফুটে ওঠে—

“আমি কী? কী চাই অন্তরে আমি? (কান্নার দমক শেষে) পুরুষের নির্মিত
সমাজে নারী তার আপন চরিত্র হতে ভ্রষ্ট হয়্যা গেছে। তাই নারী নিজেও
জানে না কিসে সে পূর্ণতা পাবে।”^{১২}

হঠাৎ এই সময় বেছলার আত্ননাদে জানা যায় লখীন্দরকে কালসর্প দংশন করেছে। বেছলা আতঙ্কে
হায় হায় করলে সনকা ও চাঁদ ছুটে আসেন। ছুটে আসে বুড়ো ওঝা, ন্যাড়া। আরো আসে প্রদীপ
হাতে পড়শী মেয়েরা। সনকা তীব্র আক্রোশে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন এবং উন্মাদিনীর মতো গালি
দেন বেছলাকে। পুত্রবধূকেই সনকা কালনাগিনী বলেছেন। যুবতীর ছদ্মবেশে নাগিনী তার গৃহে বৌ
সেজে লখীন্দরকে কেড়ে নিতে এসেছে, রক্ত খাকি মনসা বলে ধিক্কার দেয়। এই সময় বুড়ো ওঝা
এসে সনকার রাখা মনসার ঘট এনে দেখান। পুত্রশোক সনকা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। চাঁদ সদাগরও
স্তির হয়ে যান। স্বামীহারা বেছলা স্বামীর প্রাণ ফেরাতে অশ্রু প্লাবিত মনে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে
‘কলার মান্দাসে’ করে গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। ভেসে যায় লখীন্দর ও বেছলা, সম্মুখে চাঁদ
নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন। এরই সঙ্গে তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশের সমাপ্তি ঘটে।

নাটকের শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় পর্বের শেষাংশের সূচনা হয়েছে সূত্রধার ও জুড়ির ছড়া
ও গানের মধ্য দিয়ে। চাঁদ বণিকের সব আশা নির্মূল হয়েছে, একমাত্র বংশধর লখীন্দরেরও মৃত্যু
ঘটেছে। বৃদ্ধ চাঁদ এখন প্রায় উন্মাদ। প্রতি রাতে এ পল্লিতে ও পল্লিতে গিয়ে জন্তুর মতো আত্ননাদ
করে বেড়ান। সাধারণ মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাড়া করে ফিরে— চাঁদ পালিয়ে গিয়ে ঘরে লুকান।
দিন-যাপনের কোন ঠিক নেই, বন্ধকী বাড়িতে বাস করেন। স্নানাহারাদির কোন ঠিক নেই। অন্ধকার
কুঠুরীতে হুঁদুরের মতো বেঁচে থাকেন। চ্যালাকাঠ ছুড়ে মানুষে তাকে আহত করে। চাঁদ একসময়
নিজের মতো বলে ওঠে—

“যেটা ঠিক মনে হয়েছিল, সেটারেই ভুল মনে হয়। তবু তো মানুষ চায়
একপথে শেষাবধি যাবে।— বড় আলুথালু হয়্যা গেছে ন্যাড়া, সব বড়
আলুথালু হয়্যা গেছে।”^{১৩}

দেশে আবার নেতার বদল ঘটেছে। করালী-ভৈরবদের সরিয়ে বেণীনন্দন পুনরায় দেশের ক্ষমতার
সিংহাসনে বসেছেন। চাঁদ সদাগর বলে যে একটা লোক ছিল, মানুষ এখন তা ভুলে গেছে। শুধুমাত্র
দূরদেশ থেকে এক যুবক এসে চাঁদ বণিক সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে চায় কাব্য রচনা করবে বলে।
চাঁদ সদাগর ন্যাড়ার দেওয়া মুড়ি খেতে গিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। সেই সময় অন্ধকারে মানুষের
মতো কিছু জীব চাঁদের সাথে কথা বলে। ভলুয়া সর্দারের মুখে শোনা যায়— বেছলা নাকি সতীত্ব

বিসর্জন দিয়েছে। বেণীনন্দনও এসে চাঁদকে নীতি শিক্ষা দেন, তাঁর আদর্শের প্রতি ব্যঙ্গ করেন। পুরুষের কণ্ঠে শোনা যায় নীতি বলে কিছু নেই, শুধু মনসার নিয়ম রয়েছে। সে নিয়ম আবার নিয়তির মতো। তারই ফাঁসে বান্ধা রয়েছে সমস্ত পৃথিবী। নারীর কণ্ঠে চাঁদকে প্রশ্ন করে কেন চাঁদ পাড়ি দিতে গিয়েছিল?

হঠাৎ করে ইতিহাসের বদল ঘটে আবার যখন শোনা যায় ক্ষমতার লোভে বেণীনন্দনের পুত্র সুবল নিজের পিতাকেই হত্যা করে। ন্যাড়ার মতে শিব কোথাও নেই, সর্বত্র মনসা বিরাজমান। তাই কী করা উচিত চাঁদকে প্রশ্ন করে। এর মধ্যে পিছন থেকে ময়লা পাটের চাদর জড়িয়ে বেহুলার প্রবেশ ঘটে। চাঁদ মনসার পূজা দিবে এই শর্ত করে বেহুলা লখীন্দরকে ফিরিয়ে আনে। সেই সঙ্গে বেহুলার মধ্যে অপরাধ বোধও কাজ করে। চাঁদ বণিকের মতো বিরাট মানুষের চির জীবনের অটল প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে সে। তাই মাথা নিচু করে বলে—

“বেহুলার আধখানা মন কয়, আমার যা হয় হোক পূজা তুমি দিও না শ্বশুর।

যতো কষ্ট কর্যা থাকি আমি— সমস্ত বিফলে যাক, তবু—”^{৩৪}

পরক্ষণেই আবার পূজা দিবে কি দিবে না চাঁদ সদাগর— তা জিজ্ঞেস করেন। শ্বশুরকে আরো বলেন যে—সে আর আগের বেহুলা নেই। অনেক কায়দা করে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। পুত্রবধূর শর্ত মতো চাঁদ পূজা দিতে চায় মনসার। চাঁদের মতে, জীবনের থেকে অন্ধ কষে কষে শিবাইয়ে পৌঁছতে চেয়ে শিবাইকে পান না তাই এবার শিবাই থেকে অন্ধ কষে কষে জীবনে পৌঁছতে চান, দেখে শিবাই মেলে কি না। বেল পাতা দিয়ে মনসার পূজা দিবেন বলে স্থির করেন চাঁদ। শিবের খেলা শেষাবধি খেলে যেতে চান তিনি।

নাটকের একেবারে শেষে দেখা যায় বেহুলা লখীন্দরকে জানায় যে পিতা গেছে মনসার পূজা দিতে, কারণ চাঁদ যদি পূজা না দেয় তাহলে নাওয়ার উপরে পুনরায় লখীন্দরের মৃত্যু ঘটবে। তেত্রিশ কোটি লোভী চোখের সামনে উরুদেশ দেখিয়ে, কাঁচুলি শিথিল করে, লাস্যনৃত্য করে এই বেহুলা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে। তাই তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। নতুন করে ঘর বাঁধতে গেলে স্বামীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। আবার কলঙ্কিত মুখ নিয়ে নিছনি নগরীতে সে দাঁড়াতে পারবে না। তাই সে বিষ পান করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অন্যদিকে লখীন্দরের জন্য চাঁদ মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয়। তার পরে সে কিভাবে বেঁচে থাকবে? মনসার দ্বারা গিয়ে ভিক্ষা করে লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনে বেহুলা। সেই বেহুলা যদি বিষপানে মারা যায়, তাহলে সজ্ঞানে কীভাবে সে বেঁচে থাকবে? অবিরাম এই কষ্ট বয়ে নিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকবে, তাই

বেহুলাকে একসঙ্গে ‘ভালোবেসে বেসে’ মরার প্রস্তাব দেয় লখীন্দর। এইভাবে বেহুলা-লখীন্দর ভালোবাসার তৃপ্ত আশ্বাদ নিতে নিতে বিষ পান করে। জীবন-যন্ত্রণা থেকে উভয়েই রেহাই পায় চিরদিনের মতো।

চাঁদ মনসাকে পূজা দেন এরই মধ্যে। বাম হাতে পূজা দিয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে মনসাকে প্রণাম করে জীবন ভিক্ষা চান বেহুলা-লখীন্দরের। যাতে তারা ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেখে বেহুলা-লখীন্দরের মৃতদেহ। চাঁদ সদাগর দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে বলে ওঠে—

“এট্যাও বিফলে গেল! পূজা দেওয়া হোল। তবু যেন পূজা দেওয়া হয় নাই।

পাড়ি দিয়েছি, তবু যেন পাড়ি দেওয়া হয় নাই। ঘর বেঞ্চেছি, তবু যেন ঘর

বান্ধা হয় নাই। — তুমি তো উলঙ্গ শিব তাই মোরে বুঝি উলঙ্গ করাতে চাও?”^{৩৫}

চাঁদ বণিকের সমস্ত পরিচয় যেন জলের আল্পনা। শিব যেন সব মুছে দিতে চাই। তবুও চাঁদ পাড়ি দিয়েছিল। শিবদাস, ভবদেব, দঙ্গদাস-একদিন চাঁদের পাড়ি দেওয়ায় বিশ্বাস করেছিল। চাঁদ তাই সাগরের তল থেকে তাদের আবার উঠে আসার আহ্বান জানায়। কারণ এদের ছাড়া চাঁদের কোন পরিচয় নেই, আবার চাঁদ ছাড়া এদের কোন পরিচয় নেই। তাই চাঁদ এদের নৌকার দাঁড় তুলে নিতে বলেন, পুনরায় পাড়ি দেওয়ার জন্য। নাটকের শেষে দেখা যায় সেই পুরোনো নাবিকরা যেন ছায়ার মতো আসে। তাদের সারা দেহে শ্যাওলা, সমুদ্রের তলদেশের ঝাঁঝি জড়ানো। পরনের যন্ত্রগুলো যেন পচে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। তাদের মৃত চোখগুলো বিস্ফারিত। তারা যেন ঢেউয়ের দোলায় দুলতে-দুলতে আসে। চাঁদ তাদেরকে স্বাদরে আহ্বান জানান এবং শিবের সন্মানে পাড়ি দেওয়ার জন্য পুনরায় ঘোষণা করেন। ‘পাড়ি দেও — পাড়ি দেও’ নাটকটি এখানেই সমাপ্ত হয়।

নাট্যকার ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বিষয়কে গ্রহণ করলেও তিনি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেননি। প্রচলিত মনসাপুরাণ ও মিথকে বিভাজিত করে, কেন্দ্রকে বিশ্লেষণ করে বিনির্মাণের পথে অগ্রসর হয়েছেন। কাহিনির ভেতরের কাহিনিকে ভেঙে ভেঙে দেখেছেন। বিনির্মিত পরিসর থেকে আপন স্বাতন্ত্র্যের জগৎটি চিহ্নিত করে সমকাল চেতনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক মনন ও ব্যক্তিচেতনার সংকটকে মিশ্রিত করে তৈরি করেছেন এক নতুন শিল্প। প্রচলিত এই কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকটি রচনা করলেও সেখানে একদিকে যেমন তৎকালীন যুগ-পরিবেশকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যদিকে তেমনি প্রচলিত কাহিনি চাঁদ থেকে একটু সরে এসে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনিকে নবায়ণ ঘটিয়ে সমকালীন যুগ-পরিবেশকে সূচারুভাবে এ পালায় স্থান দিয়েছেন। নাট্যকার মধ্যযুগের

মনসামঙ্গলের ব্যতিক্রমী চরিত্র চাঁদ সদাগরকে আশ্রয় করেই যেমন নাটকটির নামকরণ করেন, তেমনি তাকে আশ্রয় করেই তাঁর অটল সাহস, গাভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর আপসহীন সংগ্রামী মনোভাবকে বিশ শতকের যুগ-যন্ত্রণার দোলায় চাপিয়ে পৌঁছে দিলেন আগামী দিনের দরবারে। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় চাঁদের নেতৃত্বে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি ও সংকল্পের চিত্র। দিনরাত মানুষের বুকে ভরসা রাখলেই জয় হবেই হবে বলে চাঁদ ঘোষণা করেন। সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম ও সৎ পথ সম্বলিত জয়ের আকাঙ্ক্ষাই চাঁদকে বিপরীত অন্ধকারময় শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব লিপ্ত করে। প্রথমে মহামাভলিক বল্লভাচার্য ও কুচক্রি বেগীনন্দনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব শুরু হলেও পরে বৃহৎ অন্ধকারের শক্তি মনসার সঙ্গে শুরু হয় তাঁর প্রকৃত লড়াই। চাঁদের সঙ্গে মনসার এ লড়াই সৎ-এর সঙ্গে অসৎ-এর। এ লড়াই সত্যের সঙ্গে অসত্যের, এ লড়াই আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, এ লড়াই জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের। অন্ধকারের মধ্যে মানুষ যে নিজের মতো করে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে নিয়ে বাঁচবে। চাঁদ চরিত্র পরিকল্পনায় এই বিচার করে বেঁচে থাকার আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে। অন্ধকার নয়, অন্ধকারের আগল ঠেলে আলোয় পৌঁছানোও যে মানুষের এক বিশেষ দায় তাও চাঁদ সদাগর আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। চাঁদ বণিকের এই সত্য ও আলোকে আঁকড়ে ধরার লড়াই যে প্রকান্তরে নাট্যকার শম্ভু মিত্রের ব্যক্তি জীবনদর্শনেরই প্রকাশ তা সমকালীন সময় সঞ্জাত জীবন যন্ত্রণা ও ব্যক্তি জীবনাদর্শনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নাটক ‘চাঁদ বণিকের পালা’য় যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অনিরুদ্ধ আলি আকতার যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“বিশ শতকের মধ্যভাগের দেশজ অন্ধকারময় আবহকে নাট্যকার শম্ভু মিত্র মনসা-মঙ্গলের পুরানো গল্পের ফ্রেমে নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রকাশ করেছেন। চাঁদের জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া, সংসারে বিফল মানুষ হিসেবে প্রতিপন্য হওয়া, পুত্র-পুত্রবধূর আত্মহনন— সবই চাঁদকে এক নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু নাটকের শেষে চাঁদের নতুন করে পাড়ি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই নাটকটিকে জীবনমুখী করে তুলেছে। নাটকটি অন্ধকারের নাটক হয়েও শেষ পর্যন্ত সত্য-শিব-আলোর নাটক হয়ে উঠেছে।”^{৩৬}

উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গলের মূল কাহিনিকে নাটকের বহিরঙ্গে মোটামুটিভাবে বজায় রেখে শ্রী শম্ভু মিত্র মিথ কাহিনির নবজন্ম ঘটান। মনসার সঙ্গে চাঁদের সংঘাত, মনসার পূজা প্রচারের আশ্রয় প্রচেষ্টা, চাঁদের একগুয়ে মনোভাব এবং পরিণামে চাঁদের পরাজয়—

মনসামঙ্গলের মূল এই অঙ্গটুকু বজায় রেখে তারই মধ্যে সত্ত্বের দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াকে নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে মন্থন করে মিথ-কাহিনীর মধ্যে সুচারুভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ডামাডোল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, যুগযন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। মিথ কাহিনীর একটু আখটু পরিবর্তন ঘটেছে; সমকালীন চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে। নাটকের ঘটনায় নতুন বাঁক সৃষ্টি, চরিত্রে অন্য ধরনের মাত্রারোপ, সমকালের আবহাওয়াকে পরিস্ফুট করতে অসংখ্য চরিত্রের আগমন ঘটানো-এ সব মিলিয়ে পুরোনো আখ্যানটি নতুন করে ফুলে ফেপে উঠেছে। নাটককারের এই প্রচেষ্টা বিপুল মাত্রায় সার্থকমণ্ডিতও হয়েছে। উক্ত নাটকটিতে মনসাপুরাণের কাহিনি তথা মনসাকথার কীভাবে নবরূপায়ণ ঘটেছে, আধুনিক রূপান্তর কীভাবে ঘটেছে এবং নতুনতর ব্যঞ্জনা কীভাবে নাটকের দেখা দিয়েছে নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে তা দেখানোর চেষ্টা করছি—

১. মনসামঙ্গল কাব্যের ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায় দুটি বিরোধী শক্তির চারিত্রিক পরিচয়ে। নাটকে মনসাদেবীর পরিচয় রয়েছে, কিন্তু একবারের জন্যও সরাসরি সংঘাত নাটকে দেখা যায়নি। মনসাদেবীর প্রতিনিধি রূপে বেণীনন্দন ও বল্লভাচার্যের উপস্থিতি দেখা যায়। কাব্যে দেবতা বনাম মানুষের লড়াই, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বনাম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-এর লড়াই। কিন্তু এ নাটকে সেই সংঘাত দাঁড়িয়েছে চাঁদ বনাম মনসার অনুগামীদের, মানুষ বনাম মানুষের। শেষ পর্যায়ে এই সংঘাত উত্তীর্ণ হয়েছে তান্ত্রিক সংঘাতে— আলো বনাম অন্ধকারের, সত্য বনাম মিথ্যার। চাঁদ সদাগরের সমুদ্রের পাড়িতে বাধাদান করেন মাণ্ডলিক বেণীনন্দন। তাই নাটকে বেণী মহামাণ্ডলিক বল্লভাচার্যের দ্বারা নৌ-যাত্রার নিষিদ্ধ জারি করে। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় দেবী মনসার কোপে চাঁদকে হারাতে হয় ছয়পুত্র। এভাবে চাঁদের বিরুদ্ধে চলে মানব ও দৈবী আক্রমণ। চাঁদ এসবকিছুকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়েন মহাসমুদ্রে আলোর সন্ধানে, বেরিয়ে পড়েন জয়ের নেশায়। মনসার কোপে চাঁদের এ সত্যসন্ধিৎসা, আলোকাঙ্ক্ষা কালীদহের ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে যায়। সপ্তডিঙা, সহযাত্রীদের হারিয়ে চাঁদ এক পরাজিত, হারুয়া মানুষ রূপে, বিফল মানুষ রূপে চিহ্নিত হন। সেই সঙ্গে নিঃস্ব চাঁদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের রটনা, স্ত্রী-পুত্রের অভিযোগ তাকে আরো হতাশায় জরাজীর্ণ করে তোলে। তবুও চাঁদ শিব এবং সত্যকে ছাড়তে নারাজ। পরে পুত্র লখীন্দরকে আকড়ে ধরে এর প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু প্রতিপক্ষের চক্রান্তে লৌহবাসরে লখীন্দরের মৃত্যু ঘটে। এইভাবে সম্পূর্ণ নাটক জুড়ে চাঁদ বনাম প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব, মানুষ বনাম মানুষের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। যা নাটকটিকে নতুনমাত্রায় উত্তীর্ণ করেছে।

২. বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনিকে নাটককার নতুন করে দেখিয়েছেন। লখীন্দরের মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন যুব সমাজের অস্তিত্বের সংকট দেখতে পাই। প্রথম থেকেই সে একা থাকতে ভালোবাসে। নিজের পরিচয়, পিতার পরিচয়, বংশের পরিচয় খুঁজে বেড়ায়। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় না, বেঁচে থেকেও যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নৌবহর থেকে ফিরে আসা পিতার দুর্দশা দেখে লখীন্দর ব্যথিত হয়, কিন্তু সংসারের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানহীন পিতাকে ভৎসনা করতেও পিছুপা হয় না। পিতাকে দায়ী করেন মা সনকা ও নিজের দুরাবস্থার জন্য। অন্যদিকে চাঁদ যখন নিজের স্ত্রী-পুত্র এবং পারিপার্শ্বিক কিছু কূটনৈতিক ব্যক্তির অভিযোগের দায় ঘাড়ে নিয়ে জর্জরিত, ক্লান্ত। তখন এই জীবনের সমুদ্রে ব্যর্থ পিতার মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য পিতার সঙ্গে অনুচর হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে। লখীন্দরের এই মানসিকতা আমরা মনসামঙ্গলের লখীন্দরের মধ্যে পায় না। সদ্যবিবাহিত লখীন্দরও আমাদের কাছে নতুনভাবে উঠে এসেছে। স্ত্রী বেহুলার কাছে তার ক্লান্তি, বিষণ্ণতা, আত্মদাহ তুলে ধরা, গভীরতর মিলনাকাঙ্ক্ষা, নববধূ বেহুলার কাছে আত্মসমর্পণ-সমস্তই নাটকে নতুনভাবে উঠে এসেছে। তার অন্তরের অস্থিরতা, চঞ্চলতা এবং অপ্রকৃতস্থতাকে বেহুলার শান্ত, স্থির, শীতল আবহাওয়া দিয়ে বিনাশ করার আহ্বান জানায়। বেহুলার মধ্যে সে আশ্চর্য সুন্দর সবুজ দ্বীপভূমির সন্ধান করে, নাটকে এইভাবে লখীন্দরের চরিত্রের নবরূপায়ণ ঘটেছে। বেহুলা চরিত্রেরও পরিবর্তন দেখতে পায় নাটকে। শুধুমাত্র পতিব্রতা নারী হিসাবে নয়, তাঁর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন জাগে, তাই লাস্য করে উরুদেশ দেখিয়ে দেবতাদের তুষ্ঠ করে স্বামীকে ফিরিয়ে আনলেও তার সম্মানে বাঁধে। স্বামীর জীবনে যাতে কোন আঁচ না লাগে তাই সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে পূজা দিতে বাধ্য করলেও তার মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব দেখা যায়। আদর্শস্থানীয়, পৌরুষদীপ্ত চাঁদের আদর্শের বিচ্যুতি যে তারই জন্য হয়েছে, তাই তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। আবার নিজের খেয়ালে বলে ওঠে তার যায় হয় হোক, পূজা যাতে না দেয় শ্বশুর। বেহুলার এই পরিচয় আমরা মনসামঙ্গল কাব্যে পায় না। আধুনিক যুগের নারীর মানসিকতা ফুটে উঠেছে নাটকে। নাটকে আবার বেহুলা-লখীন্দরের আত্মহত্যার ঘটনা যেমন অভাবনীয়, তেমনি বৈপ্লবিক। কাব্যের কাহিনীতে দেখা যায়, সর্পাঘাতে মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য সে দেবতাদের নৃত্যে সন্তুষ্ট করে। স্বামীকে জীবিত করে গৃহে ফিরে আসে এবং চাঁদ মনসার পূজা দিলে স্বামীসহ স্বর্গালোকে গমন করে। কিন্তু এ পালায় ঘটেছে সম্পূর্ণ বিপরীত। বেহুলা জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৃত স্বামীকে দেবতাদের কৃপায় ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই কিন্তু তারপর একদিকে লখীন্দরের প্রাণের বিনিময়ে তারই পিতার মনসাপূজা প্রদান ও অন্যদিকে লাস্যনৃত্যে

বেথলার কলঙ্কিত হওয়া, নটী বেথলাতে পরিণত হওয়ায় বেথলা আত্মহননের পথ খুঁজে নেয়। সেই সঙ্গে মর্ত্যলোকে ফিরে আসা লখীন্দর অস্তিত্বের গ্লানিকে চিরতরে মুছে দিতে বিষপান করে আত্মহত্যা করে। এই যুগল আত্মহনন, বিশেষ করে লখীন্দরের দুবার মৃত্যু একান্তভাবেই প্রতীকী সত্ত্বরের দশকের অস্থির দেশের যুবশক্তির শারীরিক ও আত্মিক মৃত্যুরই ইঙ্গিতবাহী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা’ গ্রন্থটির ‘অনুসৃজনে মনসাপুরাণ’ প্রবন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা এখানে তুলে ধরা দরকার—

“ঠিক এই জায়গাটিতেই নাটককার আর মিথের পরিচিত চৌহদ্দির মধ্যে থাকেন না, তার সমকালের জীবন-জিজ্ঞাসার রুঢ় আঘাত দিয়ে সেই দেওয়াল ভেঙে ফেলে নতুন একটা প্রত্যয়ের মুখোমুখি দর্শককে দাঁড় করিয়ে দেন। বস্তুত এ নাটক যে আধুনিক সময়ের যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা, উৎকান্তি ও পথ সন্ধানেরই শিল্পরূপ সে নিয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না বেথলা, লখীন্দর ও চাঁদের অ-কাব্যিক পরিণতি দর্শনে।”^{৩৭}

বেথলা-লখীন্দরের বিষপানে আত্মহত্যার ঘটনা সমকালের সংকটকে স্পষ্ট করে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ এক ব্যতিক্রমী ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়া নীতিহীন, আদর্শহীন পৃথিবীতে বাঁচার কোনো মূল্য নেই। তাই আত্মহত্যার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখানে নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। পাশাপাশি সমকালের যুবশক্তির হনন ও আত্মহননের মধ্য দিয়ে উদভ্রান্ত সময়ের অপমৃত্যুও যেন রূপকের আড়ালে প্রতিভাসিত হয়। সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবাদ। লেখকের চিন্তার এই স্বাধীনতা তৈরি হয় বিনির্মাণের পথ ধরে। পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে তিনি মূল কাহিনির পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন এক কাহিনি নির্মাণ করেন।

৩. নাটকে সনকাকে দেখা যায় মনসাদেবীর পূজক হিসেবে। স্বামী-পুত্রের কল্যাণই মনসা ভজনার প্রধান শর্ত। মূল কাহিনির সঙ্গে এগুলির মিল থাকলেও নাটকে সনকার সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র মনসাপূজাকেন্দ্রিক নয়, নিজেকে একজন স্বামী বঞ্চিতা নারী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন। চাঁদ নিজের আদর্শে অটল থাকতে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্ব পালন করেননি। যৌবন বয়সে সনকার প্রেমকে উপেক্ষা করে পাড়ি দিয়েছিলেন। বার্ধক্যের সেই প্রেম দমিত হয়ে পড়লে তা কি এখন পাওয়া যায়। এখন চাঁদ তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কাতর হলেও সনকার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই সনকা দ্বন্দ্বিকতায় জটিল। চাঁদ গৃহিণী সনকার অস্তিত্ব স্পষ্টত জননী ও জয়াসত্তায় বিভক্ত এবং তিনি কতটা যে প্রিয়া আর কতটা যে মাতা এই গভীর প্রশ্নের দ্বন্দ্ব

জর্জরিত। এমনকি নৌ-অভিযান থেকে ফেরৎ স্বামীকে লম্পট, অপবিত্র, অহংকারী, কুচরিত্র বলে প্রতিপন্ন করেন। স্বামীর পরাভবে ব্যথিত হলেও তাঁর ভুল সিদ্ধান্তগুলি আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন। নাটকের শেষে আবার দেখা যায় প্রেয়সী থেকে রূপে চাঁদের সঙ্গে মদ্যপানে ব্যস্ত। উন্মাদিনীর মতো নিজেকে উজাড় করে দেন বিলাসিতায় মগ্ন। নাটকের সনকা গোপনে প্রতিজ্ঞাবাক্য করিয়ে নেয় বেহুলাকে, যাতে লখীন্দর সবসময় স্ত্রীর কাছেই থাকে। পাড়ি দিতে না যায়। এই প্রসঙ্গটিও কাব্যের মধ্যে আমরা পাই না। সমালোচক অনিরুদ্ধ আলি আকতার যথার্থই বলেছেন—

“এহেন সনকা নাটককার শব্দ মিত্রের হাতে সৃষ্টি এক আধুনিক নারী; মিথে মধ্যযুগীয় স্বামীপ্রাণা সাক্ষী স্ত্রী নন। তাছাড়া তাঁর চরিত্রে স্বাশুড়ি সত্তার আর এক-দিককে সংযোগ করে, তাঁকে নাটককার মিথের সনকা থেকে আর একধাপ সরিয়ে এনেছেন।”^{৩৮}

৪. নাটকের চাঁদকে আমরা দেখি শিবভক্ত বণিক সম্প্রদায়। তিনি শুধুমাত্র সামান্য ব্যবসায়ী নন। তার স্বপ্নভরা চোখে ভেসে ওঠে ধনরত্ন পূর্ণ ভবিষ্যতের চম্পকনগরী। মাঝি-মাল্লাদের নিয়ে, প্রচুর অর্থব্যয় করে, নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সে সমুদ্রে পাড়ি দিতে উদ্যত হয়। মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা, লখীন্দরকে নৌ-যাত্রায় পাঠানোর সংকল্প সবই তাঁর নৌ যাত্রাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। যা মূল কাহিনী থেকে সরে এসে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ঘটেছে।

৫. নাটকে বেগীনন্দন ও বল্লভাচার্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতার চরিত্র পরিস্ফুট হয়। বিশ শতকে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতির দোলাচলতা দেখতে পায় এখানে। সৎ, ন্যায় এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত নেতার অভাব দেশে। করালী ভৈরবরা একসময় দেশের শাসন ক্ষমতায় এলেও তাদের বিলাস-ব্যসন, মানুষের প্রতি অন্যায় ব্যবহার সাধারণ দেশবাসীকে আতঙ্কিত করেছে। মূল কাহিনী থেকে অনেকটা সরে এসেছেন নাট্যকার। এখানে নাটকটি হয়ে উঠেছে তৎকালীন রাজনৈতিক দলিল।

৬. মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস দেখা যায় নাটকের শেষে চাঁদ সদাগরের পরিণতি অংশে। মূল কাব্যের মধ্যে দেখা যায় বেহুলা তার ছয় ভাসুর, লখীন্দর এবং চৌদ্দডিঙা মধুকর ধনরত্ন নিয়ে ফিরে আসে স্বর্গ থেকে। চাঁদ বাম হাতে মনসা পূজা দেয় এবং শেষে বেহুলা লখীন্দর (স্বর্গের উষা ও অনিরুদ্ধ) স্বর্গে গমন করে। সেই সঙ্গে চাঁদ সদাগর ও অন্যান্য পুত্র-পুত্রবধূরা স্বর্গে গমন করেন। নাটকের মধ্যে শুধুমাত্র স্বামীকে ফিরিয়ে আনে বেহুলা। চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূর জীবনের কথা ভেবে, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে, বেল পাতা দিয়ে মনসার

পূজা দিয়ে এসে দেখেন বেহুলা-লখীন্দরের পাণ্ডুর মরামুখ। এখানেই ঘটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, যা নাটকটিকে নতুন মাত্রা দান করে। চাঁদ সর্বহারা মানুষে পরিণত হয়, যা একালের বিধবস্ত, পরাজিত মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

বিশ শতকের মধ্যভাগের দেশজ অন্ধকারময় আবহকে নাটককার শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গলের পুরানো গল্পের ফ্রেমে নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রকাশ করেছেন। চাঁদের জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া, সংসারের বিফল মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হওয়া, পুত্র-পুত্রবধুর আত্মহনন— সবই চাঁদকে এক নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু শেষে চাঁদের নতুন করে পাড়ি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই নাটকটিকে জীবনমুখী করে তুলেছে। অন্ধকারের নাটক হয়েও শেষ পর্যন্ত সত্য-শিব-আলোর নাটক হয়ে উঠেছে। আবার মধ্যযুগের মনসাপুরাণ হয়ে উঠেছে চাঁদ বণিকের কাহিনী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তের মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“বিফল অভিযানে মৃত্যু-সব সহযাত্রীদের ছায়ামূর্তিরা অলক্ষ্যে স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে তাঁর কাছে— অজস্র-অদম্য এক চিরবিদ্রোহীর মতো চাঁদ পাড়ি দেন সেই স্মৃতি নিয়ে নতুন প্রত্যাশার খোঁজে, মহাকালের কালো সমুদ্রের বুকে। ভেঙে যাওয়া সমস্ত স্বপ্নের পুনর্নির্মাণ করার জন্য একাকী অভিযাত্রী চাঁদের চরিত্রের এই ট্রাজিক বিশালতার সন্ধান মিথের কাহিনিতে আমরা পাই না। শম্ভু মিত্র একালের মানুষের মানস বিপ্লবের ব্যঞ্জনায তাঁকে অনেকটা ব্যাপক অভিব্যক্তিতে অনেকখানি বিস্তীর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন।

তাঁর নাটক তাই মনসার ‘মঙ্গলগাথা’ নয়, ‘চাঁদ বণিকের পালা’।”^{৩৯}

আর সেই কারণেই ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটক পুরাণের মনসার কাহিনী থেকে সরে এসে বিশ শতকের মধ্য পর্বের ধনতান্ত্রিক চেতনার আগ্রাসী মনোভাব ও ব্যক্তিচেতনার বিপন্নতা নিয়ে লেখা আধুনিক জীবনের নাটক হয়ে উঠে। নাটককার তৎকালীন মানবিক মূল্যবোধ হীনতা তথা মানবিক অবক্ষয়, স্থবির-গলিত সমাজ ব্যবস্থা, এবং তৎকালীন যুব সম্প্রদায়ের ভাবনাহীন, ভবিষ্যৎহীন জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। আসলে তিনি শোষণমুক্ত সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নাটকে। সর্বোপরি মধ্যযুগীয় মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মোড়কে নাট্যকার আধুনিক জীবনযন্ত্রণা ও জীবনভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন। আরো বলা যায় অবক্ষয়িত সময়ে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র মানুষের জীবনের ভয়াবহ ট্রাজিক অন্ধকারকে যেমন এ নাটকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি মনসা তথা অন্ধকারই যে মানুষের জীবনের একমাত্র ধ্রুবসত্য নয়— শিব ও আলোই সত্য

একথাও শুনিয়েছেন পাঠক দর্শককে। তাই নাটকের ‘পাড়ি দেও — পাড়ি দেও’ মন্তব্য হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগযন্ত্রণা দগ্ধ মানুষের অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোকময় জীবনে উঠে আসার মহামন্ত্র।

‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকের ভাষা কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। নাটকের বিষয়ের স্বার্থে নাটককার নিজের মতো করে ভাষা গড়েছেন। এর মধ্য দিয়ে যেমন দেশের পুরাকাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি আধুনিক সমাজের জটিল মানসিকতা বিদ্যুতের ঝলকের মতো ঝলকে উঠেছে এই ভাষায়। সাধারণ মানুষ ও উপরিস্তরের মানুষ উভয়েরই মুখে ভাষা হয়েছে এটি। রাজনৈতিক-কূটনৈতিক চাল, সমাজের লাম্পট্য-নীচতা প্রকাশ পেয়েছে এর মাধ্যমে তেমনি নাটকে মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমের গভীরতাও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার এই ভাষার মাধ্যমে। তাই ভাষার দিক দিয়েও নব রূপায়ণ ঘটেছে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের এই নাটকে নাট্যকার শঙ্খ মিত্র এই নতুন ভাষা আনয়নের দিকটিতে সার্থকতা লাভ করেছেন। তাই বলা যায় মনসা-কথাকে কেন্দ্র করে রচনা করলেও নাট্যকার শঙ্খ মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকটি হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনের নাটক।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব শেখর দেবরায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন শিলচর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হন। ‘অস্তিমের সুর’ (১৯৮৭) নাটকটি তাঁর প্রথম নাটক হিসাবে আমরা পেয়ে থাকি। ১৯৯২-এ নূতন দিল্লিতে ‘সফদর হাশমি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ আয়োজিত পথ নাটক বিষয়ক কর্মশালায় তিনি প্রশিক্ষিত। আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর, নূতন দিল্লী, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, ইক্ষল এবং বাংলাদেশের সিলেট ও মৌলবী বাজার প্রভৃতি শহরে তিনি নাট্যাভিনয় করেছেন। এই সূত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব-সেলিম আলদীন, রসিদ হারুণ (বাংলাদেশ), বিভাস চক্রবর্তী (কলকাতা), রতন থিয়াম, কাহ্নাইলাল, দোরেন্দ্র সিংহ (মণিপুর), হাবিব তনবীর (দিল্লী) প্রভৃতি ব্যক্তির নাটক, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও উপস্থাপন কৌশল তাঁকে নাটক রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

বিশ শতকের শেষ পর্ব ও একুশ শতকের সূচনায় বাংলা নাটকের যাত্রা যে কত বিচিত্র পথে এবং বৈচিত্র্যময়ভাবে অগ্রসর হতে পারে, তার একটি বলিষ্ঠ নিদর্শন শেখর দেবরায়ের ‘মনসাকথা’ (২০০২) নাটকটি। ‘অথ মনসাকথা’ নামক লোকপুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন নতুন আঙ্গিকের এই নাটক। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ‘উজান’ পত্রিকায় ২০০১

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ২০০২-এর ডিসেম্বরে শিলচর কালচারেল ইউনিট, শিলচর, কাছাড় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এককভাবে অথবা দলগত ভাবে অভিনয় উপযোগী এই নাটক বাংলা নাট্যমঞ্চ ও অভিনয় জগৎকে এক অভিনব মাত্রায় পৌঁছে দেয়। একুশ শতকের সূচনা পর্বে একদিকে তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও ভুবনীকরণের এককেন্দ্রিকতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। অন্যদিকে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজনে চলছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্যের বিচার বিশ্লেষণ। এই প্রেক্ষিতেই শেখর দেবরায় রচনা করেন ‘মনসাকথা’ নাটক। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠায় রচিত এই নাটকের প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায়— গায়েন, বায়েন ও দোহার কর্তৃক দিক বন্দনা ও মনসা বন্দনা। কোটিশ্বরের পুত্র চম্পকনগরের অধিপতি চন্দ্রধরের পরিচয়সূত্রে আমরা শিববন্দনা পেয়ে থাকি। পরিবেশক গায়েন, বায়েন ও দোহারদের সহায়তায় নাট্যকার কাহিনী পরিবেশন করলেও তার কেন্দ্রে রয়েছে চাঁদ, মনসা, সনকা, বেহুলা, লখীন্দর, লেংগা, মাঝিমাল্লা প্রভৃতি চরিত্রগুলি। উক্ত চরিত্রগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকটি এগিয়ে যায়। মনসার বন্দনা গান শেষ হলে গায়েন জানিয়ে দেন ‘চাঁদের’ চৌদ্দডিঙা মধুকর যারা বেয়ে যায়, সেই জলে জঙ্গলায় থাকা মাঝিমাল্লারা তাদের বংশের দেবী মনসা তথা নাগমাতা জরৎকারুর পূজা করতে পারে না চাঁদ সদাগরের ভয়ে। যে দেবীকে স্মরণ করলে আপদ নাশ হয়। তাদের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় সপ্তডিঙার বৈঠা হাতে তুলে মনে মনে তাকে স্মরণ করতে হয়। দেবীকে অমান্য করার যে অপরাধ তা মাঝিমাল্লারা মেনে নিতে নারাজ। তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে সামনের শ্রাবণের পঞ্চমী তিথিতে মাতা মনসার পূজা করবে। মাঝিমাল্লাদের ঐক্যবদ্ধভাবে নাগমাতা মনসার পূজা করার সংকল্প চাঁদের মোটেই মনঃপুত হয় নি। তাই সভার মধ্যে সকলের সামনে বলেন জোরগলায়—

“খবর আছে শাওন্যা পঞ্চমীতে নাকি লঘুজাতি কানীর পূজার উজ্জোগ
চইলতেছে! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! চেষ্টমুড়ি কানীর পূজা! নাগ কইন্যারে মাইন্যতা
জানাইয়া ফুল-জল তিনি চায়। কিন্তু শুইন্যা রাখ। আমি দেবাদিদেব মহাদেবের
ভক্ত চান্দ সদাগর—আমার ক্ষ্যামতার সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর
কারো পূজা-আচ্চা করা নিষেধ।”^{৪০}

এই সময় লেংগার মুখে শুনতে পাওয়া যায়— তাঁর স্ত্রী সনকাই বাড়িতে মনসাপূজার আয়োজন করেছে এবং স্বচক্ষে সনকাকে মানতের ‘বারা’ নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে মনসাকে ভৎসনা করেন এবং হেমতালের লাঠির আঘাতে মনসার ‘বারা’ ভেঙে ফেলেন। মাঝিমাল্লারা মনসার এই

অপমানে বেদনাগ্রস্ত হয় এবং সকলে একত্রিত হয়ে চম্পক নগরে সনকার কাছে অভিযোগ জানায়। আজ থেকে চাঁদ সদাগরের মধুকরের কাড়া ধরবে না এবং ডিম্ভার বৈঠা ধরবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। জল-জঙ্গলায় বসবাসকারী এই দরিদ্র লোকেরা ধীরে ধীরে চম্পকনগরে আগত বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যে মোহগ্রস্ত হয়ে মনের খুশিতে বণিকদের ইচ্ছে মতো প্রাণ তোয়াক্কা করে ডিম্ভার কাঁড়া ধরেছে। দিন-রাত একাকার করে বণিকের ধনদৌলত পারাপার করেছে, তারপর বোধবুদ্ধি হলে বুঝতে পারে নিজের জীবন কাদের জন্য উৎসর্গ করেছে এই সরল মানুষজনেরা। তাদের শরীরের ঘাম দিয়ে বণিকের দালান গড়ে উঠেছে। হিসেব নিকেশের খাতা খুললে দেখা যায় সদাগররা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্র মাঝিমাল্লা মানুষেরা অমাবস্যার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই নাটকে ১ম মাঝির সংলাপে শোনা যায়—

“মাগো! জোয়ার ভাঁটা জগতের নিয়ম। মোদের জীবনে জোয়ার কই?
কেবল দেখি ভাঁটার টান। আগে আইত না, কিন্তু এখন মনে অয়, বণিকের
দল বুঝি মোদের ঠকাচ্ছে। মুখে মা মনসার নাম লইয়ে মোরা বুকে
জোর পাই। কেউ যদি মোদের সেই ভাব-ভক্তি নষ্ট করবার চায়— তে
অইলে গো মা! তার উপর কি ভরসা রাখন যায়?”^{৪১}

মনসাদেবীই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, আশার আলোর দিশারী। সেই দেবীর পূজা-অর্চনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে তাদের মুখে উঠে আসে বিদ্রোহের ভাষা। সনকার অনুরোধে মাঝিমাল্লারা শান্ত হলেও বিদ্রোহের সুর তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই লখীন্দরের বিয়েতে মনসার পূজা-অর্চনা করা নিষিদ্ধ হলে জালু-মালু এবং অন্যান্য মাঝিরা সাঁতালি পর্বতে মা মনসার কাছে যায় ‘চান্দো’ সদাগরের অন্যায়ের সুবিচারের জন্য। চাঁদসদাগর হেতালের লাঠি নিয়ে লঘু জাতি চেঙ্গমুড়িকানী বলে অপমানিত করলেও মনসা আপোষেই বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে। তাঁর মতে উজানের দিকে নৌকা বাইতে গেলে শুধু জোর থাকলে হবে না কৌশলও জানতে হয়। লড়াই-এ কায়দাটাই আসল, গায়ের বলে লোককে বশে আনতে যারা চেষ্টা করে তারা ভুল করে। মাঝিমাল্লারা যে মাথা নুইয়ে আদেশ মানতে নারাজ মনসা সেটা চাঁদকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার সঙ্গে তাঁরা যাতে মনসাপূজা করতে পারে দেবী স্বয়ং চম্পাই-এর সমাজপতির কাছে আবেদন করেন। অন্যদিকে চম্পক-নগরের সমাজপতি চাঁদ সদাগরকে ন্যায়-অন্যায়ের উপদেশ দেন। দরিদ্র মাঝিদের ধর্মসংস্কারকে মর্যাদা দেওয়ার অত্যন্ত বিনীতভাবে চাঁদকে বলেন। মনে কুটিলভাব রেখে লাভের হিসেবে করলে, অহংকার নিয়ে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই

হবে না মনসা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে চাঁদ সদাগরকে নৈতিকতার দিকটি দেখানোর চেষ্টা করেন। সময় যে একজায়গায় থেমে থাকে না, তাই চৌদ্দ পুরুষের ভাবনা চিন্তা মনে জমিয়ে না রেখে বর্তমানকে মেনে নেওয়াই ভালো। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় মাঝিরা মনসার নাম নিয়ে যদি মনে বল পায় তাহলে আপত্তি কিসের? মনসার সন্তানেরা ডিঙ্গা বাইলে দোষ হয় না, কিন্তু ডিঙ্গায় মনসার নাম নিলেই চাঁদের অসুবিধা। এই অনার্য আচরণ করতে নিষেধ করেন মনসা। এর প্রত্যুত্তর হিসেবে চাঁদের সংলাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

“আরে যা যা। এত নায্যি অনায্যি দেখলি আমার চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর পুত্র অইবা না। আমার ডিঙ্গার মাঝি যে অইব— তারে আমার মতেই চলতে অইব। আমার রাইজ্যে তোরনামে কোন পূজা পাঠ, গান বাদ্যি করতে দিমু না। এইটাই আমার আদেশ।”^{৪২}

মনসাও নায্য পাওনা আদায়ের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই-এ নামতে বাধ্য হন। লড়াই শেষ না হওয়া অব্দি চুপ করে থাকবে না এবং চম্পক নগরের অধিপতি চাঁদ সদাগরের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেন মনসা।

নেতার সঙ্গে যুক্তি করে মনসা চাঁদের ছয়পুত্রকে দংশন করেন। শঙ্ক ওঝাকে বিষ দেয় তবুও চাঁদ চেঙ্গমুড়িকানীর পূজা কাউকে করতে দেয় না। অন্যদিকে সতী লক্ষ্মী মা সনকার অনুরোধে মাঝিমাঝারা চাঁদের চৌদ্দডিঙ্গা ভাসিয়ে দক্ষিণ পাটনে যায়। মধুকর, শঙ্খচূড়, সিংহমুখী ইত্যাদি সহ চৌদ্দটি ডিঙা বাগিচ্য থেকে ফেরার সময় কালিদহ থেকে হরণ করে পাতালে লুকিয়ে ফেলেন মনসা। চাঁদ সমস্ত কৌশল বুঝতে পেরে কোন দুঃখ না করে কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের বিয়ের আয়োজন করেন এবং সেখানে মনসার নামে কোন ফুল-জল দিতে নিষেধ করেন স্ত্রী সনকাকে। মনের দুঃখে মাঝিমাঝারা মনসাদেবীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়। কালকূট দিয়ে সদাগরকে একেবারে শেষ করার কথা বললে মনসা মাঝিদের মনের উচাটন দেখে বলেন, লড়াই করতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, কৌশল করে চলতে হয়। সমাজপতিকে মেরে ফেললে সবাই এটাই বলবে মনসার পূজা করেনি তাই মারা পড়েছে। নাগগোষ্ঠীর অপমানবোধ ছাড়া সমাজে জিৎ হবে না এতে। যার সঙ্গে লড়াই সেই যদি না থাকে তাহলে পূজা আদায় করবে কার কাছ থেকে। মনসা এখানে কালনাগিনীকে পাঠিয়ে দেন লোহার বাসরে লখীন্দরকে দংশন করার জন্য। লখীন্দরের মৃতদেহ কলার মান্দাসে ভাসিয়ে নিয়ে স্ত্রী বেহুলা নাগলোকে মনসার কাছে উপস্থিত হয়। চম্পকনগরের সমাজপতি ‘চান্দো সদাগর’ ও সমাজের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বেহুলা মনের জোর ও নিষ্ঠা নিয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে

আনার চেষ্টা করে। নাগবংশের সম্মান আদায় এবং চাঁদের পৌরুষত্বের দণ্ডকে বিনাশ করার মনসার যে সংকল্প, তার সঙ্গে যোগ দেয় বেহুলা। বণিকের আর ছয়টি পুত্রবধূর মতো নিয়তির কাছে হার মেনে বিধবা হয়ে ঘরে বসে থাকেনি বেহুলা। শ্বশুরের বাক্য অমান্য করে নিজের ইচ্ছায় নাগমাতার কাছে আসে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মন বদলায়, সমাজকেও বদলাতে হয়। তাই বেহুলা নিয়তির নির্মমতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারিত করতে চায়। সদ্য বিবাহিতা নারীর প্রতি যে অন্যায় এবং তার যে দুঃখ, এই প্রতিকার চাইতে এসেছে মনসার কাছে। একটি নারী এসেছে আরেকটি নারীর কাছে দুঃখ-কষ্ট মোচনের আশায়। নাটকে দেখা যায় বেহুলা মনসার দুঃখ-কষ্টেরও ভাগিদারী হতে চায়। কৌশলের সঙ্গে মনসার মনের কথা বলে যে, কায়দা করে চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে হবে, দান্তিক পৌরুষত্বকে নষ্ট করতে হবে। তাকে হত্যা করে নয়। লখীন্দরকে জীবিত করে দিলে স্বামী-স্ত্রী মিলে পূজা প্রচার করবে। এইভাবে মানুষের মন জয় করলে চম্পকনগরে তো বটেই, অন্য সব জায়গাতেও মনসার মাহাত্ম্য প্রচারিত হবে। কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের সঙ্গে চাঁদের ছয়পুত্র, চৌদ্দটি ডিঙা, ধন-সম্পত্তি সবই ফিরিয়ে দেন মনসা। যার ফলে বাম হাতে হলেও চাঁদের পূজা আদায় করে মনসা।

মনসা পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও নাটকটি একটি মৌলিক শিল্প কর্মের দাবি রাখে। বাংলার সাধারণ মানুষজন যাদের লৌকিক স্মৃতি থেকে মনসাপুরাণের গভীর ব্যঞ্জনা এখনো মুছে যায়নি। মনসামঙ্গলের নতুন ব্যাখ্যা তাদের আত্মকথাকে ছুঁয়ে যায়। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্য যে শুধু সর্পদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্য নয়, নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই-এ জয়ী হবার এক ঐতিহাসিক দলিল তা এই নাটকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদ সদাগরের বাম হাতে পূজা দেওয়া আসলে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অন্য এক কায়দা, এই কৌশল বর্তমান যুগেও যে রয়েছে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পরিমণ্ডলে শেষ হয়ে যায়নি। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই নাট্যকার রচনা করেছেন ‘মনসাকথা’। এই প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য ‘মনসাকথা’ বইটির মুখবন্ধ অংশে যা বলেছেন এখানে সেটি উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“এই প্রেক্ষাপটে মনসাকে নাগ জনগোষ্ঠীর দেবী হিসেবে বিচার করাই অধিকতর সঙ্গত। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই। শেখর এভাবেই মনসামঙ্গল কাব্যকে দেখেছেন।”^{৪০}

নাটকটির বাইরের মোড়ক প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারী হলেও তৎকালীন সময়ের পটভূমিতে গড়ে তুলেছেন এক নতুন মনসামঙ্গল তথা মনসা-কথা। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাভীতি

অথবা পৌরাণিক ভক্তিবাদ নয়, নাট্যকার লৌকিক ঐতিহ্যকে সমকালের সমস্যা দীর্ঘ মানবচেতনার টানাপোড়েনে যাচাই করে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যুক্তিবাদ ও মানবতার আদর্শকে।

নাটকটির প্রথমেই দরিদ্র মাঝিমাল্লারা আগে জলে-জঙ্গলে সাধারণভাবে বসবাস করত। সেখানে ধীরে ধীরে বণিক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। চম্পকনগরে ধীরে ধীরে দালান বাড়ি উঠতে থাকে। এক একটি বণিকের নামে ঘাট নির্মাণ হয়। যে দরিদ্র এই মাঝিমাল্লাদের পরিশ্রমে এতকিছু সম্ভব হয়। অথচ তারাই যেন ধীরে ধীরে দাসে পরিণত হয়, সর্বহারায় পরিণত হয়। একমাত্র সহায় তার বাপ-ঠাকুরদার আমলের দেবী মনসা। এই মনসার পূজাতেই চাঁদ বণিকের আপত্তি। মাঝিমাল্লাদের মাতা হিসেবে নাটকের প্রথম থেকে মনসার সঙ্গে চাঁদের সংঘাত। প্রথম থেকে দেখা যায় ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, নায্য অনার্যের দ্বন্দ্ব যেটি শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রচলিত মনসাপুরাণের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে নাটকটি। চাঁদ সদাগরের অটল গাঙ্গীর্ষ, ব্যক্তিত্ব, একক সংগ্রাম, মনসা নামের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রচলিত ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে ফেলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন, স্বার্থবাদী, কোপনস্বভাবা মনসা সম্পর্কিত ধারণাটি এখানে মুছে গিয়ে নতুন পাঠকৃতি উঠে আসে। মনসাকে এখানে সমাজের হিতকারিণী, কল্যাণময়ী, বিপদতারিণী নারী রূপে দেখা দিয়েছেন। মনসামঙ্গলের মনসাকে দেখি যেনতেন প্রকারে পূজা আদায়ের চেষ্টা করেন। নাটকে চাঁদের সাতটি পুত্রের প্রাণনাশ, চৌদ্দটি ডিঙা সমুদ্রে নিমজ্জিত করলেও শেষ পর্যন্ত মনসা আপোষের কথা বলেন। নাট্যকার প্রচলিত পাঠকে বিশ্লেষণ করে মনসা চরিত্রের মধ্যেও এনেছেন নতুন ঐতিহ্য। এই সূত্রে বিশিষ্ট সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

“নাগ গোষ্ঠীর দেবী মনসা এখানে কল্যাণময়ী তাঁর উগ্র তেজ বা কপটতা নেই, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে যায় নিষ্ঠুরতাও। এইভাবেই প্রচলিত পাঠের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একসময় তিনি সহজেই হয়ে ওঠেন মাঝি-মাল্লাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের উৎস।”^{৪৪}

দেবী মনসা এখানে মাঝিদের জীবনে আশার আলো। তাদের সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ ঐতিহ্যের দিশারী। এই দেবীর মর্যাদা রক্ষার জন্য চাঁদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পিছুপা হয় না। প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যের যে মনসাভীতি এখানে তা সরে গিয়ে সাধারণ মানুষের রক্ষা ও আশ্রয় দেওয়া তাঁর শ্রেয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের পরিত্রাতা হিসাবে দেবী মনসার আবির্ভাবের ঘটনাটি নাট্যকারের অভিনব সংযোজন। বেহুলা কর্তৃক চাঁদের মনসা পূজা করানোর প্রতিজ্ঞা মনসার কৌশল বলে চাঁদ

মনসাপূজা দিলেও বাম হাতে দেয়। বাম হাতের পূজা যে অমান্যের পূজা তবুও মনসা এই পূজা অস্বীকার করেননি। কারণ তিনি আশা রাখেন বাম হাতে হলেও চাঁদ পূজা দিয়েছে। এমন একদিন আসবে মনসা তথা নাগেদের মাহাত্ম্য মানুষের মুখে মুখে গান হয়ে ফিরবে। বাম হাতের যে পূজা আরম্ভ হয়েছে সেটি চলতে থাকবে। মনসার মতে লড়াই আরম্ভ করে একজন শেষ করে অনেকজন। শোষক শ্রেণীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা চলতে থাকবে। এখানে মনসাকে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের নেত্রী রূপে দেখা যায়। তার উপদেশে মাঝিরা শরীরে বল পায়। নাটকের শেষে মাঝিদের উক্তিটি গায়নের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে—

“মা গো! আরম্ভ করেছ তুমি, কিন্তু শেষ করব আমরা। যতদিন বাম হাতের
মাইন্যতা ডাইন হাতে আনতে না পারছি ততদিন আমরাও ক্ষান্তি দিচ্ছি না!
কোনদিন না! জয় মা বিষহরি! জয় মা অমৃতনয়নী! জয় মা মনসা! জয়
মনসার জয়!”^{৪৫}

মনসাদেবী নিজেকে শিবকন্যা বলে জানেন, সেখানে পূজা পাওয়ার চেষ্টাকে কোন অন্যায় মনে করেন নি। নিজের অধিকার আদায়ের লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই দেখা যায়। ‘মনসা কথা’ নাটকটিতে মনসা কাহিনীর অনেকগুলি ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। একটি হল নারীবাদী ব্যাখ্যা। চাঁদ বণিক স্পষ্ট জানিয়ে দেয় দেবাদিদেব মহাদেবের পূজক হয়ে নারী দেবতা চেষ্টামুড়ি কানীর পূজা কিছুতেই করবে না। এখানে নারী হিসাবে মনসার লড়াই-এ সঙ্গী হয় চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ বেহুলা। লখীন্দরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে বেহুলা মৃতদেহ নিয়ে বিষবদী নাগেদের দেশে যেতে চাইলে নারীজাতির তেজ দেখে যেতে দিতে নারাজ চাঁদ সদাগর। নারীজাতির এভাবে গৃহের বাইরে যাওয়া নিষেধ, বংশের ইজ্জত বলে কথা। কিন্তু চাঁদ যত বাঁধা দেয় বেহুলা ততই জেদ ধরে। সমাজ বিধানের নামে ভাসুরের বিধবা বউদের মতো ঘরে থাকতে নারাজ। সে কিছুতেই তা মানবে না। নেতা ধোপানীর সাহায্যে মনসার কাছে উপস্থিত হয়। পুরুষ চম্পক অধিপতি মনসা নারী বলে তাকে অমান্য করে, এই অন্যায়ের বিরোধিতা বেহুলাও নিঃসঙ্কোচে করে। মনসার কাছে তাই সে অনায়াসেই বলে—

“চাঁদ বণিক্য আমার স্বশুর বটে, কিন্তু আমি তো স্বশুরের বাক্য মানি
করি নাই। আমি এয়েছি নিজের ইচ্ছায়। আমার অদিষ্ঠ নিজেই ঠিক
করমু। আমি উজানী নগরের কইন্যা চম্পকের সমাজপতির পুত্রের
বউ এয়েছি নাগমাতার কাছে। এক নারীর কাছে আরেক নারী এয়েছে

তার দুষ্কের পিতিকার চাইতে!”^{৪৬}

চম্পক নগরের ঘাটে চাঁদের ছয়পুত্র, লখীন্দর, চৌদ্দটি ডিঙা, ধন-সম্পত্তি ফিরে পেলে, সব কিছু মূলে যে বেহুলা সেটি বুঝতে পারেন। শেষে চাঁদ কিছুটা কৌশল অবলম্বন করলেও বেহুলার অনুরোধে পূজা দিতে বাধ্য হয়। বেহুলা চরিত্রকে এখানে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখি দেবতা ও মানুষের সংগ্রামে মনসার জয়লাভ হলেও চাঁদসদাগরের পরাজয় হলেও যে মানুষের জয় লাভ হয়েছে— শেখর দেবরায় এই সত্যটি পরিবর্তিত করে চাঁদের যে পৌরুষত্ব, আদর্শ এবং একক সংগ্রামের ঐতিহ্যগুলি এখানে মুছে ফেলেন। চাঁদ সদাগরকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূ রূপে দাঁড় করান। তাঁর বাম হাতের পূজা দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক কৌশল রূপে তুলে ধরেন নাট্যকার। অন্যদিকে মনসার পূজা তথা সেবক সাধারণ মানুষের সংগ্রাম এই নাটকে গৌরবান্বিত হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার আদায় ও সংগ্রামে জয়ী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করে এখানে তিনি প্রচলিত পাঠকেই সরিয়ে দেন। এ এক নতুন মঙ্গলকাব্য হয়ে ওঠে। আসলে নাটকটিতে দুই যুগের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে— মনসামঙ্গল কাব্য লিখিত হওয়ার সময়কাল এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তৎকালীন সমাজকালের প্রেক্ষাপটে কাব্য রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে শেখর দেবরায় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, বর্তমান মানসিকতায় নাটক লিখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই নাটকটি প্রচলিত পাঠ থেকে সরে এসে এক নতুন পাঠ হিসেবে বিরাজমান হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নাট্যপ্রেমী এবং নাট্যকারের বন্ধুবর অমিতাভ দেবচৌধুরীর ‘মনসা কথা : প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা’ অংশের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন—

“সবচেয়ে ভালো লাগে যখন নাট্যকার তাঁর স্বঘোষিত কথকের অবস্থান থেকে, মধ্যযুগীয় সময়-বলয় থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক যুগের দর্শকদের সম্বোধন করে আধুনিক যুগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যুগের দ্বন্দ্ব ও মিলনকে চোখের ওপর আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেন।”^{৪৭}

তিনি আরো বলেন যে, মনসাকে নাট্যকার বর্ণনা করেন মাঝিমাল্লাদের, অত্যাচারিত মানুষের মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাদের মনসাকন্যা রূপে। তাদের শোষিত, বঞ্চিত, জর্জরিত জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, দৈনন্দিন মালিন্যের উর্দ্ধে একমাত্র প্রেরণা রূপে। আসলে দেবতা মানুষেরই রূপক। মানুষ যা হয়ে উঠতে পারত, যা হয়ে উঠতে চাইত কিন্তু পারেনি। তাকেই সে দেবতা রূপে কল্পনা করেছে।

নাট্যকার পরিবেশক গায়নের সংলাপের মধ্যে যে যুক্তি-বুদ্ধি, তর্ক, দ্বন্দ্ব নিয়ে এসেছেন সেটিও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখে। আঙ্গিকের দিক দিয়েও এটি নতুনতর হয়ে উঠেছে। চাঁদ

মনসা পূজায় বাধা দিলেও সাধারণ মাঝিমাল্লারা যেখানে চাঁদের ডিঙা বেয়ে রোজগার করে, জীবনধারণ করে সেখানে তাঁর আদেশ অমান্য করা উচিত নয়। আবার চাঁদ সদাগরের উচিত মাঝিমাল্লাদের নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়া। কারণ নিজের সমাজ, আচার, আচরণ, ধর্ম, সংস্কারকে বাদ দিয়ে কোন মানুষই সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না। ভব নদীতে ডিঙ্গা বাইতে বাইতে মন যখন অশান্ত হয়ে আসে, বিমুনি আসে তখন সমাজ ধর্মের বিশাল বৃক্ষ মানুষের মনে শান্তির জল ছড়ায়। জন্মের পর থেকে যে বৃক্ষের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা, কেউ যদি শেকড় উপড়ে ফেলতে চায় তা হলে তা মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নেওয়া উচিত নয়। একজনের ধর্ম অন্যের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার যে মৌলবাদ, তা নাটকে ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে জীবন সম্পর্কিত নৈতিক প্রশ্নগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। যা মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা দেখতে পাই না।

মনসামঙ্গল কাব্য বাংলার সব অঞ্চলেই প্রচলিত। মূলত নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যেই কাব্যটির জনপ্রিয়তা ব্যাপক। সাধারণ মানুষদের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যেই এক ঔপভাষিক রীতি ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। তিনি বরাক উপত্যকার বহমান এক লোকভাষাকে, পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, অন্য এক ভাষারূপ দিয়েছেন। বিশেষ কোন একটি ঔপভাষিক রীতি অবলম্বন করলে, অন্য ঔপভাষিক অঞ্চলে সেটি আয়ত্ত করতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই নাট্যকার নিজস্ব একটি সংলাপভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, যা উপভাষাকে ইঙ্গিত করলেও আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এইভাবে সংলাপের মধ্যেও অভিনব মনস্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষার জন্য দু-একটি কাব্যাংশ নাট্যকার কর্তৃক রচিত হলেও বাকি যে পয়ার ত্রিপদীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা মনসামঙ্গল কাব্যের স্মরণীয় কবি-ব্যক্তিত্ব বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেবের কাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং ধর্মচেতনার প্রেক্ষিতটি নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাট্যকার মূল পাঠকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। বরাক উপত্যকার লোকজীবনকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, লোকনাট্যের আদলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নাটক রচনা করেন। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিয়ে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৈরি করেছেন এক নতুন নাট্যরূপ। পরিবেশন রীতির বৈচিত্র্যে, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, গীতাবদ্যের ব্যবহার পটভূমি সৃষ্টির অভিনবত্বে তৈরি শেখর দেবরায়ের এই ‘মনসা কথা’ তাই আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে বাংলা নাট্যশিল্পের আধুনিক পুনর্নির্মাণ।

দীর্ঘপথ পরিক্রমায় ফলস্বরূপ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিচিত্র ভাবনা ও প্রকরণে নানা পরিবর্তন। ব্যক্তি যেমন নিজের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটান রচনার মধ্যে, তার সঙ্গে স্থান ও কালভেদেও ভিন্নতা আসে আধুনিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও দেখি মনসা কথাকে নিয়ে নাট্যকারগণ রচনা করেছেন নাটক। তবে প্রত্যেকটি নাটকেই নাট্যকারের নিজ নিজ নৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর ‘চাঁদ সদাগর’ নাটকের চাঁদ মনসামঙ্গলের অনুরূপ দেবীর পূজা দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর কাছে শিব ও মনসা একাকার হয়ে উঠেছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্রের ‘সওদাগরের নৌকা’ ও ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে তৎকালীন যুগযন্ত্রণাময় পরিস্থিতির আত্মসংকটকে তুলে ধরেছেন এবং ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে চলার কথা বলতে গিয়ে হাত বাড়িয়েছেন অতীতের ঐতিহ্যের দিকে। মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছে সত্যের পথের কাণ্ডারী রূপে। তবে শেখর দেবরায়ের মধ্যযুগের চাঁদ চরিত্রের আমূল পরিবর্তন আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এখানে সাধারণ দরিদ্র মানুষের পরিত্রাতা হিসাবে মনসাদেবীকে দেখিয়েছেন নাট্যকার এবং তার প্রতিপক্ষ হলেন চাঁদ সদাগর। পরিশেষে বলা যায়, মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে নিয়ে নাটকগুলি রচনা হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলি হয়ে উঠেছে মনসা-কথার নবরূপায়ণ।

তথ্যসূত্র:

১. মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩১১, পৃ. ৭৪।
২. তদেব, পৃ. ৮১
৩. তদেব, পৃ. ৮২
৪. তদেব, পৃ. ১০১
৫. তদেব, পৃ. ১০৭-১০৮
৬. তদেব, পৃ. ১১০
৭. তদেব, পৃ. ১১১
৮. তদেব, পৃ. ভূমিকা, vii.
৯. ড. জয়ন্তী ঘোষ, মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০০, পৃ. ৪২

১০. মন্থরায়ের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড,
১৬৬ বিপিন বিহারী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩১১, পৃ. ৭২
১১. তদেব, পৃ. ১০২
১২. সনৎ নস্কর, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন,
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২০১২, পৃ. ২০৪ দ্র. 'অনুসৃজনে মনসাপুরাণ'।
১৩. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড) সম্পাদনা ড. সন্ধ্যা দে, ভূমিকা অশোক
মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি-
২০১১, পৃ. ২৯৩
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৭
১৫. তদেব, পৃ. ৩০৬
১৬. তদেব, পৃ. ৩১৬
১৭. তদেব, পৃ. ৩১৭
১৮. তদেব, পৃ. ৩৪৬
১৯. তদেব, পৃ. ৩৩২
২০. তদেব, পৃ. ৩৪৭
২১. তদেব, পৃ. ৩৪৭
২২. শম্ভু মিত্র : 'চাঁদ বণিকের পালা', এম.সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বক্সিম
চাটুর্য্য স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৮৪, পৃ. ১৪
২৩. তদেব, পৃ. ২৬
২৪. তদেব, পৃ. ৩৩
২৫. তদেব, পৃ. ৪৪
২৬. তদেব, পৃ. ৪৫
২৭. তদেব, পৃ. ৪৮
২৮. তদেব, পৃ. ৫৮
২৯. তদেব, পৃ. ৭০-৭১
৩০. তদেব, পৃ. ৭৭
৩১. তদেব, পৃ. ৮২

৩২. তদেব, পৃ. ১১২

৩৩. তদেব, পৃ. ১৩১

৩৪. তদেব, পৃ. ১২৬

৩৫. তদেব, পৃ. ১৩১

৩৬. তদেব, পৃ. ২৭

৩৭. সনৎ নস্কর, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন,

কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২০১২, পৃ. ২০৮-২০৯

৩৮. অনিরুদ্ধ আলি আকতার : চাঁদ বণিকের পালা-প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা, গ্রন্থ বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ

মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২৬ শে জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৬১

৩৯. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন,

কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০০১,

পৃ. ২২০-২২১

৪০. শেখর দেবরায় : মনসাকথা, শিলচর কালচারাল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড,

শিলচর-৭৮৮০০৭, কাছাড়, ২০০২, পৃ. ৪

৪১. তদেব, পৃ. ১২

৪২. তদেব, পৃ. ২২-২৩

৪৩. তদেব, পৃ. মুখবন্ধ অংশ

৪৪. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য : 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাক্‌প্রতিমা, ৫০ সীতারাম

ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, জুলাই, ২০১২, পৃ. ২২২

৪৫. শেখর দেবরায় : মনসাকথা, শিলচর কালচারাল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড,

শিলচর-৭৮৮০০৭, কাছাড়, ২০০২, পৃ. ৪৬

৪৬. তদেব, পৃ. ৩৫

৪৭. তদেব, পৃ. (মনসাকথা : প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা)

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণ

ব্যাধ কর্তৃক মিলনরত ক্রৌঞ্চযুগলের একটির তীর নিষ্ক্ষেপে মৃত্যু হলে বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ের আর্তি থেকে আদি কবি বাল্মীকির মনে যে শ্লোক উদ্ভূত হয়, সেই থেকেই জন্ম হয় কবিতার। এরপর প্রাচীন যুগের চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, নাথসাহিত্য, কবিগান, আখড়াই, হাব-আখড়াই সবই আমরা কাব্যের আকারে লিখিত পাই। ধীরে ধীরে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। দেববাদ থেকে মানবতাবাদ, কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তব জগৎ, অলৌকিকতা থেকে লৌকিকতা ইত্যাদি ভাবনার দিকে অগ্রসর হন কবি-সাহিত্যিকগণ। আসলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে পরিচয়লাভের ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতায় আসে আমূল পরিবর্তন। বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ জাগতে শুরু করল মানুষের মনে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। এই অনুভূতিগুলি পৌরাণিক আখ্যানের মোড়কে প্রকাশ পেতে থাকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের হাতে। অন্যদিকে বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু প্রভৃতির হাতে এই অনুভূতিগুলি গীতিবিকিতার আকারে প্রকাশ পায়। এরপরে বিশ শতকের সূচনা থেকে শুরু হয় রবীন্দ্রযুগ। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রানুসারী ও রবীন্দ্রবিরোধী কবিগোষ্ঠী যথা— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জসীমউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি রোম্যান্টিকতা কল্পনাকে আশ্রয় করে যেমন কবিতা রচনা করেছেন। তেমনি বাস্তব জগৎ তথা তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকগুলি তাদের কবিতায় উঠে এসেছে। বাংলা কবিতা আরো পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর ও আশির দশকে এবং আজকের একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে আছে। আধুনিক জটিল পরিস্থিতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক পালাবদল এবং কুটিল চক্রান্ত ভাবিয়ে তুলেছে প্রত্যেক কবি ব্যক্তিত্বকে। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, জিয়া হায়দার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,

কৃষ্ণ বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, তসলিমা নাসরিন প্রভৃতি নবীন কবিদের হাতে বাংলা কবিতা অন্য মাত্রা লাভ করে। ক্রমে ক্রমে বাংলা কবিতা আধুনিকতার পর্ব ছাড়িয়ে উত্তর-আধুনিক পর্বে গিয়ে পৌঁছায়। নবীন প্রজন্মের বেশ কিছু কবি মানবিক, দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধার কথা সমৃদ্ধ হ্যাংরি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার প্রতিক্রিয়া কবিতার মধ্যে দেখা যায়। এইভাবে আধুনিক ও উত্তর আধুনিক কাল-পর্বে বাংলা কবিতা হয়ে ওঠে বিচিত্র পথগামী। বাংলার এই কাব্যজগতে দেখা যায় কিছু কবি বর্তমানের যুগযন্ত্রণা, হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি সমস্যা ও তা থেকে উদ্ধারের জন্য হাত বাড়িয়েছেন অতীত ঐতিহ্যের দিকে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী কাব্য প্রভৃতি কাব্যের অনুশঙ্গ নিয়ে বা অনেক সময় চরিত্রের আদর্শ নিয়ে রচনা করেন নতুন নতুন সৃষ্টি। মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে আধুনিককালে রচিত হয়েছে অনেক কাব্যকবিতা। আর আধুনিক যুগের সংকটময় পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এক একটি কবিতা হয়ে উঠেছে মনসাকাব্যের নবনির্মাণ। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আলোচনায় নিয়েছি কালিদাস রায়ের— ১. ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতাটি। এরপরে ক্রমানুসারে ২. জীবনানন্দ দাশের ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ ৩. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুত্তীর্ণ কাব্যের ‘বেহুলা নাচানো স্বর্গ’ এবং ৪. ‘লখিন্দর’ কাব্যের ‘বেহুলা’ কবিতা। ৫. বিষ্ণু দে’র ‘এবং লখিন্দর’ ৬. জিয়া হায়দারের ‘কৌটোর ইচ্ছেগুলো’ কাব্যের ‘লখিন্দর’, ‘বেহুলা’, ‘সনকা’, ‘চাঁদ সদাগর’ ও ‘মনসা’, ৭. সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘বেহুলা’, ৮. অরুণ মিত্রের ‘ও বেহুলা’, ৯. শঙ্খ ঘোষের ‘হেতালের লাঠি’, ১০. শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর ‘মনসামঙ্গল’, ১১. উত্তম দাশের ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ কাব্যগ্রন্থের আটটি কবিতা, ১২. দীপঙ্কর মাহমুদের ‘বেহুলার ভেলা’, ১৩. জয় গোস্বামীর ‘ডিঙা’, ১৪. কৃষ্ণ বসুর ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ে করা হল।

আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট কবি কালিদাস রায়ের (১৮৮৯-১৯৭৫) স্কুলের গণ্ডী উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর রচিত ‘কুন্দ’ নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার ‘কিশলয়’ (১৯১১), ‘বল্লরী’ (১৯১৯), ‘পর্ণপুট, প্রথম’ (১৯১৪), ‘পর্ণপুট, দ্বিতীয়’ (১৯২১), ‘ব্রজবেণু’ (১৯১৫), ‘ঋতুমঙ্গল’ (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রানুসারী এই কবি তৎকালীন কবি সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ‘বৈকালী’ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতাটিতে তৎকালীন সময় ও পুরাণের মেলবন্ধন ঘটেছে। কবিতায় বিশ শতকের বিপন্ন সময়ে মনসামঙ্গল কাব্যের মূল চরিত্র চাঁদ সদাগরকে দাঁড় করিয়েছেন পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক হিসেবে। আর এইভাবে কবি কালিদাস রায় অত্যন্ত সচেতনভাবে

মনসাপুরাণের কথাকে নিয়ে এসেছে আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে। বিশ শতকের চারের দশকে ব্যক্তিত্ব যখন অরাজকতা, অবক্ষয় ও অস্থিরতার সামনে পদানত তখন কবির কাছে উদাহরণ হয়েছে অতীতের আদর্শবাহী প্রতীক চরিত্র। বর্তমান সংকটময়, অস্থিরতাময় সময়ের অন্তরালে সন্ধান করেছেন উজ্জ্বল অতীতে। বর্তমান সময়কে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। উক্ত কবিতায় কবি চাঁদের মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বের আহ্বান করেছেন সমকালের দিকে তাকিয়ে। তাই কবির মুখে শোনা যায়—

‘ দেবতা মন্দিরে ভরা সিন্দূর চন্দনে গড়া

বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি, ’

পৃথিবী ব্যাপী অস্থিরতা, যুদ্ধ, অরাজকতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, মানবতার অপমান ও লাঞ্ছনা যখন সমাজকে বিধ্বস্ত করেছে, তখন চাঁদ সদাগরের মতো ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।

কবি মনসামঙ্গলের অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র চন্দ্রধর সাধুর বন্দনা করে তাকে দেবতার উপরের আসনে বসিয়েছেন। এই যুগের পূজার অর্ঘ্য অর্থাৎ এই যুগের অন্ধকারময় সময়ে সত্যের হাল ধরতে আহ্বান জানান। এই বঙ্গভূমির সমতলে, তৃণ-লতা-গুল্মদলের মাঝে চাঁদ হল বজ্রজয়ী বনস্পতি। সত্যের পূজারী ও জ্ঞানের অধিকারী এই শালপাংশু মহাভূজ রথী সর্পদেবী মনসার দর্পকে জয় করেছেন। হেতালের লাঠি নিয়ে সাঁতালি পর্বতের উপরে মনসার কুটিলতাকে, হিংস্রতাকে বাধা দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দৃপ্ত দীপ্তি পৌরুষ যুক্ত এই ব্যক্তি। এই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির চারপাশে তাকে ঘিরে রয়েছে কোটি কোটি ভীরা অমানুষের দল, যারা শুধু ভয়ে কাঁপে। তাদের ভয়ের মধ্য দিয়েই জীবন মরণ। মেরুদণ্ডহীন মানুষজন অরাজকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু প্রাণেরও অধিক পণ করে, মাথার উপরে যমদণ্ডকে ভেঙে সাতখণ্ড করতে সক্ষম এই পুরুষ। প্রাণকে পণ করে সাতপুত্রের মৃত্যুর পরেও শিবের সাধনায় নিজেকে বামাচারী কাপালিকে পরিণত করে। পুত্রহারা মাতা সনকার আর্তনাদ ও কান্নার সুরে ভরে যায় চম্পক নগরের মাঠ-ঘাট। সাতপুত্রসহ চৌদ্দ ডিঙা মধুকর এবং ধনজন সর্বস্ব হারিয়েও চাঁদের চোখে জল নেই। এই দুর্বিষহ মহাশোকের ফলে চোখ দিয়ে শুধু প্রতিশোধের আগুন বিচ্ছুরিত হয়েছে। নিঃশ্বাস হয়েও চাঁদ পথে পথে ফিরলেও নিজের পৌরুষত্বে অটল। দেবাদিদেব মহাদেব শুধু কণ্ঠে বিষ ধারণ করেছিলেন কিন্তু চাঁদ সদাগরের সর্বঅঙ্গে গরল—

‘বিষে তনু নীলরুচি আত্মা তব শুভ্র শুচি

নীলস্বরে পূর্ণচন্দ্রোপম,

সহস্র ফণার মাঝে তোমার পৌরুষ রাজ

নাগবৈরী বৈনতেয় সম।”২

এই বিষে গোটা দেহ নীলাবর্ণ তবুও আত্মা শুভ্র শুচি সম্পন্ন। নীল বসনের পূর্ণ চন্দ্রের মতো বিরাজমান এই চাঁদ। তাঁর সত্যাদর্শ, ক্রমজ্ঞান ও তেজস্বী ব্যক্তিত্বের কাছে সহস্র ফণাও হার মেনেছে। এই সহস্র ফণার মাঝে নাগবৈরী বৈনতেয়ের মতো তাঁর পৌরুষ বিরাজ করে। বাহ্যিক ধনসম্পত্তি হরণ করেও তাকে কেউ নিঃস্ব করতে পারবে না, এমন স্পর্ধাও কারো নেই। পুরুষার্থ যার শিরোমণি, শাস্ত্রত ধনে যিনি ধনী, সারা বিশ্বে তাই এই ব্যক্তিত্ব নমস্যের যোগ্য। এই চাঁদ সদাগরকে বিভিন্নভাবে ফাঁদে ফেলার যে সমস্ত ফন্দি সবই ব্যর্থ হয়েছে। শেষে চাঁদকে শায়েস্তা করার জন্য দেবতাকে মানুষের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। সমস্ত হিংসা, শাস্তি, ভয় যিনি জয় করেছেন, দণ্ডদাতা তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সারা বিশ্ব যেখানে ভীৰুতার সহিত অসহায়ের মতো নিয়তির কাছে সবকিছু সমর্পণ করে তার জয়গান গায়। সাধারণ মানুষ দাসত্বের কাছে মাথা নুইয়ে দেয়, কিন্তু চাঁদ একই প্রতিরোধের ধ্বনি তুলে দস্তিত দেবতাকে হতচকিত করে তোলে। দেবতার পাষাণ মন্দিরও কেঁপে ওঠে এই শৌর্যের দীপ্তিতে। যুগ যুগ ধরে যে মেরুদণ্ডহীন ভীৰু মানবের জাতি দেবতার বাণী ও দণ্ড অঙ্করে অঙ্করে পালন করে এসেছে। কবির বক্তব্য তারা কি আজ চাঁদ সদাগরের মস্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সহস্র বছর ধরে যুপবদ্ধ ছাগের মতো যে নরনারী ভয়ে থরথর কেঁপেছিল, তাঁদেরই মাঝে চাঁদ বজ্রের মতো কণ্ঠস্বরে দেবরাজের কাছে প্রস্তাব রাখে মানুষেরও যজ্ঞভাগ চাই বলে। এই চাঁদ মনসার কাছে মাথা নত করেনি, বরং মনসাকেই তাঁর কাছে মাথা নত করিয়েছে। সমগ্র মানব সমাজকে এই বাণী শেখালেন যে দেবতার চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কবির ভাষায় এটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

“শিখাইলে এই সত্য তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব

দেব নয়, মানুষই অমর।

মানুষই দেবতা গড়ে তাহারই কৃপার পরে

করে দেব-মহিমা নির্ভর।”৩

মানুষের এই শ্রেষ্ঠতার কারণেই ব্রহ্ম সত্যকে ছোট করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভোগ বিলাসী হতে পারেনি এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী। মৃত্যুর শাসনকে জয় করেছিল চিদমৃত পান করে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত এই অটল ব্যক্তিত্ব। ‘উদ্যত-কনকঘট’ এবং ‘সহস্র দেউল মঠ’ কাল দণ্ডে গুঁড়া হয়ে গেলেও, গরল সিন্ধুর মাঝে চাঁদ সদাগরের শৌর্য চিরদিন দণ্ডায়মান থাকবে মৈনাকের

চুড়ার মতো।

চাঁদসদাগরকে কবি আহ্বান করেছেন বিশ শতকের মুক্তিকামী মানসিকতা নিয়ে। এই ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতায় দৈবশক্তি যেন অশুভ শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। সেই অশুভ দৈবশক্তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ নয়, সমস্ত অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বজ্রকঠোর মনোভাব প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। মানুষ নিজের কল্পনায় যে দেবতার সৃষ্টি করেছে, সেই দেবতা কখনোই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। একশ্রেণীর সুবিধাবাদী, স্বার্থাশ্রয়ী মানুষ নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য মনের মতো দেবকল্পনা করে মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করে সংকুচিত করেছে। কিন্তু কবি কালিদাস রায় বিশ শতকের তিন চার দশকে পুরাণের চাঁদ সদাগরকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে সমকালের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক সনৎকুমার নস্করের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

“বস্তুতপক্ষে এ কবিতায় সমকালের বাঙালি সমাজের মধ্যে কবি যে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, নিয়তি নির্ভরতা, আদর্শহীনতা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সব ক্লিন্নতার পাশে চাঁদের হিমালয় সদৃশ ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করে এই উন্নত শির মানুষটির চরিত্র গৌরব আরও, উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন।”^৪

‘ত্রিপদী’ ছন্দে রচিত ‘ওড’ শ্রেণীর এই ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতায় কবি বর্তমান যুগের মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। আগামী প্রজন্মকে মানবতার মাহাত্ম্যের বাণী শুনিয়েছেন। আর এই সত্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অবলম্বন করেছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের সেই প্রসিদ্ধ চরিত্র চাঁদ সদাগরকে। অসহায় মানুষ যে নিয়তির কাছে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ক্ষমতার সামনে নুইয়ে দিয়েছে দাসত্বের মাথা; এই দাসত্বের ভার নিয়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে চলেছে। প্রাচীনকালে সব ছিল দেবদেবীর শক্তি নির্ভর, বর্তমানে তা রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষমতায়। মানবতা, ব্যক্তিত্ব, সত্য, আদর্শ সবকিছু এর চাপাকলে কণ্টরুদ্ধ। আর এই সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আদর্শ মানব হিসেবে চাঁদ সদাগরকেই কবি বেছে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের ‘মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ’ গ্রন্থের মন্তব্যটি উক্ত স্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

“অরণ্যের কৃপা গ্রহণের মধ্যে মানুষের মহিমা নেই, মহিমা তার সংগ্রামের, প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে নিজেকে সৃষ্টি করার মধ্যে। তাই যদিও চাঁদের পরাজয় একটা নিশ্চিত সত্য, তথাপি পদ্মার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম মহিমাময়; কারণ অনাদ্বীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ প্রকাশ

করতে চাইছে নিজেকে। ... মানুষ চাঁদ মহিমায় দীপ্তিমান, কেননা তার সৃষ্টি
দেবতা অসভ্যতার ধোঁয়ায় ল্লান।”৫

আর এই চাঁদ সদাগরকেই কবি আহ্নান জানিয়েছেন বর্তমানের সংকটময় মুহূর্তের কাণ্ডারী হিসেবে।

এই কবিতা নামকরণেই কবির প্রাচীনের প্রতি প্রেরণা অনুভব করা যায়। তিনি প্রাচীন বাংলা ও পল্লীবাংলার কাব্যসমৃদ্ধিকে এক নতুন ভঙ্গিতে, নতুন সুরে ও নতুন ভাষায় পরিপুষ্ট করেছেন। কবি পুরাণের ঘটনার আবরণে সমকালীন পৃথিবীর অবক্ষয় ও তার মুক্তির উপায় তুলে ধরেছেন। তাই বর্তমান পৃথিবীর চরম অবনতির প্রেক্ষাপটে তার আদর্শকে আহ্নান করেছেন। আর এই প্রসঙ্গে কবি চাঁদ সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন— ‘বনস্পতি’, ‘মহাভুজ রথী’, ‘কাপালিক’ ইত্যাদি যুক্ত ভাষার মাধ্যমে মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্র পেয়েছে বৃহত্তর কালিক ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিক ব্যঞ্জনা। কবি চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বকে বিশ শতকের চারের দশকের শোষক ও শোষিতের লড়াই-এর মাধ্যমে নবরূপ দান করেছেন। মনসার অত্যাচার পরিণত হয়েছে অসহিষ্ণু অমানবিক লাঞ্ছনাকারী রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যবস্থায়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শক্তি রূপে চাঁদ চরিত্র পরিণত হয়েছে বর্তমানের সৈনিক রূপে। এই দিক থেকে ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ চরিত্রের আধুনিক রূপায়ণ।

বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যের ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতায় বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন সেই মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের পরিমণ্ডলে। কবিতাটিতে কবির নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার পূর্বে আমাদের কবি সম্পর্কে দু’চার কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন ঘটেছে। তিনি সুররিয়ালিস্টিক দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে অনুভব করতে চাইলেও তাঁর কবিতায় মিথ ও লোকপুরাণ প্রত্নপ্রতিমা হয়ে ওঠে। বাংলার সুপ্রাচীন পলিমাটির স্তরে স্তরে চাপা পড়ে আছে যে পুরনো কাহিনি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কবি ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যে বাংলার সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যশালী সম্পদ তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের জগতে ফিরে গিয়েছেন বারেকারে। আলোচনার সূত্রে তাঁর প্রধান কাব্যগুলি, যথা—

১. ‘বারাপলক’ — ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ

২. ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ — ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ

৩. ‘বনলতা সেন’ — ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ

৪. ‘মহাপৃথিবী’ — ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

৫. ‘সাতটি তারার তিমির’ — ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ

৬. ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ — ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতে পারি।

কবি জীবনানন্দ দাশ ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ সনেটধর্মী কবিতাটিতে গ্রামবাংলার প্রকৃতি রূপের মধ্যে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য রয়েছে তাকে বর্ণনা করেছেন নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে। কবি প্রথমেই ঘোষণা করেছেন যে—

“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের- হিজলের-অশথের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাতের ছায়া পড়িয়াছে;”^৬

কবি বাংলার সৌন্দর্য দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তাই পৃথিবীর রূপ দেখার প্রয়োজন নেই তাঁর।

কবি এই পল্লবের স্তূপের মধ্যে মানবীয় রূপ প্রদান করেছেন। তারা যেন চুপ করে আছে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে। ফণীমনসার ঝোপ ও শটিবনের মধ্যে এই পল্লবের স্তূপের ছায়া পড়েছে। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে ফণীমনসা ও শটিবনের মধ্যে লোকপূরাণ মনসামঙ্গলের দেবী মনসার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এর পরে পরেই তিনি পেয়েছেন মধুকর ডিঙা, চাঁদ সদাগর, চম্পা প্রভৃতি অনুষঙ্গগুলি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের চম্পক নগরের বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগর দেবী মনসার প্রকোপে ছয়পুত্র হারিয়ে দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যায় চৌদ্দডিঙা মধুকর (মতান্তরে সপ্তডিঙা মধুকর) নিয়ে। নানারকম দ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য যাত্রাকালে এরকম হিজল, বট, তমালের নীল ছায়াযুক্ত বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল। ডুমুর গাছের ছায়ার মতো পাতার নীচে ভোরের দোয়েল ও শান্ত স্নিগ্ধ বাংলা তাকে অতীতেই দেখেছিল চাঁদ বণিক। তাই কবির ভাষায় উঠে এসেছে —

“মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে

এমন হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিলো।”^৭

আবার বলা যায়, চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা মনসার আশির্বাদে পুত্রবর লাভ করে এবং তার

নাম রাখে লখীন্দর। উজানী নগরের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তবে মনসার চক্রান্তে বাসররাতে প্রাণ হারায় লখীন্দর। এই মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে যায় বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য। তাই— শুধু চাঁদ সদাগর নয়, বেহুলাও মৃত স্বামীকে নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় বাংলার এই অপরূপ রূপ দেখেছিল। তার সেই দুর্ভাগ্যের দিনে কৃষ্ণ দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন নদীর চড়ায় মারা যায় সেই সময়ও সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য শান্ত নিবিড় অশ্বথ বট গাছ দেখেছিল, শ্যামার নরম গান শুনেছিল। এখানে কবি সবুজ প্রকৃতি ও সমৃদ্ধতর বাংলার রূপময়তাকে আরো পূর্ণ করে তোলেন ‘শ্যামা’ পাখির নরম গানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।

মনসামঙ্গলের বেহুলা মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য নেতা ধোপানীর সাহায্যে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে ইন্দের সভায় গিয়ে লাস্যনৃত্যের মাধ্যমে দেবতাকূলের মন জয় করে স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে এর আড়ালে থেকে যায় নারীর অন্তরের বেদনা। তাই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ এই কবিতায় বলেছেন—

“ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দের সভায়

বাংলার নদীমাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মত তার কেঁদেছিল পায়ে।।”^৮

এই নৃত্যের প্রসঙ্গ তুলে নারী জাতির অপমান ও লাঞ্ছনার কথা বলেন কবি। নারীর এই অসম্মান ও অসহায়তায় বাংলার নদী, মাঠ, ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো কেঁদেছিল তার পায়ে। মধ্যযুগের নারীর অসহায় বিপন্ন অবস্থার পুরাণ কাহিনীকে বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করেছেন।

বিশ শতকের মধ্যভাগের সময়ে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, হত্যা, খুন, অসহায়তা, মূল্যবোধহীনতা প্রভৃতি ঘটনায় মানুষ যখন জর্জরিত, সেই সময় প্রকৃতির মধ্যে শান্তনিবিড় আশ্রয় খুঁজেছেন কবি। সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যেও এই প্রকৃতির রূপময়তা, সৌন্দর্যময়তার চিত্র তুলে ধরেছেন, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অগণিত কাল ধরে প্রবাহিত এই সমৃদ্ধিকে নির্দিষ্ট শতক দিয়ে মাপা সম্ভব হয় না। ফণীমনসা, মধুকর ডিঙা, চাঁদ, চম্পা, বেহুলা ইত্যাদি মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গ তুলে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তেমনি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বেদনাতুর হৃদয়ের কথা তুলে ধরেছেন। তাই বলা যায়, বর্তমানে আধুনিক যুগের দাঁড়িয়ে কবি মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়কে কাব্যে স্থান দিয়ে তাকে নতুন মাত্রা দান করেছেন। এক নতুন অভিব্যক্তিতে উঠে এসেছে মনসামঙ্গলের সেই আবহ। প্রকৃতির মধ্যে তাঁর সমবেদনার অনুভব তুলে ধরেছেন কবি, তাতে মনসামঙ্গল কাব্য এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সমালোচক

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর’ গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন সেখানে কবির আরো কিছু অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে—

“বিশ শতকের ভগ্ন সময়ে যখন যুদ্ধ মন্বন্তর দাঙ্গা হত্যা খুন ও ধ্বংসে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে মানুষের পৃথিবী; তখনকার রূপময়ী, লাভাণ্যময়ী প্রকৃতিও যেন আবহমান কাল ধরে চলে আসা প্রকৃতির মতোই। পুরাণের যুগের মতোই সে সাজিয়েছে গাঙুড়ের ঢেউ, হিজল বট তমালের অপরূপ রূপ। তাহলে মানুষের পৃথিবীকে কলুষিত করেছে কে? এই জিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই চিরন্তন এক প্রশ্ন তৈরী হয়। আবহমান কাল ধরে চলে আসা বাংলার প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় থাকলেও মানুষের লোভ ও স্বার্থই কী কবি-হৃদয়কে নিরাশ্রয় করতে চেয়েছে?”^{৯০}

বেহুলার ঘুঙুরের কান্নার মধ্য দিয়ে রূপসী বাংলার বিপন্নতা ও অসহায়তা চিহ্নিত হয়েছে কবিতার শেষোক্ত পংক্তি দুটির মধ্য দিয়ে। মনসামঙ্গলের ‘মিথ’কে বাংলার প্রকৃতি রূপের মধ্যে স্থাপন করে এক অপূর্ব শিল্প নির্মাণ করেন। বেহুলার অমরায় গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনের মতো ঘটনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কালো দিকটি চিহ্নিত হয়েছে। এখানে নারীর অসহায়তা, বিপন্নতা ও লাঞ্ছনার অন্তহীন আঘাত বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছে। প্রচলিত এই মনসাপুরাণের মিথের মধ্যে বিশ শতকের বিপন্ন সময় নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে।

‘রূপসী বাংলা’ কাব্যের ‘হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে নাকি’ কবিতায় আমরা মনসামঙ্গলের পরিচয় পাই। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী মনসার চক্রান্তে কালীদহের গভীর জলে নিমজ্জিত হয়। সেই সময় আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন দু’প্রহরের সেই পাখির কলরবের দ্বারা বাংলায় এই কালীদহের শূন্যতা ও শুষ্কতা ভেঙে দিয়েছিল। কবি প্রকৃতির রূপের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মুগ্ধতার মধ্য দিয়েই অতীতচরী হয়ে উঠেছেন। বাদল ও মেঘের ছায়া দেখে চাঁদ সদাগর ও মধুকরডিঙার কথা কবির মনে হয়েছে—

“চাঁদ সদাগর: তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
কালীদহে কবে তারা পড়েছিল একদিন ঝড়ের আকাশে,
ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে নাকি?
সনকার মুখ আমি দেখি না কি?”^{৯১}

কবি আজকের ‘বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়া’, ‘ধলেশ্বরীর চড়ায়’ ও ‘গাংশালিকের ডাকে’র

অনুসঙ্গের সমান্তরালে মনসামঙ্গলের কালীদহ, অজানা পাখি ও চাঁদের মধুকরডিঙার কথা স্মরণে আসে। এইভাবে আমরা দেখি আধুনিক কবিতার মধ্যে মনসামঙ্গলের কথাকে নতুনভাবে রূপায়ণ করেছেন। ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যের কবিতাগুলি সম্পর্কে সমালোচক বিপ্লব চক্রবর্তী যা মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে খুবই প্রযোজ্য—

“এই কবিতাগুলোয় কান পাতলে বাংলার লোক-জীবনের নানা কথায়
বাংলার ইতিহাস ভূগোল বা পুরাণের স্রোত বেয়ে ভেসে আসা লোক-
জীবনের বিচিত্র উপাদানের ঐক্যতান শোনা যায়।”^{১১}

পরিশেষে বলা যায় কবি জীবনানন্দ দাশ বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে মনসা-কথার অনুসঙ্গকে নিয়ে এসে বর্তমান যুগের মূল্যায়ন ঘটিয়েছেন। যার ফলে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে একটু একটু নতুন সৃষ্টি।

আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৫) মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করে রচিত কয়েকটি কবিতা আমরা পেয়ে থাকি। ‘মৃত্যুভীর্ণ’ (১৩৬২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘বেহুলা নাচানো স্বর্গ’, ‘লখিন্দর’ (১৩৬৩) কাব্যের ‘বেহুলা’ কবিতা এবং ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’ (১৩৭১) কাব্যের ‘বেহুলা’ নামক কবিতা প্রভৃতি। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে মধ্যযুগের শ্রেণীর মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অস্থিরতার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাস্তববাদী কবি হিসেবে তিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেন। মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশার কারণ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন প্রচলিত সমাজকেই। আবার সমকালের বিপন্ন রূপ সমাজকে অনুভব করতেই অতীতকে অনেক সময় অন্বেষণ করেছেন। স্বার্থপর মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় যে অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি ক্ষোভে ও যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। তবে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে মুগ্ধ হয়ে তাদের মধ্যেই আস্থা ও বিশ্বাস খুঁজে পেতে চেয়েছেন। জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতায় যেমন বাস্তব জীবনের বৈপ্লবিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন, তেমনি জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

১. ‘বানুর জন্য’ (১৯৫১ খ্রীঃ)

২. ‘লখিন্দর’ (১৯৫৩ খ্রীঃ)

৩. ‘উলুখড়ের কবিতা’ (১৯৫৪ খ্রীঃ)
৪. ‘মৃত্যুভীর্ণ’ (১৯৫৫ খ্রীঃ)
৫. ‘জাতক’ (১৯৫৮ খ্রীঃ)
৬. ‘তিনপাহাড়ের স্বপ্ন’ (১৯৬৩ খ্রীঃ)
৭. ‘মুগ্ধহীন ধড়গুলি আল্লাদে চিৎকার করে’ (১৯৭২ খ্রীঃ)
৮. ‘রাস্তায় কে হেঁটে যায়’ (১৯৭২ খ্রীঃ)
৯. ‘মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়’ (১৯৭৩ খ্রীঃ)
১০. ‘পৃথিবী ঘুরছে’ (১৯৭৫ খ্রীঃ)
১১. ‘বেঁচে থাকার কবিতা’ (১৯৭৭ খ্রীঃ)
১২. ‘নীলকমল-লালকমল’ (১৯৭৮ খ্রীঃ)
১৩. ‘এই হাওয়া’ (১৯৮২ খ্রীঃ)
১৪. ‘অথচ ভারতবর্ষ তাদের’ (১৯৮৫ খ্রীঃ)
১৫. ‘অফুরন্ত জীবনের মিছিল’ (১৯৮৫ খ্রীঃ)
১৬. ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’ (১৩৭১ খ্রীঃ) প্রভৃতি।

তাঁর কাব্যে সমকালের সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও স্বার্থশীল মানুষের অহমিকা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারই সঙ্গে অতীত তথা ইতিহাস বা মিথ অনেক সময় দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেছে তাঁর বৃহত্তর কাব্যজগতে। অনেক সময় অতীতের ঐতিহ্যকে তুলে এনে বর্তমানে কলুষিত জগৎ থেকে নিস্তারের পথ খুঁজেছেন। আর এই পথ ধরেই তাঁর কবিতায় প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয় পুনর্নির্মিত হয়েছে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে নিজেই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন—

“মানুষ কোনো ঈশ্বরপ্রেমিক বৃক্ষ নয়, সারা জীবন ধরে তাকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়। ...প্রেমের গান গাইতে গাইতে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে আসে ... এর পরেও কি তোমার কিছু কথা আছে? জীবনকে নতুন করে দেখার আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। কেননা, সমস্ত ব্যাপারটাই অনুভব করার। অনুভব কোনো প্রশ্নের উত্তর নয়। সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব কবি, কবিতা, কবিতার পাঠক কোথাও যদি এক সূত্রে বাঁধা যেতো? হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত।”^{১২}

৩২টি চরণে রচিত কবির ‘মৃত্যুস্তীর্ণ’ (১৩৬২) কাব্যের অন্তর্গত ‘বেহুলা নাচানো স্বর্গ’ কবিতাটিতে মনসামঙ্গলের বেহুলার স্বর্গের নৃত্যের চিত্রটি নতুনভাবে চিত্রিত করেছেন লেখক। যার ফলে কবিতাটি হয়ে উঠেছে ভিন্ন এক স্বাদের কবিতা। আমাদের পরিচিত মনসামঙ্গলের কাহিনিতে বেহুলার স্বর্গে নৃত্যের দৃশ্য আমাদের সকলেরই পরিচিত। দেবী মনসার কোপে সাওঁতালি পর্বতের উপরে অবস্থিত লোহার বাসরে স্বামী লখীন্দরকে কালসাপে দংশন করে। বেহুলা স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে কলার মান্দাসে করে মৃতদেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেসে যায়; পরে নেতা ধোপানীর সহায়তায় স্বর্গে উপস্থিত হয়। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের সম্মুখে লাস্যনৃত্য করে লখীন্দরের প্রাণ ভিক্ষা কামনা করে। এই নৃত্যের মাধ্যমে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে এবং শর্ত হিসেবে চাঁদ সদাগর বাম হস্তে মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয়। মনসামঙ্গলের কাহিনিতে বহু প্রচলিত চরিত্র বেহুলাকে সতীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়— বেহুলা বাঙালী নারীর চিরন্তন সহনশীলতার স্বরূপ নয়, বেহুলা এখানে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে মুখরা। নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি অর্জন করেছে সে। কবিতাটি শুরু হয়েছে ইন্দ্রের সভাগৃহের বেহুলার নৃত্যের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। কবি প্রথমেই বেহুলাকে প্রশ্ন করেছে—

“অয়ি পদ্ম পলাশলোচনা
তোর চোখে কি পড়লো ধুলো?
যেন নীলাকাশ জুড়ে লাল চোখ
আর মেঘে ঝড় এলো।

তোর কী হলো আজকে ললনা?
কোন কুটির ঐরাবত
দিল নীলোৎপলেও বেদনা
আহা রাঙা হলো কোকনদ।”^{১০}

নীলাকাশ জুড়ে যখন লাল মেঘে ছেয়ে যায় এবং মেঘে মেঘে ঝড় আসার চিত্রকল্পে কবি যেন বেহুলার বিদ্রোহের ঘোষণা দেখতে পান। আদিকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নারীকে পুরুষের চাহিদার যুপকার্ঠে বলী হতে হয়, বেহুলাও সেই শিকারে পরিণত হয়। কবিকে তাই বেদনার সহিত বলতে শোনা যায় কোন কুটির ঐরাবত এসে বেহুলার ‘নীলোৎপলে’ আঘাত করল, যার ফলে ‘কোকনদ’ রাঙা হয়ে উঠল। ভোগবাদী অগ্রাসী মেঘ ঝড় তুলেছে বেহুলার হৃদয়েও। বাইরেও এই

প্রতিবাদের ঝড় দানা বেঁধেছে। কবির ভাষায় তাই শোনা যায়—

“নাকি নিয়তির বাঁকা তলোয়ার
নীল নয়নে দিয়েছে দাগ
আঁকে ফুলে ফুলে তাজা রক্ত
তার শিলীমুখ অনুরাগ?”^{১৪}

বেহুলার এই দুর্দশার জন্য নিয়তিই যেন দায়ী। এই নিয়তির বাঁকা তলোয়ার নীল নয়নে দিয়েছে দাগ। ফুলে ফুলে জমে উঠেছে তাজা রক্ত। বেহুলার এই প্রতিবাদের রক্তই গ্রীষ্মের মধ্য দুপুরে যেন ডেকে এনেছে কালবৈশাখীর অগ্নিদাহ ঝড়। এই ঝড়ের মধ্যেই আশার কথা বলেছেন। তাই পূর্বরাগের সোহাগে ভরপুর বেহুলা। গলায় পড়েছে নীলকণ্ঠের মালা। দারুণ কষ্টের মুহূর্তেও এই বেহুলা দুঃসময়কে অতিক্রম করতে চেয়েছে। তাই সে গলায় পড়েছে নীলকণ্ঠের মালা। এই তেজস্বিনী বেহুলার লাস্যনৃত্য দেখে ও রং বদলের ঘটনা দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও ভয়ে কুণ্ঠিত হন। তবুও বেহুলা নটিনীর লাস্যময়তা উগ্র কামনা বাসনা প্রকাশে কেঁপে ওঠে স্বর্গ। তার লজ্জাহীন এই নৃত্যে ‘নখী রক্তচরী’র লোলুপতা আরো বৃদ্ধি পায়। শরীর লোভীরা অগ্রাসী মনোভাব নিয়ে জেগে উঠেছে। যৌবনের জলসায় দেবতাদের মুগ্ধ করার জন্য স্বীয়দেহ সপে দেয় বেহুলা। এই পরিস্থিতির জন্য বেহুলার উগ্রতাই পরোক্ষভাবে অভিযুক্ত করেন কবি। লজ্জা, ভয়, সন্ত্রস্ত প্রভৃতি মানবিক বোধগুলি যখন মাটিতে মিশে যায় তখন নেমে আসে জাতির দুর্দিন। বেহুলার প্রতি তাই কবির প্রশ্ন—

“এ কি যৌন-জ্বরের জলসায়
তুই তনু দিলি অঞ্জলি—
হাসি কান্নার চান-পান্নায়
ছুঁড়ে দিলি ছেঁড়া কপুণ্ডলী।”^{১৫}

আসলে বেহুলার এই নৃত্যের মধ্যে রয়েছে সদ্য-বিধবা নারীর চাপা কান্না। দর্শকমণ্ডলী দেবতাদের উদ্দেশ্যে পরনের ছেঁড়া কাপুণ্ডলী ছুঁড়ে দেওয়া হল শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে দেবতামণ্ডলীও জড়সড় হয়ে পড়ে। বোবা রক্তের কোলাহলে ফেটে পড়ে স্বর্গভূমি। আগুনের মতো জ্বলে ওঠে এই ‘বেহুলা নাচানো স্বর্গ’। আজকের দিনেও পুরুষের অত্যাচারের

কবলে পড়ে অবলা নারী জর্জরিত। তবে আজকের বেহুলা প্রতিবাদে মুখর, অন্যায়কে সে কিছুতেই মেনে নেয় না। আধুনিক যৌনাচারের বিরুদ্ধে সে নারীর মূল্যবোধের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ সোচ্চার হয়। আজকের বেহুলা তার নাচানো স্বর্গকে ক্রোধে আগুনের মতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই বেহুলার নৃত্যের পরিণামের কথা কবি তুলে ধরেছেন এইভাবে—

“ও কী দেবতা অসুর জড়সড়
বোবা রক্তের কোলাহলে।
এই বেহুলা নাচানো স্বর্গ?
সে যে আগুনের মতো জ্বলে।”^{১৬}

উক্ত কবিতায় আমরা দেখতে পায় বেহুলার উগ্রতায়, তেজে, ক্রোধে বেসামাল হয়ে পড়ে স্বর্গভূমি। দেবতারা চোখে খোঁয়াশা দেখে, প্রকম্পিত হয় তাদের পৌরুষ। এখানেই যেন আজকের বেহুলার জয় ঘোষণা করেছেন কবি। অসহায় এই বাংলার নারী হাসিকান্নার চুনি-পান্নায় ছুড়ে দেয় ছেঁড়া কপুলী। বেহুলার দ্বন্দ্বময়তা, বিপন্নতা এবং হতাশাময় জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে উঠে এসেছে আজকের সমাজের বিধ্বস্ত সময়ে চালচিত্র। তিনি এমন এক নারীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যার কাছে দেবতাও থরথর। এখানে বর্তমান সমাজের নারীচেতনাই যেন জয়লাভ করে। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা যেন নারীবাদী চেতনার প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। নারীর বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বেহুলা চরিত্রকে নতুনভাবে অঙ্কন করেছেন কবি।

তৎকালীন হতাশা, সংকট ও অবক্ষয়ের যুগে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার ‘লখিন্দর’ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘বেহুলা’ কবিতাটির মধ্য দিয়ে আশাবাদের কথা বলেছেন, সত্য ও সুন্দরের বাণী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লখিন্দরকে স্বদেশভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৪টি চরণের এই সনেট জাতীয় কবিতায় সংগ্রামশীল মানসিকতা নিয়ে তৎকালীন ক্লৈদান্ত সমাজকে অতিক্রম করে যাওয়ার আশা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই কাণ্ডারী হিসেবে রয়েছে বেহুলা নিজেই। মৃত লখিন্দরকে কোলে নিয়ে কলার মান্দাসে করে গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায় তাকে জীবিত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। কবিতার প্রথমেই তাই বেহুলার উক্তি শোনা যায়—

“সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্ত পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে। আমি কান্নার যন্ত্রণা
গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়াই।”^{১৭}

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের যে নৈরাজ্য, হিংস্রতা, ভীৰুতা, লোভ, হিংসা রক্তপুজে মাখামাখি রাত্রি প্রভৃতি যেন ভেলায় ভাসিয়ে দেয় বেহুলা। মানুষের মধ্যে যে প্রেম, ভালোবাসা, আত্মীয়তা, আশা, স্বপ্ন, সৌন্দর্য ছিল তা হায়না, শেয়াল, শকুনের মতো অত্যাচারীর দাঁতের আঘাতে বিপর্যস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। লুপ্ত এই শিকারীর থাবা ধারালো দাঁত কশা দ্বিপ্রহরকেও ছিঁড়ে ফেলে। এই বেহুলা কান্নার যন্ত্রণা গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়ায়। তবুও বাংলার এই বিধবা সতী লখীন্দরকে জীবিত করার কথা ভাবে। বাংলার এই সাবিত্রী পাতালে, নরকে অথবা মনের দুয়ারে যেখানেই এই ভেলা ভিড়বে, সেখানেই নিয়ে যাবে স্বামীর মৃতদেহ। এমনকি সমুদ্রেও শান্ত প্রতীক্ষার স্তোত্র গাঁথবে পয়ারে বলে প্রতিজ্ঞা করে সে। আসলে সমকালীন দেশের দুরবস্থা, দোলাচলতা তা ধৈর্য শক্তির দ্বারা, শান্ত মস্তিস্কের মাধ্যমে দূরাভূত করার কথা ভাবে। বেহুলার মৃতস্বামী লখীন্দরকে জীবিত করার যে পরিক্রমার পথ তা নতুন রূপে উঠে এসেছে। মনসামঙ্গলের মিথের নবরূপায়ন ঘটেছে এখানে। বেহুলা কবিতায় শুধুমাত্র চাঁদসদাগরের পুত্রবধূরূপে নয়, সমগ্র দেশপ্রেমিকের রূপকল্পে উঠে এসেছে; যার হাত ধরে স্বদেশভূমি আবার পবিত্র হয়ে উঠবে। এই বেহুলা তাই অনায়াসেই বলে ওঠে—

“গান দেব, জ্বলব, কিন্তু হব না অঙ্গার;
সে জাগবে, জাগবেই, লখীন্দর সে আমার।”^{১৮}

এছাড়া ‘লখীন্দর’ নামক এই সমগ্র কাব্যগ্রন্থে ছায়া ফেলেছে মনসাপুরাণের লখীন্দর চরিত্র সম্পর্কিত মিথ। এই চরিত্রকে নানা দিক দিয়ে অনুভব করতে গিয়ে তাকে তিনি নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছেন। এই কাব্যের ‘সোনার চাঁদ ছেলে’, ‘ওঁরাও নৃত্যসংগীতের অনুসরণ’, ‘গোধূলির সাঁওতাল’, ‘গোধূলিযাত্রা’, ‘প্রভাস’, ‘দময়ন্তী/২’, ‘নচিকেতা’, ‘সূর্যমুখী’ প্রভৃতি কবিতায় লখীন্দর সম্পর্কিত মিথ নতুনভাবে উঠে এসেছে। এইভাবে ‘লখীন্দর’ কাব্যগ্রন্থও হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের নব নির্মাণ। এখানেই কবির কাব্য নতুনরূপ নিয়ে সার্থকতা লাভ করেছেন।

‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’ (১৩৭১) কাব্যের ‘বেহুলা’ নামক কবিতাটি আধুনিক প্রেম চেতনার আলোকে লেখা। এই কবিতা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি বিষ্ণু দের ‘ওফেলিয়া’ কবিতাটি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লখীন্দর ও অন্যদিকে ওফেলিয়া দুজনেই নিয়তির শিকার। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব এবং লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যুর ফলে কলার মান্দাসে করে ভেসে যাওয়ায় যে তার কোন অপরাধ ছিল না। তেমনি পাশ্চাত্য নাট্যকার শেক্সপীয়রের ‘হ্যামলেট’ নাটকের নায়িকা ওফেলিয়াও হ্যামলেটের মাতার ব্যভিচারী পুণর্বিবাহ ও কাকা ক্লডিয়াসের কূচক্রান্তের জন্য দায়ী ছিল না। তবুও এই সমস্ত পরিস্থিতির শিকার হতে হয় লখীন্দর ও ওফেলিয়াকে। চাঁদ সদাগরের মনসার সাথে দ্বন্দ্বের কারণে শুধুমাত্র লখীন্দরকে প্রাণ হারাতে হয় না, বেহুলাকেও অকাল বৈধব্য বরণ করতে হয়। বেহুলা-লখীন্দরের প্রেমময় জীবন প্রারম্ভকালেই গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। সমকালীন অভিশপ্ত সমাজ ব্যবস্থায় যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করতে হয় লখীন্দর ও ওফেলিয়া। নিরাপরাধ বেহুলাকে অভিশাপ গ্রহণ করতে হয়— খণ্ড কপালিনী ও চিরুণদাতিনী ওফেলিয়া ও লখীন্দরের অপরাধহীন সত্য যন্ত্রণাকে কবি যুগযন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই যুগযন্ত্রণায় দায় বহন করতে হয় শুদ্ধচিত্ত লখীন্দর ও ওফেলিয়াকে। জলে যেমন ভাসে ওফেলিয়া, তেমনি ভাসে ‘অবাক লখীন্দর’। তবুও কবি বেহুলাকে নিয়ে আশার স্বপ্ন দেখে। এখানেই কবি বেহুলা ও লখীন্দর চরিত্র নির্মাণে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছেন। আর এভাবেই পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটেছে।

রবীন্দ্র পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভার অধিকারী হলেন কবি **বিষ্ণু দে** (১৯০৯-১৯৮২)। তিরিশের যুগে বাংলা কবিতায় মৌলিক রচনাগুণে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ইংরেজি ও ফরাসী সাহিত্য শুরু করে স্পেন থেকে চীন, রাশিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর কাব্যের ঔদার্য শুধু বিভিন্ন দেশকে অতিক্রম করে নয়, কালের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। অর্জুনের প্রতীকের সঙ্গে হ্যামলেটের প্রতীক, আর্টেমিসের চিত্রকল্পের সঙ্গে উর্বশীর চিত্রকল্প, ক্রবদুর সংগীতের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে বারোমাস্যা, লোরকা এলুয়ারের বিপ্লবী চেতনার বিদগ্ধ রুচির গুঁরাও, সাঁওতাল, ছত্রিশগড়ি প্রাণের আদিম উৎসাহ প্রভৃতি বিষয় তার কাব্যে উঠে আসে। তবে রেনেসাঁসের মোহে তিনি মধ্যযুগকে ভোলেননি। তাই তিনি কবিতা রচনা করতে গিয়ে অনেকসময় ফিরে গেছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে। ‘আলেখ্য’ (১৯৫২-’৫৮) কাব্যগ্রন্থের ‘এবং লখীন্দর’ কবিতাটিতে কবি হৃদয়ের রোমান্টিক আবেগ ও দার্শনিক মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বিচরণ করেছেন মনসামঙ্গলের পরিমণ্ডলে। এই সূত্রে কবির প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির নাম জেনে নেওয়া যাক—

১. উর্বশী ও আটোমিস’ (১৯২৬-৩২ খ্রীঃ)

২. ‘চোরাবালি’ (১৯৩৮ খ্রীঃ)
৩. ‘পূর্বলেখ’ (১৯৪০ খ্রীঃ)
৪. ‘সাত ভাই চম্পা’ (১৯৪৪ খ্রীঃ)
৫. ‘সন্দীপের চর’ (১৯৪৭ খ্রীঃ)
৬. ‘অঘিষ্ঠ’ (১৯৫০ খ্রীঃ)
৭. ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’ (১৯৫০ খ্রীঃ)
৮. ‘তিন পুরুষ’ (১৯৪৪ খ্রীঃ)
৯. ‘তুমি শুধু পাঁচিশে বৈশাখ’ (১৯৫৫-৫৮ খ্রীঃ)
১০. ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ (১৯৫৫-৬১ খ্রীঃ)
১১. ‘সেই অন্ধকার চাই’ (১৯৫৮-৬৫ খ্রীঃ)
১২. ‘সংবাদ মূলত কাব্য’ (১৯৬২-৬৬ খ্রীঃ)
১৩. ‘ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে’ (১৯৬৬-৬৯ খ্রীঃ)
১৪. ‘রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে’ (১৯৬৯-৭১ খ্রীঃ)
১৫. ‘ঈশাবাস্য দিবানিশা’ (১৯৬৯-৭৩ খ্রীঃ)
১৬. ‘চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর’ (১৯৭৪-১৯৭৫ খ্রীঃ)
১৭. ‘উত্তরে থাকো মৌন’ (১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ)
১৮. ‘আমার হৃদয়ে বাঁচো’ (১৯৭৬-৭৯ খ্রীঃ) প্রভৃতি।

কুড়িটি চরণে রচিত দৃঢ় গঠনের সনেট জাতীয় ‘এবং লখিন্দর’ কবিতায় আধুনিক যুগযন্ত্রণাময় প্রেমচেতনা উঠে এসেছে। মনসামঙ্গলের বেহুলা বাসর রাতেই বিধবা হয়। প্রেমের পরিতৃপ্তি সে কখনোই পায়নি। অপরিতৃপ্ত প্রেম বুকে নিয়ে সে মৃত স্বামীর সঙ্গে ভেসে চলে গাঙ্গুড়ের জলে। স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক আশা-স্বপ্ন নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে দিনের পর দিন গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। কবি হৃদয়ও বেহুলার মতো আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়ের ভেলায় ভেসে চলেছে। এই যাত্রীর স্রোতের সাথেই সখ্যতা। কবিতার প্রথমেই কবির ভাষায় উঠে এসেছে—

“হৃদয় তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী!

তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,

কখনো জোয়ারে আকর্ষণ বেয়ে ওঠো,

তোমার সে রূপ বেহুলার মতো চিনি।”^{১৯}

আধুনিক প্রেম বেহুলার মতো নিঃসঙ্গ। বেহুলার যন্ত্রণার মতোই তৎকালীন প্রেম যন্ত্রণামুখর। এই প্রেম স্রোতস্বিনীর মতই বহমান। কখনো জোয়ারে ফুলে ফেঁপে ওঠে, কখনো বা ভাটার টানে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এই প্রেম। স্মৃতিতে যাওয়া-আসা করে এই প্রেম, কখনো মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। অভিমান নয়, এই প্রেমের সাহচর্যেই চলেন কবি। কবি নিজে কথা বলেন না, অন্তর থেকে ভেসে আসে এই প্রেমের কথা। আশাবাদী কবি জানেন রক্তের স্রোতে প্রেম খরতোয়া। কবি এই উর্মিল জলে আসনপিড়ি পেতেছেন। ঘাটের সিঁড়ি জলে থেঁ থেঁ করলেও কবি ‘পলিচড়া’কেই সার্থকতা মনে করেন। তাই তিনি নতুন করে উৎসাহ খুঁজে পান। মহাজনী মািল্লার গান, পাগ্লি মাঝির ভাটিয়ালি গান ব্যথা ভুলে থাকার আবেশ ও অবিরাম পথ চলার অনুপ্রেরণা জোগায়। বেহুলার অনিশ্চিত যাত্রার মতো আধুনিক প্রেমও অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। পাওয়া-না পাওয়ার দ্বন্দ্ব আধুনিক প্রেম মুখরিত। এই দ্বন্দ্বের কারণেই আধুনিক মানুষ অস্থির। অস্তিত্বের সংকটের স্বীকার হয় মানুষ, কোথাও তার শান্তি নেই। জীবনের অর্থই সাগরে মৌন মানুষ শুধু তক্তায় ভাসে। জীবনের সবকিছুই মিথ্যে হয়ে যায় আধুনিক মানুষের কাছে। বর্তমানের এই অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে বেহুলার মতো নিশ্চিতপথে চলেছে আধুনিক মানুষ। লখীন্দর-সহ কাঠ, খড়, ফুল যেমন ভেসে যায় নদীতে। আধুনিক প্রেমও ভেসে চলেছে নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে। বাস্তব জীবনের এই সত্যকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—

“কত ডিঙি ভাঙো, যাও কত বন্দর,
কত কী যে আনো, দেখো কত বিকিকিনি,
তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী।
কাঠ খড় ফুল— এবং লখীন্দর।।”^{২০}

এই ভাবে কবি বেহুলা ও লখীন্দরের জীবন ইতিহাসকে আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে নিয়ে এসে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন। সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক মূল্যবোধহীনতার মধ্যে আধুনিক প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন কবি। লখীন্দর এখানে বিপন্ন সময়ের প্রতীক। যার মধ্যে রয়েছে বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা। আর এই আশাবাদকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির সময়ের বিপন্নতাটিও ‘কাঠ’, খড়, ফুল প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে সাংকেতিক হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অনুষ্ণ এখানেই নতুনভাবে উঠে এসেছে পাঠকের সামনে।

বিষ্ণু দের ‘আলেখ্য’ কাব্যগ্রন্থের ‘সে বলে’ কবিতাটিতে বেহুলার প্রসঙ্গ এসেছে। প্রেমমূলক এই কবিতাটিতে প্রেমিকাকে সাবিত্রী ও বেহুলার থেকেও অতুলনীয় ভাবা হয়েছে। শেষ ফুল শয্যার

রাত পর্যন্ত প্রেমিককে আচ্ছন্ন করে থাকবে এই প্রেমিকা। নিঃসঙ্গের দিনে কবিকে সঙ্গ দিবে সে।
কবির ভাষায় ফুটে উঠেছে প্রেমের এই চিত্ররূপ—

“সে বলে, জীবন হবে নাকি দুঃসহ
সাবিত্রী নয়, বেহুলাও নয় তুল্য;
সে নাকি মৃত্যুনাট্যে সতীর মূল্য
দিতে চায় তাই একান্তে অহরহ
আমার প্রেমের পাথেয় সে হাতে হাতে
ছেদ দেবে শেষ ফুলশয্যার রাতে।”^{২১}

এইভাবে বেহুলার প্রসঙ্গ এনে আধুনিক মানবীর প্রেমকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন কবি। কবি এখানে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের ঘটনার আবরণকে অতিক্রম করে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়েছেন। কবির চোখে বাস্তব প্রেম কঠিন ও কঠোর। তাতে হৃদয়ের লেশমাত্র নেই। সেই যুগচেতনায় মনসামঙ্গলের কাহিনীকে বৃহত্তর জীবনের ব্যঞ্জনায় নতুন করে গড়েছেন কবি। মধ্যযুগের সামাজিক ভাবনাকে সম্পূর্ণ ভেঙে আধুনিক সংকটময় জীবনে তাকে স্থান দিয়েছেন আধুনিক কবি বিষ্ণু দে।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রবীণ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জিয়া হায়দারের (১৯৩৫-) মোট পাঁচখানা কবিতা আমরা পাই যা মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে লেখা। সেগুলি হল ‘কৌটোর ইচ্ছেগুলো’ (১৯৬৮ খ্রী:) কাব্যগ্রন্থের—

১. লখিন্দর
২. বেহুলা
৩. সনকা
৪. চাঁদ সদাগর
৫. মনসা

কবিতাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার যে কবি জিয়া হায়দার পৃথক রাষ্ট্রের হলেও সাহিত্যজগত ও মানুষের চিন্তন-মননের দিক দিয়েও বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সবই একইরকম। আর মনসামঙ্গল কাব্যের ধারা পূর্ববঙ্গেও প্রচার লাভ করে। আধুনিক যুগেও ওপার বাংলার সাহিত্য জগতে মনসামঙ্গল কাব্যে প্রভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে। কবি জিয়া হায়দারের কাব্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কবির প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে হল—

১. ‘একতারাতে কান্না’
২. ‘কৌটোর ইচ্ছেগুলো’
৩. ‘দূর থেকে দেখা’
৪. ‘আমার পলাতক ছায়া’
৫. ‘লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা’ প্রভৃতি।

মোট ৬৮ টি চরণে ‘লখিন্দর’ কবিতাতে মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র লখিন্দরের মধ্যে আধুনিক যুগের আত্মসংকট ও হতাশায় পরিপূর্ণ এক যুবকের আত্ম আবিষ্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। লখিন্দরের নতুন জীবন শুরুতে লোহার বাসরঘর যেমন দমবন্ধ করে দেয়। কবি এর আড়ালে আধুনিক কলুষিত পৃথিবীতে এক যুবকের কথা তুলে ধরেছেন। আজকের লখিন্দর সতী নারী বেহুলার নিষ্পাপ প্রেম নিয়ে বাঁচতে চায়। বাসর রাতে মঙ্গলধ্বনি কামনা করে আত্মার আত্মীয়, পয়মস্ত লক্ষ্মী সুলক্ষণা, কল্যাণময়ী বেহুলার কাছে আহ্বান করে—

“কোনো শব্দ নেই, কোনো ধ্বনি;
কেমন নিঃসাড় পৃথিবীর নাটমঞ্চ যতো,
বেহুলা, আমার প্রেম, কথা বলো প্রেম;
কোনো ধ্বনি, শব্দের অক্ষুট উচ্চারণে
হীরের ছুরির মত কেটে দাও এই
ভয়াবহ নিস্তব্ধতা; প্রেম আনো আমাদের প্রথম রাত্রিতে।”^{২২}

এই লখিন্দর সমস্ত বিচ্ছেদকে দূর করতে চায় বেহুলাকে আলিঙ্গন করে। মানুষের মঙ্গলের জন্য আজকের লখিন্দর মৃত্যুকে বরণ করতেও রাজি। যদি ধূলিধূসরিত পৃথিবীতে স্বর্গের সিংহাসন অর্থাৎ সমস্ত সুখ শান্তি ফিরে আসে, তবে মৃত্যুকে বরণ করে যুবক। এই ভাবে দেখি আধুনিক জীবনজিগসাকে তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন লেখক।

‘বেহুলা’ শিরোনামের কবিতাটি নারীর অধিকার চেতনার কথা উঠে এসেছে। বেহুলা যেমন কোন অপরাধ না করেও বাসর রাতে বিধবা হয়ে দুঃখভোগ করে। বাস্তবেও নারী পরিবারের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দেয়। স্বশুর বাড়ির গঞ্জনা, অত্যাচার সহ্য করেও সন্তানপ্রতিপালন করে পুরুষকে সুখী করে নিজে সুখী হয়। তাই তার মুখে শোনা যায়—

“আমি যে সন্তান দেবো আগামী পৃথিবীকে, আমি

প্রেমের মাধুরী দেবো পুরুষের উপোষী অধরে
আমি যে ওড়াবো পায়রা সংসারের বিলাশ আকাশে,
প্রীতিস্নেহ ভালোবাসা মমতার উদার সাগরে
সিঁক্ত করবো নিজেকে, এবং
বৃষ্টির আদরে আমি ছড়বো আবার।”^{২৩}

একইরকম ভাবে কবির ‘সনকা’ শিরোনামের কবিতাটিতেও নারীর কথা উঠে এসেছে। মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের সনকা কোন অপরাধ না করেও সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা মেনে নিয়েছিল নিয়তির বিধান বলে। কিন্তু আজকের সনকা সরাসরি স্বামী চাঁদ সদাগরকে প্রশ্ন করে—

“কিন্তু আমি হতভাগী নারী
কোন্ দোষে দোষী বলো?”^{২৪}

দয়ামায়াহীন স্বামীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সহধর্মিণী হলেও ভুল পথে সে চলতে নারাজ। নিজের সুখের সংসার, হৃদয় স্নেহের জন্য মনসার পূজা দিতেও চায়। কবি জিয়া হায়দার নিজের দেখা নারীর যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে গিয়ে হাত বাড়িয়েছেন ঐতিহ্যশালী চরিত্র সনকার দিকে। জীবনভর স্বামীর কথা মুখ বুজে সহ্য করলেও জীবনের শেষ সীমায় এসে স্বামীর প্রতি প্রশ্ন তুলে। নারী ধৈর্যের বাঁধ আর থাকে না। এই সূত্রে আমাদের মনে করিয়ে দেয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরঙ্গনা’ কাব্যের শকুন্তলা, কৈকেয়ী, জনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি।

তঁার ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতাও নারীর প্রতি অবজ্ঞা পুরুষের, তা চাঁদ সদাগরের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে পৌরুষত্বের দান্তিকতা, তা উঠে এসেছে চাঁদ বণিকের বক্তব্যে—

“অন্তত দু’দিক সে কি দেখতে পারে, এক চক্ষু যার?
ভাবিস্ কেমন করে তাকে আমি পূজো দেবো, ওরে
মূঢ়া নারী। যেখানে আমার শিব-সুন্দর পরম,
লক্ষ্মী যাঁর গৃহিণী কল্যাণী!”^{২৫}

তবে পুত্রবধূ বেহুলার কাছে হার মানতে হয় চাঁদ বণিককে। আসলে এই হার স্নেহের হার। আশাবাদী কবি নারীর প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। এই দিক থেকে কবিতাটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

কবির ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের ‘মনসা’ নামক কবিতাটিতে মনসাদেবীর এক ভিন্নরূপ

দেখি। মোট ৭০ টি চরণের এই কবিতার প্রথমার্ধে বেহুলার প্রতি মনসার ব্যঙ্গোক্তি দেখা যায় যা মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা পাই না। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলার জীবন তুচ্ছ করে ভেসে যাওয়াকে সমর্থন করেনি মনসা। বরং মনসার কাছে তা নিন্দনীয়। আসলে নারীকে সচেতন হতে হবে তা কবিতায় তুলে ধরেছেন। মনসা দেবীর মতে স্বর্গের উৎস কোথাও নেই, যেখানে বেহুলার কষ্টের মহিমা বুঝবে। যার জন্য সমস্ত ত্যাগ, বেহুলার সেই লক্ষীন্দর বেহুলাকে বুঝবে না। দেবীর মতে প্রেম-প্রীতি সব কিছুই যেন মিথ্যে। তাই বেহুলাকে সতর্ক করে মনসা বলে—

“স্বর্গের নেই উৎস কোথাও এখন,
লক্ষীন্দর দেবেনা আদর তোমাকে,
যতোই তোমার তুলসীতলার মানত
হোকনাকো নিষ্কলুষ, যতোই হওনা
লক্ষ্মী অথবা সতী সুন্দরী বেহুলা;”^{২৬}

পরক্ষণে কবিতার শেষ পর্বে আবার দেখি চাঁদ সদাগরকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে মনসা। নানা প্রতিজ্ঞা ও বলিষ্ঠতার পরে চাঁদ মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয়। মিথ্যা দান্তিকতাকে আশ্রয় করে চাঁদ বাম হাতে হলেও অবশেষে মনসার পূজা দেয়। পৌরুষত্বের গর্ব, আদর্শ, দম্ভ, সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় চাঁদের। তবে দেবীর পূজায় আশীর্বাদ স্বরূপ ঘরের লক্ষ্মী আবার ফিরে আসবে। দেবীর কৃপায় আবার পৃথিবীর অর্থ, কাম যত আছে সবই হবে আবার। আত্মসেবাই যে পরম দেববাণী এবং পার্থিবতায় যে স্বর্গের মত সুখ তা অনেক পরে বুঝতে পারে সদাগর। তাই বাম হাতে হলেও পূজা দিতে রাজি হয় সদাগর। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে কবি মনসার মানসিক বিবর্তনের দিকটি সত্যিই প্রশংসনীয়।

পরিশেষে বলা যায় কবি জিয়া হায়দার সমকালের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করতে হাত বাড়িয়েছেন মনসা পুরাণের দিকে। একদিকে লক্ষীন্দরের মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ প্রতীকীভাবে যুবশক্তির অসহায়তাই উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে মানুষের আত্মসংকট স্পষ্ট হয়েছে চারিদিকে লৌহবাসরের চিত্রকল্পে। অন্যদিকে বেহুলা, সনকা ও মনসার চরিত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক নারী চেতনা ও জীবন জিজ্ঞাসার দিকটি চিত্রিত করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর প্রতিটি কবিতা হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের আধুনিক নবনির্মাণ।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ শতকের তিন, চার ও পাঁচের দশকে আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (১৯০৯-১৯৬৯)। একাধারে চিত্রশিল্পী, কবি, সমালোচক বলে

চিরপরিচিত। এমনকি তিনি ‘পূর্বাশা’ পত্রিকার সম্পাদক ও পূর্বাশা প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতাও। রবীন্দ্রমনোভাবের বিরোধিতার সময়ে বাংলা সাহিত্যে যে অস্থিরতা পরিমণ্ডল তৈরি হয় সেই সময়েই কবিতার ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু সঞ্চয় ভট্টাচার্যের। তার প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

১. ‘সাগর ও অন্যান্য কবিতা’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)
২. ‘পৃথিবী’ (প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৯ খ্রীঃ)
৩. ‘সংকলিতা’ (প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রীঃ)
৪. ‘নতুন দিন’ (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৭ খ্রীঃ)
৫. ‘প্রাচীন প্রাচী’ (প্রথম সংস্করণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৮ খ্রীঃ)
৬. ‘যৌবনোত্তর’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮ খ্রীঃ)
৭. ‘অপ্রেম ও প্রেম’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ খ্রীঃ)
৮. ‘পদাবলী’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩ খ্রীঃ)
৯. ‘সবিতা’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ খ্রীঃ)
১০. ‘উত্তর পঞ্চাশ’ (প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ খ্রীঃ)
১১. ‘উর্বর-উর্বশী’ (প্রথম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ খ্রীঃ)
১২. ‘অগ্রস্থিত কবিতা’ (রচনাকাল ১৩৪৬-১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)

সঞ্চয় ভট্টাচার্যের ‘বেহুলা’ কবিতাটি ‘অলিন্দ’ পত্রিকার ৮ সংখ্যা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। পরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার কাব্যগ্রন্থে গৃহীত হয়। মোট ৮টি চরণে এই কবিতায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ‘মিথ’ ও ‘লোকপুராণ’ অনুরসরণে সমকালের বিধ্বস্ত সময়ের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের ছয়-সাত দশকের সমাজে যে অস্থিরতা, বিপন্নতা তা তুলে ধরতে গিয়ে অতীত ঐতিহ্যের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। সমকালের জীবনী শক্তিকে তুলে ধরতে মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলাকে আশ্রয় করেছেন। বেহুলাকে তাই কবির আহ্বান—

“নাচো নাচো বেহুলা আমার,
বর্ষণ-ভোলানো নাচ নাচো,
নদী উৎসে এসে গেছে।”^{২৭}

‘নদী উৎসে এসে গেছে’— অর্থাৎ সমাজ উন্নয়নের সমভাবনা রয়েছে প্রবল। কিন্তু কবি নিজেকে অসহায় মনে করেন। ফুল্ল নগরের এক মৃত প্রাণ মনে করেন নিজেকে। নতুন দেশ ও জাতি গঠনে অন্যায়কারীরা যে বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করে তাতে সমাজের কল্যাণ হতে পারে না। কবির তাই

প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে এখানে। নাগিনী স্বরূপ অত্যাচারীর দল বর্ষণ উৎসবে নৃত্য করে। এই নাগিনীদের পরাভূত করতে নারীশক্তির প্রতিক্রিয়া বেহুলাকে আহ্বান করেছেন। সর্পদংশনে নিহত লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা গাঙ্গুরের জলে ভেসে যায়। তার একনিষ্ঠতা ও মনোবলের কাছে হার মানে দেবসভার দেবতাগণও। স্বামী ও ছয় ভাসুরকে জীবিত ফিরিয়ে আনে। সর্পদেবী মনসাও বেহুলার পাতিব্রত্য ও সততায় মুগ্ধ হয়ে দ্রুততাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কবি বর্তমান সমাজের এই দূরাবস্থায় পুরাণের সেই নারী শক্তিকেই আহ্বান জানিয়েছেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনসা-কথাকে কাব্যের গঠনশৈলী হিসেবে না নিয়ে মনসামঙ্গলকাব্যের অনুষ্ণ ব্যবহার করেছেন। বর্তমান সময়কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে মধ্যযুগের নারীর সেই সম্মোহনী শক্তিকেই নিয়ে এসেছেন। যার কাছ থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচার মন্ত্র দিতে চান কবি। সবাইকে নিয়ে সেই সাহসিনী শক্তির ভেলায় ভাসতে চান। বেহুলা হয়ে ওঠে তেজ ও দৃঢ়তার প্রতীক। সাধারণ মানুষের রক্তের উত্তেজনা হয়ে ওঠে এই বেহুলা। কবির মুখে তাই শোনা যায়—

“—শরবিদ্ধ প্রাণ

তোমার ভেলায় যদি নিলে

নাচো জল, নাচো রক্ত, বেহুলা আমার।”^{২৮}

কবি এইভাবে বর্তমান সময়কে তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের নতুনভাবে রূপায়ণ করেন।

উত্তাল চল্লিশের দশকে সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রত্যয়ী মানসিকতা নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে পদার্পণ ঘটে প্রখ্যাত কবি অরুণ মিত্রের (১৯০৯-২০০০)। তাঁর কবিতায় বাস্তবের নানা ঘটনার সঙ্গে রোমান্টিকতা মিশে এক নতুন রোমান্টিকতার সৃষ্টি হয়েছে। গদ্যভাষায় অত্যন্ত সহজ সরল কথায় তৎকালীন সময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে এই সহজ ভাষায় উঠে এসেছে গভীর এক ব্যঞ্জনা। শব্দব্যবহারে, চিত্ররচনায়, নানা অলংকার সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে বাংলা কাব্যজগতে নতুন ঐতিহ্যের নির্মাণ করেছেন। একদিকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, জনগণতান্ত্রিক চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ, হাতুড়ি, ইস্তাহার। অপরদিকে শান্ত স্নিগ্ধ জীবনের শ্রোত, অফুরন্ত প্রকৃতির রূপময়তা, রোদছায়া, সবুজ গাছপালা, খোয়ামাটির অপূর্ব রহস্যময়তা তাঁর কবিতাকে অনন্যমাত্রা দান করেছে। অরুণ মিত্রের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে হল—

১. ‘প্রান্তরেখা’ (১৯৪৩ খ্রীঃ)

২. ‘উৎসের দিকে’ (১৯৬৫ খ্রীঃ)

৩. ‘ঘনিষ্ঠ তাপ’ (১৯৬৩ খ্রীঃ)
৪. ‘মঞ্চের বাইরে মাটিতে’ (১৯৭০ খ্রীঃ)
৫. ‘শুধু রাতের শব্দ নয়’ (১৯৭৮ খ্রীঃ)
৬. ‘প্রথম পলি শেষ পাথর’ (১৯৮১ খ্রীঃ)
৭. ‘খুঁজতে খুঁজতে এতদূর’ (১৯৮৬ খ্রীঃ)
৮. ‘যদিও আগুন বাড় ধসাতাঙা’ (১৯৮৮ খ্রীঃ)
৯. ‘এই অমৃত, এই গরল’ (১৯৯১ খ্রীঃ)
১০. ‘টুনি-কথার ঘেরাও থেকে বলছি’ (১৯৯২ খ্রীঃ)
১১. ‘খরা-উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি’ (১৯৯৪ খ্রীঃ)
১২. ‘অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে’ (১৯৯৬ খ্রীঃ)
১৩. ‘ওড়াউড়িতে নয়’ (১৯৯৭ খ্রীঃ)
১৪. ‘ভাঙনের মাটি’ (১৯৯৮ খ্রীঃ)

অরুণ মিত্রের ‘ভাঙনের মাটি’ (১৯৯৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘ও বেহুলা’ কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা। গদ্যকবিতার আদর্শে রচিত এই কবিতায় বাস্তব জগতের নানা প্রশ্ন তুলে ধরেছেন কবি। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা লখীন্দরের কাহিনীকে অবলম্বন করে আধুনিক সংকটময় জীবনের সত্যতাকে তুলে ধরেছেন কবি। মনসামঙ্গল কাব্যে নিছনি নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা নৃত্যপটیسী, কর্মনিপুণা, সতিসাম্বী নারী। সে লোহার কলাই সিদ্ধ করে চাঁদ সদাগরের গৃহের পুত্রবধূর যোগ্যতা প্রমাণ দেয়। কিন্তু প্রতিপ্রাণা এই নারীর কপালে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই জোটে না। চাঁদ সদাগরের সাথে মনসার দ্বন্দ্বের কারণে বাসররাতে প্রাণ হারাতে হয় লখীন্দরকে। সদ্য বিবাহিতা বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যায় গাঙ্গুড়ের জলে। বিশ শতকের কবি অরুণ মিত্র বেহুলার এই করুণ চিত্রকে তুলে ধরেছেন নানা জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে। মাঝরাতে কবির বিছানায় ঢেউ লাগলে, অর্থাৎ মনের মধ্যে দোলাচলতা সৃষ্টি হলে বেহুলার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। কবি বক্তব্য, লোহার বাসর ঘরে কালনাগিনী দ্বারা দংশিত লখীন্দরকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যায় বেহুলা, স্বামীকে একলা ভেসে যেতে দেয়নি। সমাজের বিধানকে অতিক্রম করে সে স্বামীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাড়ি দেয়। সেটা তবে আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ বেহুলা লখীন্দরকে ভীষণ ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসার তেজ হল দুর্দান্ত। সব বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে হাজির হয় দেবতাদের আড্ডায়।

সেখানে সবাইকে নাজেহাল বেসামাল করে, সকলের মন জয় করে লখীন্দরকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনে বাড়িতে। বেহুলার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায় সারা দেশে। মানুষের স্লেগান ওঠে বেহুলার পাতিব্রত্যতার জন্য। পূণ্যভূমির আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় তার পতিভক্তি ও সতীসাধ্বী তক্কার পুরস্কার। বেহুলার এই সতীত্বের কথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু আধুনিক মনোভাবাপন্ন কবি বেহুলার প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়—

“ও বেহুলা, এখন বলো তো আমায় লোহার বাসর ঘরে অন্ধকারে সাপটা

যদি ভুল করে লখীন্দরের বদলে তোমাকে ছোবল দিত, তাহলে কী হত।”^{২৯}

প্রশ্ন শুনে বেহুলা মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে। নিরুত্তর বেহুলাকে কবি উত্তরে বলেন যে, লখীন্দর যত্ন করে বয়ে নিয়ে যেত, অতি যত্নে কলার ভেলায় শোয়াত। তারপর ভেলা ভাসিয়ে দিত জলে। কিন্তু সে নিজে দাঁড়িয়ে থাকত ডাঙাতেই এবং ডাঙার উপর দিয়েই ভাঙা হুৎপিণ্ড নিয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে আসত। পত্নী হারানোর বিরহে তুষের আগুনে দিনরাত পুড়ত লখীন্দর। দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে সংসারে টিকে থাকত কিছুদিন। কিন্তু মাস দুই কাটতে না কাটতেই লখীন্দরের কাছে বিরহ এত অসহ্য হয়ে উঠল সে পুনরায় সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। বেহুলার মত অপরূপ সুন্দরী না হলেও কোন অসুবিধে নেই।

কবি অরুণ মিত্র সহজ সরল কথার মাধ্যমে এক গভীর গূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। মানুষ বিংশ শতকের দোরগোড়ায় এসেও নারীর প্রতি অবহেলা, অন্যায় অত্যাচার থেকে বিরত থাকেনি। যুক্তিবাদী কবির মন কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেনি। তাই বর্তমানের চিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের পতিব্রতা নারী বেহুলাকে নিয়ে এসে তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। নারীজাতির জাগরণের প্রয়াস লক্ষ করা যায় কবিতায়। শুধু তাই নয়, সমকালের মানুষের মূল্যবোধ, আদর্শ, বিভিন্ন ঘটনার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বাস্তব সচেতন মানসিকতাটিকে নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে ‘অতীত’ ও বর্তমানের মানসিকতার বিবর্তনটি নতুনভাবে বিশিষ্ট হয়েছে। আজকের মানুষের দুর্বলতা, স্বার্থশীলতা, অসহায়তা ও বাস্তবতাকে তিনি সহজ সরলভাবে তুলে ধরতে গিয়ে লোকপুরাণের ঐতিহ্যকেই মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাই ‘ও বেহুলা’ কবিতাটি পুরোপুরি হয়ে উঠেছে প্রচলিত মনসাপুরাণের নবনির্মাণ। এইভাবে কবি অরুণ মিত্র মনসাপুরাণের কাহিনীর বেহুলা চরিত্রকে আধুনিক সংকটময় পরিস্থিতিতে নিয়ে এসে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন তাকে। কবিতার আকারে মনসামঙ্গলের বেহুলা হয়ে উঠেছে আধুনিক এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র। এই দিক দিয়ে কবি অরুণ মিত্রের ‘ও বেহুলা’ কবিতাটি হয়ে

উঠেছে এক নতুন মঙ্গলকাব্য। সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য তাঁর ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

“এইভাবে কবি সহজ সরল অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে এক অসাধারণ
ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন। নির্মাণ করেন প্রচলিত মনসাপুরাণের আধুনিকতম
ও বাস্তবধর্মী শিল্পরূপ।”^{৩০}

তাই বলা যায় কবি অরুণ মিত্রের ‘ও বেহুলা’ কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসা-কথার সার্থক নবনির্মাণ।

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম কবি হলেন শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-)। বাংলা কাব্য সাহিত্যের
জগতের স্বতন্ত্র মেজাজের কবি শঙ্খ ঘোষ। তিনি দেখেছেন দেশ-ভাগের যন্ত্রণা, গ্লানি, দেখেছেন
নিঃস্ব মানুষের হাহাকার, খাদ্যের সারিতে দাঁড়ানো মানুষের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। তিনি আরো
খুব কাছ থেকে দেখেছেন তেভাগা আন্দোলন, যাটের দশকের নকশাল আন্দোলন, মানুষের
মূল্যবোধের ক্রমিক অবক্ষয়, মানুষের আদর্শের অপঘাত ও মনুষ্যত্বের মৃত্যু। আর এগুলিই রূপায়িত
হয়েছে তাঁর কবিতায়। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দায়বদ্ধতা থেকে কবি শঙ্খ কলম ধরেন। তাঁর
প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে হল—

১. ‘দিনগুলি রাতগুলি’ (রচনা ১৯৪৯-৫৫/প্রকাশ ১৯৫৬)
২. ‘নিহিত পাতালছায়া’ (রচনা ১৯৬০-৬৬/প্রকাশ ১৯৬৭)
৩. ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’ (রচনা ১৯৬৭-৬৯/প্রকাশ ১৯৭৮)
৪. ‘আদিম লতাগুল্মময়’ (রচনা ১৯৭০-৭১/প্রকাশ ১৯৭২)
৫. ‘মুখ বড়ো, সামাজিক নয়’ (রচনা ১৯৭২-৭৩/প্রকাশ ১৯৭৬)
৬. ‘বাবরের প্রার্থনা’ (রচনা ১৯৭৪-৭৬/প্রকাশ ১৯৭৬)
৭. ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ (রচনা ১৯৭৬-৭৮/প্রকাশ ১৯৮২)
৮. ‘প্রহরজোড়া ত্রিতাল’ (রচনা ১৯৭৭-৮১/প্রকাশ ১৯৮২)
৯. ‘বন্ধুরা মাতি তরজায়’ (রচনা ১৯৭৬-৮০/প্রকাশ ১৯৮৪)
১০. ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ (রচনা ১৯৮২-৮৩/প্রকাশ ১৯৮৪)
১১. ‘ধুম লেগেছে হৃৎকমলে’ (রচনা ১৯৮৪-৮৬/প্রকাশ ১৯৮৭)
১২. ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’ (রচনা ১৯৯০-৯৩/প্রকাশ ১৯৯৩)
১৩. ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’ (রচনা ১৯৮৭-৯৪/প্রকাশ ১৯৯৪)

১৪. ‘শবের উপরে শামিয়ানা’ (রচনা ১৯৯৬৪-৯৬/প্রকাশ ১৯৯৭)

১৫. ‘ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার’ (রচনা ১৯৯৭-৯৮/প্রকাশ ১৯৯৯)

১৬. ‘জুলাই পাষণ হয়ে আছে’ (রচনা ২০০১-০৩/২০০৪)

১৭. ‘সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি’ (২০০৪-০৬/রচনা ২০০৭)

শঙ্খ ঘোষের ‘হেতালের লাঠি’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়। পরে এটি ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আঠেরোটি চরণে রচিত এই কবিতা দুটি স্তবকে বিন্যস্ত। প্রথম স্তবক আটটি এবং দ্বিতীয় স্তবক দশটি চরণে বিভক্ত। বর্তমানের সমস্যা, অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কবি আশ্রয় নিয়েছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ বণিক ও তার হেতালের লাঠির কাছে। দৃঢ় প্রত্যয়ী, নিষ্ঠুর চাঁদ ও তার হেতালের লাঠিকে তিনি প্রতীকী প্রহরীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে— কবিতা হলো তাই, যা আমাদের অধিচেতনা আর অবচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় আমাদের সময়ের চেতনাকে। কবিতা আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের একটা কিছুতে এনে বাঁধে। ‘হেতালের লাঠি’ কবিতাটিতে কবি অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতির অবক্ষয়ের মুহূর্তে প্রহরী স্বরূপ চাঁদ বণিককে দাঁড় করিয়েছেন কবি। কবিতার প্রথমেই তাই আমরা পাই—

“হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে

কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক

এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের

শিয়রে কুন্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।”^{১১}

কবি হেতালের লাঠিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে বিবাদের কারণে পুত্র লখিন্দরের বাসররাতে মৃত্যু হয় সর্পদংশনে। বিশ শতকের আটের দশকে দাঁড়িয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ এই অন্যায়কে মেনে নেন। আজকের নিরাপরাধ বেহুলা-লখিন্দরকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে শুভ ভবিষ্যৎ-এর দিকে নিয়ে যেতে আগ্রহী। তাই তিনি লোহার সিঁড়িতে বসে পাহারা দেন, অন্ধকারময় পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার আশায় রাত জেগে থাকার কথা ভাবেন। এই কালরাত্রে কোন ফণা এসে দংশন না করতে পারে তাদের। এই শুভ মুহূর্তে; প্রেমের প্রহর কেটে যাক। কিন্তু এক বড় ঘুম কালঘুম, মায়াঘুম এসে চোখ জড়িয়ে

ফেলে। ক্লান্তি, অবসাদ এসে পড়ে শিরা-উপশিরায়। চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে শরীর অবশ হয়ে এসে ঢিল হয়ে পড়ে মুঠি হাত থেকে ঘসে পড়ে হেতালের লাঠি। আসলে কবি বেহুলার লখিন্দরের চিত্রকল্পে তৎকালীন সময়ের এক আদর্শবাদী ব্যক্তিত্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই ব্যক্তিত্ব দেশ ও সভ্যতাকে নতুনভাবে গড়ে তুলবেন, সৃষ্টি করবেন নতুন সমাজ, প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণতান্ত্রিক চেতনার অধিকার। নিরলস এই কর্মযজ্ঞে যারা পরিশ্রম করে চলেছে তাদের সামনে নানা বিপদ। মনসা স্বরূপ অশুভ শক্তি গ্রাস করতে চায় সমস্ত মঙ্গলময় পরিস্থিতিকে। এই চেঙমুড়ি কানী নতুন ঔপনিবেশিকতার জাল পেতে মানুষকে যন্ত্রণা, হতাশা, হাহাকার ও সর্বহারার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কবি এই বুর্জোয়া শাসনের শক্তিকে প্রতিহত করতে হেতালের লাঠিকে অবলম্বন করেছেন। মনসামঙ্গলের চাঁদ যেমন সত্যের পথে চলতে গিয়ে নানা বাঁধা-বিপত্তির মধ্যে পড়ে। হারাতে হয় ছয়-পুত্র ও চৌদ্দ ডিঙা মধুকর। ভিথিরির বেশে বাড়ি ফিরে সর্বস্ব হারিয়ে। মহাজ্ঞান কবচ হারিয়ে যেমন অসহায় হয়ে পড়ে। তেমনি তার বাড়িও পরিণত হয় শ্মশানে। তবু চাঁদ আশা হারায়নি। স্বপ্ন দেখেছেন আবার নতুন করে সবকিছু গড়ে তোলার আশায়। কবিতার মধ্যেও দেখি কবি আশার আলো খুঁজতে থাকেন। কবিতার শেষ স্তবকে তাই কবির মুখে শোনা যায়—

“তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবীর সুন্দরতর ক’রে
নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।”^{৩২}

নিজের আপনজন ও ধনসম্পদ রক্ষার্থে চাঁদ সদাগর যেমন হেতালের লাঠি ব্যবহার করেছিলেন। বিশ শতকেও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি স্বপ্নের ভিতর দিয়ে স্বপ্ন দেখতে চান। সত্যকে জয় করতে চান তিনি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তার স্বপ্নের বেহুলা-লখিন্দর হেঁটে চলেছে পৃথিবীকে সুন্দরতম করে। কিছু এই মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্যে তারা হেঁটে চলেছে কোন নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে। তারা যতদূর যায়, শুধু মাঠভরা ধান। এখানে বেহুলা-লখিন্দর ও ক্ষেতভরা ধানের অনুষঙ্গে কবি দেশের ভবিষ্যৎকে তুলে ধরেছেন। প্রেম ও সবুজের পথ দিয়েই পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। এই মহান কর্মযজ্ঞে শুধু পুরুষ নয়, নারী ও পুরুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এগিয়ে চলে। তারা পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার স্বপ্ন নিয়ে নতুন পথে চলতে চায়। তবে কবি পুরোপুরি কল্পনার জগতে না হেঁটে মাটির পথে, আলের পথে হাঁটতে চেয়েছেন। এরই মধ্যে দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। এই সবুজ সমৃদ্ধ ধানের মাঠ

ও মানুষের সমাজে যারা প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের রক্ষা করাই যেন কবির দায়। আর এই স্বপ্নপূরণের জন্য হেতালের লাঠিকে অবলম্বন করতে বলেছেন। তাই কবি বিশ শতকের আটের দশকে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও নিজস্ব আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলকে সক্রিয় হতে বলেছেন। তাই কবিতার শেষ চরণে কবির মুখে শোনা যায়—

“যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেতালের লাঠি যেন এ কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।”^{৩৩}

কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সকলকে চাঁদ সদাগরের একাগ্রতা, বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তার সঙ্গে কল্পনা করেছেন, যারা এই মাটির সঙ্গে যুক্ত। কোন রকম ছলনা, মায়াজাল অর্থাৎ কালঘুম বা মায়াঘুম পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। এই চম্পকনগরে আজ বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তৈরি এক স্বার্থের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুবিধাবাদী লোকের চক্রান্তে মানুষের আদর্শ ও স্বপ্ন বিস্মৃত হয়ে ওঠে। ভোগবাদী এই সভ্যতায় কবি জাতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। মানুষের মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাঁদবেনেকে নিয়ে এসেছেন কবিতার মধ্যে। তার হেতালের লাঠিই হল কবির অস্ত্র। বিপ্লব এ সময়ের দারপ্রাস্তে দাঁড়িয়ে হেতালের লাঠিকেই কবি মাটির মানুষের বেঁচে থাকার হাতিয়ার করতে চান। এই দিক দিয়ে কবিতাটি হয়ে উঠেছে অভিনবত্বের এক নতুন দিক। মধ্যযুগের চাঁদ সদাগর চরিত্রের হেতালের লাঠিকেই কবি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। তাই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা কবিতার কালান্তর’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

“চারের দশকে কোনো কোনো কবি লোকপুராণ, জাতীয় মীথ ইত্যাদিকে কবিতায় ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। আমার বলতে দ্বিধা নেই সে কবিতায় যে ব্যঙ্গনা আভাসিত হতে গিয়েও পারেনি, ‘হেতালের লাঠি’ সে সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই কালরাত্রির উপরই তখন একটি কবিতা শারদীয় সংখ্যা ‘পরিচয়’-এ বেরিয়েছিল। ... শঙ্খ ‘হেতালের লাঠি’তে চাঁদবেনেকে নায়ক করে শুধু যে পটভূমির ব্যাপকতা এনেছেন তাই নয়— সমস্ত সংকটকে এক বিপুলতর ব্যাপ্তি দিয়েছেন। অধিকার নিয়েই বলছি— নিশীথনগরে কানীর চক্রান্ত নিয়ে লেখা এ কবিতা অনেক লক্ষ্যভেদী কবিতা—উৎকৃষ্টতর

চাঁদবেনে যেমন হেতালের লাঠি দিয়ে অশুভ শক্তির প্রতীক মনসার ঘট ভাঙে, মনসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কবি শঙ্খ ঘোষ বিশ শতকের উত্তাল পরিস্থিতিতে হেতালের লাঠিকে নিয়ে এসে মনসামঙ্গলের নবরূপায়ণ ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগের হাতিয়ার। মনসা পুরাণের চাঁদবেনের হেতালের লাঠি মনসাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেও কবি বিশ শতকে সচেতনভাবে এই হাতিয়ার ব্যবহার করতে বলেছেন। যা মাধ্যমে জয় নিশ্চিত হয়। এইভাবে মনসামঙ্গলের মিথের নতুনভাবে আধুনিক রূপায়ণ ঘটেছে কবি শঙ্খ ঘোষের হাতে। এই দিক দিয়ে কবিতাটি সার্থকতা লাভ করেছে।

বরাক উপত্যকাকে সমস্ত বাংলা সাহিত্যের ভূবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বলা যায় তিনি হলেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী (১৯৩৭-২০০৫)। তিনি প্রকৃতির কবি, রোম্যান্টিক কবি। প্রেমের কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তবে রোম্যান্টিক কবি হয়েও তিনি বস্তুবাদী। সাধারণ মানুষ, জন্মভূমি মাটির কথা, স্বজন-পরিজনের কথা অত্যন্ত সচেতনভাবে উঠে এসেছে। তাঁর কবিতায় ছন্দের ব্যবহার যেমন উৎকৃষ্টতার দাবি রাখে, তেমনি দ্বিধাহীন চিন্তে বাস্তবজগতের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশ শতকের সাত, আট ও নয়ের দশকের বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। রোম্যান্টিক এই কবি বাস্তব জীবনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে অনেক সময় পৌঁচেছেন আমাদের অতীত ঐতিহ্যের কাছে। এরকমই তাঁর ‘অনন্ত ভাসানে’ (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের ‘মনসামঙ্গল’ কবিতাটি। তৎকালীন সময়ের পরিস্থিতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাগাধুনিক সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যের কাছে হাত বাড়িয়েছেন। এছাড়া তিনি ‘সময় শরীর হৃদয়’ (১৯৭০), ‘এই পথে অন্তরা’ (১৯৭৬), ‘কাঠের নৌকা (১৯৯৪), ‘লঘু পদ্য’, ‘দ্বন্দ্ব অহর্নিশ’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিশ শতকের আটের দশকের পটভূমিকায় মনসামঙ্গলের আবহের আড়ালে সমকালীন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। জলা-জঙ্গলময় পূর্বাঞ্চলে সাপের আধিক্যের কারণে মনসা পূজার প্রচলন রয়েছে। নিম্নভূমি এই বরাক উপত্যকায় বর্ষাঋতুর দিনে সাধারণ মাটির মানুষের জীবনযাপন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আঠারোটি চরণে রচিত অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দোময় এই কবিতায় প্রথমেই কবির মুখে শোনা যায়—

“সপ্তডিঙা মধুকর চারিদিকে জল

শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসা-মঙ্গল
পচা পাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা
হু হু করা কালসন্ধ্যা ভেসে আসা গানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।”^{৩৫}

কবি ‘ছেঁড়া কাঁথা’ ও ‘পঁচা পাটের এঁদো ডোবা’র মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলেছেন। শ্রাবণের অবিশ্রাম ধারার ফলে চারিদিকে অর্থহীন জল। এই দুর্ভোগের সন্ধ্যায় ভেসে আসা গান সাইবেনের কন্যা বেহুলার গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যাওয়ার মতো। তবে এই বন্যা কবলিত এলাকায় কোন চম্পকনগর বা নিছনিগর নেই। এখানকার মাটির ঘরে প্রদীপের অভাবে অন্ধকারে ‘নিরক্ষরা’ বুড়ি মা ছেলের জন্য পথ চেয়ে থাকে। ছেলে রাতের অন্ধকারে জাল নিয়ে নদীতে গেলে, দেবী মনসার কাছে এই বুড়িমা প্রার্থনা করে ছেলের মঙ্গলের জন্য। আসলে সাধারণ মানুষের করুণ জীবনচিত্র কবি জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতার শেষ ছয়টি চরণে মানুষের দারিদ্রতা ও আকৃতির চিত্র উঠে এসেছে—

“গাঙের গর্ভিনী সেই গন্ধ ভেসে আসে
শ্রাবণীর দিগম্বর দখিনা বাতাসে
এখনো বুকুর দ্বিজ বংশীদাস কহে
হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কালীদহে ...
ডহরের ঘোর লাগা গহনের টানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।”^{৩৬}

বিশ শতকের আটের দশকের মানুষের করুণ আর্থিক মনসামঙ্গলের কালীদহের সেই হাহাকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বর্ষণমুখর এই দিনে মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের আবেগ ভেসে আসে। কিন্তু কঠিন বাস্তবের কবলে পড়ে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। বেহুলা যেমন মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে যায় তাকে জীবিত করার সংকল্প নিয়ে। বেহুলার এই করুণ পরিণতিতে কান্নায় ভেঙে পড়ে চম্পকনগর ও গাঙ্গুড়ের তীরের মানুষজন। আলোচ্য এই কবিতায় শ্রাবণের ধারার সঙ্গে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন কবি। এই যন্ত্রণাকে কবি মিলিয়েছেন মনসামঙ্গলের সেই দুঃখ-আর্থিকের সঙ্গে। এইভাবে কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ। ‘গাঙ’, ‘কালীদহ’, ‘সপ্তডিঙা-মধুকর’, ‘বিষধর ফণা’, ‘বেহুলা’, ‘সায়ের ঝিয়ারি’, ‘অনন্ত ভাসানে’, ‘নিছনি’, ‘চম্পক-নগর’, ‘লখা’, ‘মনসা’, ‘ডহর’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের ফলে মনসামঙ্গলের অনুষ্ণ ব্যবহার

করেছেন। কবিতায় মনসামঙ্গলের আবহ ব্যবহার করলেও বিশ শতকের হাহাকার, অসহায় মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই নবনির্মাণের দিক দিয়ে কবিতাটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

ক্রমানুসারে আলোচনার প্রেক্ষিতে এরপর আমরা পাই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি উত্তম দাশের ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ (২০০৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কতকগুলি কবিতা। এই কাব্যের ১, ২, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৩ সংখ্যক কবিতায় কবি উত্তম দাশ মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন। কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা কবি সম্পর্কে দু’চার কথা বলার চেষ্টা করছি। সাহিত্যিক উত্তম দাশের কবিতার বই-এর মধ্যে পাই—

১. ‘যখন গোধূলী’ (১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)
২. ‘লৌকিক অলৌকিক’ (১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ)
৩. ‘জ্বালামুখে কবিতার’ (১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ)
৪. ‘রুণুকে’ (১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ)
৫. ‘এ জন্মের প্রত্যাহার চাই’ (১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)
৬. ‘ভারতবর্ষের একজন’ (১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)
৭. ‘ভুল ভারতবর্ষ’ (১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)
৮. ‘Rhap sodies to Runu’ (১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)
৯. ‘নির্মাণে এসেছে’ (১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ)
১০. ‘রাত্রির স্থাপত্য’ (১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ)
১১. ‘ভ্রমণের দাগ’ (১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)
১২. ‘কাব্যনাট্য ও কবিতা’ (১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)
১৩. ‘এক ভারতীয় কবির ডায়েরি থেকে’ (১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)
১৪. ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ প্রভৃতি।

এছাড়া প্রবন্ধগুলির মধ্যে হল—

১. ‘বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ (১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)
২. ‘বাংলা সাহিত্যে সনেট’ (১ম খণ্ড, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং ২য় খণ্ড ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)
৩. ‘কবিতার সেতুবন্ধ’ (১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ)
৪. ‘বাংলা ছন্দের কুটস্থান’ (১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)

৫. ‘হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন’ (১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)

৬. ‘বাংলা কাব্যনাট্য’ (১ম খণ্ড, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং ২য় খণ্ড, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৭. ‘বাংলা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি’ (১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ)

৮. ‘ক্ষুধিত প্রজন্ম ও অন্যান্য প্রবন্ধ’ (১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ)

আবার ‘কবিতা : ষাটসত্তর’ (১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ), ‘গল্প : ষাটসত্তর’ (১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ), ‘আধুনিক প্রজন্মের কবিতা’ (১৯৯১), ‘আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা’ (১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ), ‘শতাব্দীর বাংলা কবিতা’ (২০০১) প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বহু সংখ্যক কবিতায় বই, প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পরে আমরা তাঁর অন্যতম কবিতার বই ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ পেয়ে থাকি। এই কাব্যের মধ্যে তিনি মধ্যযুগের সাহিত্যের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চৈতন্যজীবনী কাব্যের বিষয়বস্তুকে নিয়ে বর্তমান যুগের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। বাংলার নদী, মাঠ, ঘাট, ভাটফুল প্রভৃতি অনুষঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কবি বাঙালির ঐতিহ্যের দিকটিকেও তুলে ধরেছেন।

প্রথম কবিতাতে আমরা দেখতে পাই মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিক পুত্র লখীন্দরকে গাঙুরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিঃশ্ব হয়ে ঘরে ফিরে আসে, স্তব্ধ হয়ে পড়ে চম্পকনগর। উত্তম দাশের ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ কাব্যের প্রথম কবিতাটিতে তেমনি চাঁদের পুত্র হারানোর শোক গোটা কবিতা জুড়ে ছেয়ে রয়েছে। কবিতায় আমরা পাই—

“তখনো ভোর হয়নি,

চম্পকনগরের শোক এখন তন্দ্রার মধ্যে,

সনকাকে চাঁদ হয়তো কিছু বলতে এসেছিলেন

শোক তার মাধুর্য শেষ করেছে, ফেলে গেছে ঘুমের ক্লান্তি

চাঁদ ফিরে এলেন, কেউ নেই দেখার

তবু নিজেকে গোপন করতে করতে নদীর ঘাটে

ফাঁকা, বেহুলা তখন গাঙুড়ের জলে চিহ্ন হয়ে গেছে।”^{৩৭}

২২টি চরণের তিনটি স্তবক নিয়ে গঠিত গ্রন্থ কবিতার প্রথম স্তবকে সর্বহারার, নিঃশ্ব মানুষের কথা তুলে ধরতে কবি আশ্রয় নিয়েছেন মধ্যযুগের অন্যতম ট্রাজিক চরিত্র চাঁদ সদাগরের। বিশ শতকের শেষাংশ বা একুশ শতকের প্রথমাংশেও মানুষ অশুভ শক্তির কবলে পড়ে নিজের সুখ-শান্তি হারিয়েছে। শোকে জর্জরিত মানুষ হারিয়েছে মাধুর্য। নিজের ক্লান্তিকে দূর করে মানুষ নতুনভাবে

স্বপ্ন দেখতে চায়। মানুষ মনসারূপী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। যতক্ষণ প্রাণ রয়েছে এই অশুভ শক্তির কাছে মাথা নত করবে না সে।

পতিব্রতা নারী বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য ‘গাঙুরের জলে’ ভেসে যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে যায় চম্পকনগরের ঘাট থেকে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে দেখি বেহুলা বাংলার নদী পথে ঘুরতে ঘুরতে স্বপ্ন দেখে সে গিয়ে পৌঁচেছে ইন্দ্রের সভায়। বেহুলার গায়ে ভাঁটফুলের গন্ধ ও দুই চোখে উদাস মাঠের ছবি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সময়ের নারীলোলুপ, স্বার্থান্বেষী পুরুষ মানুষের মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে এখানে। কবিতায় তাই ইন্দ্র চরিত্রের মুখে উঠে এসেছে—

“— চম্পকনগর, মনসা, চাঁদ সদাগর, স্বামী, প্রাণ,

এসব শব্দের কোন অর্থ নেই আমার কাছে, তোমার শরীরে

সুর আছে, প্রাণ তো তুমিই জাগাবে।”^{৩৮}

একুশ শতকের প্রথমার্ধে এসেও আমাদের সমাজের নারীরা সুরক্ষিত না তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কবিতার শেষের দুই স্তবকে। আজও প্রলোভনের শিকার হতে হয় নারীকে। দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে অতীতকালের বেহুলাকে যেমন নিজের শরীরের অঞ্জলি দিতে হয়েছিল, আজকের বেহুলাকেও শরীরকে উৎসর্গ করতে হয় নিজের কাষসিদ্ধি করতে গেলে। তাই বহুদিন নাচ ছেড়ে দিলেও বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে শরীরকেই সুর করে তুলতে হয়। এই সুরের মধ্য দিয়ে পুরুষের প্রাণ জাগে। অবহেলিত, জর্জরিত নারীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কবি অবলম্বন করেছে মনসামঙ্গলের বেহুলা চরিত্রকে। কবিতার শেষের চরণগুলিতে বেহুলার এই করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

“বেহুলা কেঁপে উঠলো,

তিন হাজার বছর ঘুম হয়নি, এমন জড়ানো সুর—

লখিন্দর বললো, চোখে মুখে এত নুন ঢেলেছ কেন বেহুলা?”^{৩৯}

এইভাবে বর্তমানের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে মনসা পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন কবি। আর এখানেই মনসামঙ্গলের নবরূপায়ণ ঘটেছে কবিতায়।

কাব্যের দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতারও একই চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিতার একই চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিতার প্রথমেই মনসার মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি। বর্তমান সমাজে কিছু কিছু মানুষ যেমন মেয়ে মানুষ দেখলে প্রলোভনের রিপু জেগে ওঠে তা ফুটে উঠেছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলার লাস্যনৃত্যের চিত্রের মধ্য দিয়ে।

বর্তমানে যে স্বর্গভূমি সেখানে সবাই মেতে উঠেছে গাজনের মেলার উৎসবে। গ্রামের মেয়ে বেছলা অনেক নেচে মুখমণ্ডলে ঘাম ভর্তি করে, অনেক ‘দিয়ে থুয়ে’ জীবন হাতে বয়ে আনে। নারীর এই আচরণ সত্যিই অপমানের। মনসা চাঁদ বণিককে পূজার জন্য মিনতি করলে, সেই সঙ্গে আরো বলেন—

“তোমার ছেলের বউ বেশ সেয়ানা
নেচে কুঁদে মজিয়েছে বুড়োটাকে।”^{৪০}

চাঁদ বাম হাতে দেবীকে পূজা নিবেদন করে, যা অশুভ শক্তির কাছে মানুষের পরাজয়। অন্যদিকে বেছলা তার সাহসিকতা, সত্যতা ও একনিষ্ঠতার জোরে যে প্রাণ ফিরিয়ে আনে সেটাও যেন সত্যের জয় নয়। অমঙ্গলের এই পরিস্থিতিতে কেঁদে উঠে বাংলার নদী প্রান্তর। কবিতার শেষে দুই স্তবকে এই সত্যের পরাজয় চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

ব্রহ্ম চাঁদের মুখে মনসার যে পরিচয় পাই তার মধ্য দিয়ে অবহেলিত বঞ্চিত নারীর চিত্র উঠে এসেছে। কবিতার মধ্যে মনসা চাঁদের কথোপকথনে মনসার কথা উঠে এসেছে—

“মনসা ফস করে উঠলেন, কি চিনলি?
চাঁদ বললেন, অঃ শিবঠাকুরের সেই নষ্ট মেয়ে,
কোন দিন তোর স্বর্গে ঠাঁই হবে না
শুধু জঙ্গলে জঙ্গলে সাপখোপের মধ্যেই জীবন।”^{৪১}

দেবসভা থেকে মনসা যে বিতাড়িত, নষ্ট মেয়ে হিসেবে সাধারণের কাছে পরিচিত। জঙ্গলে জঙ্গলে সাপখোপের মধ্যে যার বসবাস তার জীবন পরিচয় বর্তমানের সাধারণ নারীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে উঠে এসেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার কথা, পৃথিবীর মমতার কথা, পাহাড়, নদী, গাছপালা, মাঠের ফসলের ঘ্রাণ, নগরের পথের ধুলোর বর্ণনা কবিতায় উঠে এসেছে। বেছলার মতো একটি মেয়ের কাছ থেকে বেদনা ও ভালোবাসার সুর শোনা যায় মর্ত্যভূমি থেকে। সনকার সঙ্গে—

“কেঁদে উঠল বাংলার নদী প্রান্তর
কাশবন খুব কেঁপে উঠল বারেবারে
বাঁশ বাগানের মাথায় যে চাঁদ উঠেছিল
টুপ করে ডুবে গেল অন্ধকারে।
দুটো কাঠবিড়ালি নামছিল শিউলির ডাল বেয়ে,

থমকে দাঁড়ালো, বললো— কি ব্যাপার—

মাঠবন নদীপ্রান্তর সবাই কাঁদছে

অথচ কারো চোখে জল নাই।”^{৪২}

চাঁদ বণিক, মনসা, বেহুলা প্রভৃতি মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গগুলি নিয়ে এসে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আধুনিক সংকটময় যুগের প্রেক্ষিতে কবি মনসা-কথার সার্থক নবরূপায়ণ ঘটেছে।

১৫ সংখ্যক কবিতায় চাঁদ স্বর্গের উদ্যানে পারিজাত গাছ থেকে ফুল তুলতে গিয়ে সর্পভূষিতা মনসাকে ল্যাংটো দেখেন। ফলস্বরূপ মনসা মর্ত্যে যাওয়ার অভিশাপ দেয় চাঁদের শরীরের ক্ষুধার জন্য। এই কবিতায় যুক্তি করে বেহুলাকে নিয়ে চম্পকনগরে সুখ-দুঃখের ঘর গড়ে তোলার মধ্যে আশাবাদের পরিচয় পাই। মানুষ সবকিছু হারিয়েও আবার নতুনভাবে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন। মনসামঙ্গল কাব্যকে আশ্রয় করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আধুনিক জীবনের কথা উঠে এসেছে। যার ফলে কবিতাটির নবনির্মাণ হয়ে উঠেছে সার্থক।

কবি ১৬ সংখ্যক কবিতার মনসামঙ্গল কাব্যের নেতাঘাটের চিত্র তুলে ধরেছেন। মৃত স্বামীকে জীবিত করার যে আশা, বেহুলা নেতা ধোপনীকে দেখে তা পরিপূরণের প্রচেষ্টা চালায়। নেতা ছেলেকে আছড়ে মেরে ফেলে সারাদিন কাপড় কেঁচে সন্ধ্যার সময় জীবিত করে ঘরে ফিরে। এই দৃশ্য দেখে বেহুলা লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য মিনতি করে। পরে নেতা ধোপানীর সঙ্গে স্বর্গে গমন করে। বেহুলা স্বর্গে ইন্দ্র এবং অন্যান্য সবার মনোরঞ্জন করে লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। কবি বেহুলা নামক মিথের আড়ালে সাধারণ মেয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছেন। বেহুলার মতো সতীত্বময়ী নারী কাঁদলে যেন তারার সপ্তমে বেহাগ বাজে, যে ভঙ্গিতে তার শরীর কাঁপে, যেন সুর জাগছে। স্বেচ্ছাচার জগতের বাইরে যে সুন্দর শুভ্র জগৎ তার কথা উঠে এসেছে কবিতায়। কবিতার চতুর্থ স্তবকে তাই দেবরাজ ইন্দের মুখে তাই শোনা যায়—

“ইন্দ্র বললেন, তুই পৃথিবীর মেয়ে

কলমিলতা আর ভাঁটফুল

এসব সৌন্দর্যের গন্ধ এখনো তো পাই না

সত্যি করে বল, পৃথিবীটা সত্যি এত সুন্দর?”^{৪৩}

এইভাবে কবি আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও মঙ্গলময়ী নারীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ঘটিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ। বেহুলা এখানে জীবন শব্দের অর্থ হাতে বয়ে নিয়ে এসেছে।

১৮ সংখ্যক কবিতাতেও বেহুলা চম্পক নগরে ফিরে আসার দৃশ্য। সমস্ত চম্পক নগরের আশা-ভরসা হল এই বেহুলা। সে মনসাপূজা করার জন্য চাঁদকে অনুরোধ করে। চাঁদ শিবমন্ত্র উচ্চারণ করলেও মনসার সম্মত হয় এই বেহুলা। তাই চম্পক নগরের প্রার্থনা নিয়ে বেহুলা যখন নদীর ঘাটে ফিয়ে আসে, মনসা বেহুলাকে আশ্রয় করেই চাঁদের কাছে পূজা আদায় করে। মনসামঙ্গল কাব্যের ঘটনার মোড়কে কবি সংকটময় সময়ের এক বিধ্বস্ত নারীর চিত্র তুলে ধরেছেন।

“এখন চাঁদ বা মনসা নয়,
বেহুলা, মুখমণ্ডলে সমীর শুধু
হলুদ রঙটাই দিয়েছেন, আর হাতে
সূর্যকে ফালা ফালা করে তার একটা খণ্ডে
প্রতীকের মতো জীবন নামক এক অসহায় ভঙ্গি।”^{৪৪}

উক্ত কবিতাটিতেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

কাব্যে ১৯ সংখ্যক কবিতায় দেখি মনসার এক অন্য মানসকিতার চিত্র পায়। চাঁদের বা হাতে ছোঁড়া ফুল মাথায় নিয়ে কেঁদে ফেললেন মনসা। ১৯টি চরণের ৬টি স্তবকের এই কবিতাটি অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবিতার প্রথমেই তাই উঠে এসেছে—

‘শুধু বেহুলা, আর বেহুলা
আমরা যেন কেউ নই, চাঁদের বাঁ হাতে ছোঁড়া ফুল
মাথায় নিয়ে টসটস করে মানুষের চোখে কাঁদলেন মনসা।’^{৪৫}

মনসা এখানে যেমন মানুষে পরিণত হয়েছেন, তেমনি সনকা, লখীন্দর, বেহুলা এমনকি শিব চরিত্রের মধ্যেও মানবায়ণ ঘটিয়েছেন। সনকা লখীন্দরের মুখে মুখ ঘসে মায়ের মতো কাঁদলেন। মনসার পূজা দিয়ে চাঁদ ধর্মত্যাগী হয়েছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করেন। চাঁদের এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন বেহুলা। লৌকিক দেবতা মনসার পূজা দেওয়াকে তিনি স্বধর্মে ফিরে আসা বলেন। মানুষের ধর্মই হল এটি। শিব পূজারী সাহসী চাঁদ তবুও ভয় পেয়ে যায় শিবের কথা স্মরণ করে। বেহুলা তার শরীর থেকে দেবত্বভাব সরিয়ে মানুষের শরীরে শিবের সামনে সটান দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন— মহাদেব রাগ করেছেন নাকি? প্রত্যুত্তরে শিবের বক্তব্য—

“দূর বেটি, শিবের খুশি খুশি মুখ, গলায় বাৎসল্য,
মেয়ের একটা গতি হলো
চাঁদকে বলিস, আমার আশীর্বাদ রইল।”^{৪৬}

গল্পের আকারে বর্তমান এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে। মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে। দাণ্ডিকতা নয়, সহজ মনে যে দেবতাকে সত্যিকারের অঞ্জলি দেওয়া হয় তা এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। দেবী মনসা ও মহাদেব এখানে একাকার হয়ে উঠেছে। চাঁদ সদাগর ও বেহুলা মনসার পূজা করলেও মহাদেব গলায় বাৎসল্যের সুর। আধুনিক সংকটময় যুগে মানবধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে। আর কবিতাটি হয়ে উঠেছে আধুনিক মঙ্গলকাব্য।

আবার কাব্যের ২০ সংখ্যক কবিতাটি আমরা একটু অন্যরকম পেয়ে থাকি। কবিতাটিতে স্বয়ং দেবী মনসা ও মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি নারায়ণ দেবের পারস্পরিক কথোপকথনে দ্বন্দ্ব মুখরিত হয়েছে। জীবনের কথা তুলে ধরতে শুধু বেহুলার কথা বলেছেন নারায়ণদেব। মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র সনকার কথা সেভাবে উঠে আসেনি। আসলে মানবজীবনের টানাপোড়েনের ক্ষেত্রে শুধু বেহুলাই উঠে এসেছে কবির লিখনে। কবিতায় তাই মনসার বক্তব্যে উঠে এসেছে—

“জীবনের কথা বলতে গেলেই শুধু বেহুলা,
বুঝি না কিছু, মঙ্গলগানের মধ্যে
বেশ খিদে মিশিয়ে দিয়েছ তোমরা,
আঠারো বছরের মেয়েটিকে দিয়ে নইলে কেউ
নাচায় ও ভাবে? তাও আবার অতগুলো দেবতার সামনে?”^{৪৭}

কবি দেবতার থেকে মানুষকে বড় দেখাতে গিয়ে প্রতিবাদী নারী হিসেবে মনসাকে তুলে ধরেছেন। নিজেকে সে নির্দোষ মনে করে দেবতাদের দোষারোপ করে। নেহাতই চাঁদের পূজা পাবার তাড়া ছিল বলে বেহুলাকে ফিরিয়ে আনেন। কবি মনসামঙ্গলের বিষয়টিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেন। কবিতাটির শেষের স্তবকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পায় আমরা। চাঁদ সদাগর নাকি কবি নারায়ণদেবকে নির্দেশ দেন নতুন মঙ্গল গান রচনা করতে। পালার নাম দিতে বলেন ‘বেহুলামঙ্গল’। মঙ্গল কাব্যের নতুনতর নির্মাণ হিসেবে কবিতাটি সত্যিই প্রশংসনীয়।

মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে রচিত ২৩ সংখ্যক কবিতার প্রথমেই দেখতে পাই লখীন্দর বেহুলার একনিষ্ঠতায়, পাতিব্রত্যতার জোরে দেবসভায় প্রাণ ফিরিয়ে পায়। গ্রামের মেয়ে বেহুলাও অতগুলো দেবতার সামনে সাতদিন একটানা নৃত্য করে নিজেও হতভম্ব। লখীন্দরের স্মৃতিতে ভেসে আসে অতীতের ঘটনা। দ্বিতীয়, তৃতীয় স্তবকে বাসরঘরে কালনাগিনীর দংশনের কথা ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে শেকড়বাকড় ও জলের ঝাপটা দিয়ে প্রাণ ফিরে পাওয়ার কথা। লখীন্দর পুনরায় বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বেহুলার বুক কেঁপে ওঠে। শেষের স্তবকটিতে

বেতলা-লখীন্দরের মিলনের রোম্যান্টিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষের যে কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়ার চিত্রটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে—

“অনেকক্ষণ দিন হয়েছে, মেঘলা আকাশ,
সাগরের জলে জুইফুলের রঙ, বেতলার
ভয়ের শরীর জাপটে ধরল লখীন্দর
গালে মুখ ঘষলো, ঠোঁটের লবণ থেকে
স্বাদ তুলে নিলে, দুই স্তনের মাঝে মুখ গুঁজে
মানুষের মতো কেঁদে ফেললো লখীন্দর।

জীবনে এই প্রথম পুরুষ মানুষ শব্দের ব্যবহার শিখল বেতলা।”^{৪৮}

২৪শে মে, ১৯৯৯ থেকে ২৯ শে সেপ্টেম্বর ২০০২, দীর্ঘ এই সময়ে লিখিত মোট ৫০টি কবিতা কবি উত্তম দাশ ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আধুনিক যুগের মানুষের বিভিন্ন পরিস্থিতি, মনস্তাত্ত্বিক দিক ও সামাজিক দিকটি তুলে ধরতে কবি আশ্রয় নিয়েছেন সুদূর মঙ্গলকাব্যের। বিশেষ করে মনসামঙ্গলকে নিয়ে রচিত যে আটটি কবিতা, বাংলার প্রকৃতির চিত্র খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। মনসা, চাঁদ সদাগর, বেতলা, লখীন্দর, সনকা চরিত্রগুলি বাংলার সাধারণ নরনারীতে পরিণত হয়েছে। এমনকি দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যেও বাৎসল্য রূপ ফুটে উঠেছে। এই কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের আধুনিক নবনির্মাণ। তাই সমালোচক সনৎকুমার নস্করের কথা যথার্থই বলা যায়—

“এই সব টুকরো লেখাগুলোতে উত্তমবাবু চমৎকার ভাবে ফেলে আসা সময়ের সঙ্গে নিকট বর্তমানকে গাঁটছাড়া বেঁধে দিয়েছেন। চাঁদ বণিকের গল্পের এক-একটা স্মরণীয় মুহূর্তকে বেছে নিয়ে আজকের সমাজ প্রেক্ষাপটে তাকে দাঁড় করিয়ে দুর্দান্ত সাহিত্য-কোলাজ সৃষ্টি করেছেন। এভাবে পুরনো চরিত্র আর ঘটনাকে নিয়ে সময়ের ছুরিতে ছেঁড়া-কাটা করা অতি সহজ ও ক্ষমতার অপেক্ষা রাখে। একই সঙ্গে, আগেকার লুপ্তপ্রায় বিষয়গুলি অধুনাতন প্রেক্ষিত পাওয়ায় সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যের শিরোনামও।”^{৪৯}

অবিভক্ত বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত কবি দীপঙ্কর মাহমুদ (১৯৫৬-) মনসামঙ্গল কাব্যের মনসা, চাঁদ সদাগর, বেতলা, লখীন্দর চরিত্রগুলি নিয়ে রচনা করেন ‘বেতলার ভেলা’ কবিতাটি। বিশ শতকের আটের দশকে রচিত ১৫টি চরণের এই কবিতায় মনসামঙ্গলের কাহিনীকে আশ্রয়

করে এক গভীর ব্যঞ্জনা উঠে এসেছে। কবিতাটি রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা’ (ফেব্রুয়ারী, ২০০৬) গ্রন্থে সংকলিত হয়।

কবিতাটির প্রথম দুই চরণে চাঁদের দৃঢ় মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কালিদহের বাঁকে তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবে গেলেও মনসার পূজা সে কিছুতেই দিবে না। পরবর্তী চরণে রয়েছে লখীন্দরকে সাপে দংশনের ঘটনা। বেহুলা-লখীন্দর যখন নিদ্রারত অবস্থায়, ফুলের বাগান থেকে সাপ এসে দংশন করে লখীন্দরকে। ফুলের শয্যায় নীল লখাইকে দংশন করে বিষাক্ত কালসাপ। অন্যদিকে যে কালনিদ্রা বেহুলাকে জড়িয়েছে, শতচুম্বনেও এই ঘুম ভাঙবে না। আসলে কবি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সামাজিক পরিস্থিতি ও নারী চেতনা তা তুলে ধরতে চেয়েছেন। তৎকালীন মূল্যবোধহীনতা ও সংশয়ের যুগের চিত্র কবি তুলে ধরেছেন—

“বেহুলার ভেলা ভাসে গাঙুড়ের জলে,
নদীতে লাশের গন্ধে শুশুকের বাড়ে আনাগোনা,
ভাসে কুমিরের লেজা বেহুলা-বেহুলা,
ভয়ানক সে কুমিরে তোমাকেও ধরে নিয়ে যাবে কোন অন্ধকারপুর!
ঘরে ফিরে চলো বধু, গাঙুড়ের জলে তুমি মুছে ফেলো সিঁথির সিঁদূর।”^{৫০}

বাস্তববাদী এই কবি সমাজের স্বার্থাশ্রয়ী, বিবেকহীন মানুষের চিত্র তুলে ধরেছেন। শুশুক ও কুমির যেন অশুভ মানুষের প্রতীক। গাঙুড়ের জলে ভেলায় বেহুলাকে ভাসতে দেখে তাই কবির ভয়, যদি কোন কুমির নিষ্পাপ এই নববধুকে কোন অন্ধকারপুরে টেনে নিয়ে যায়। সিঁথির সিঁদূর গাঙুড়ের জলে মুছে ফেলে ঘরে ফেরার কথা বলেন। আধুনিক জীবন দৃষ্টিতে কবি আসলে আজকের যুগের বেহুলাকে সতর্ক করেছেন। কারণ আজকে সেই চাঁদ সদাগর নেই, কিন্তু মনসার ফণা সর্বত্র দোলে। বেহুলার ভেলা পচে যায় কালো নোনা জলে। সমকালের যে বিপন্নতা, অন্ধকারময়তা তা কবি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন এই কবিতায়। তাই কবিতাটিতে তৎকালীন জীবনের চিত্র সাংকেতিকময় ভাবে উঠে এসেছে এবং মনসামঙ্গল কাব্য নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে সতর্কভাবে।

ক্রমানুসারে দেখতে গেলে মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিকের অনুষ্ণ ও মনসার আক্ষেপকে নিয়ে রচনা করেন এ যুগের অন্যতম জনপ্রিয় ও শক্তিশালী কবি জয় গোস্বামী (১৯৫৪-) ‘ডিঙা’ নামক কবিতাটি। কবিতাটি আলোচনা করার পূর্বে আমাদের কবি সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। কবি জয় গোস্বামীর প্রথম কবিতা হিসেবে আমরা পাই ‘সিলিং ফ্যান’ নামক কবিতাটি। তার প্রথম রচিত

কবিতাগুলি ‘সীমান্তে সাহিত্য’, ‘পদক্ষেপ’ ও ‘হোম শিখা’ নামক লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬-এ দেশ পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর থেকেই বাংলা কাব্যজগতে তার বৃহত্তর পদার্পণ শুরু হয়। কবিতার মধ্য দিয়ে অন্যান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাই গুজরাটের দাঙ্গার পরে তার প্রতিবাদ, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবি জয় গোস্বামীর কবিতায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

১. ‘ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ’ (১৯৭৭ খ্রী:)
২. ‘প্রত্ন জীব’ (১৯৭৮ খ্রী:)
৩. ‘আলেয়া হুদ’ (১৯৮১ খ্রী:)
৪. ‘উন্মাদের পাঠক্রম’ (১৯৮৬ খ্রী:)
৫. ‘ভুতুম ভগবান’ (১৯৮৮ খ্রী:)
৬. ‘ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?’ (১৯৮৯ খ্রী:)
৭. ‘আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো’ (১৯৯১ খ্রী:)
৮. ‘গোল্লা’ (১৯৯১ খ্রী:)
৯. ‘পাগলী, তোমার সঙ্গে’ (১৯৯৪ খ্রী:)
১০. ‘বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা’ (১৯৯৫ খ্রী:)
১১. ‘পাতার পোশাক’ (১৯৯৭ খ্রী:)
১২. ‘মা নিষাদ’ (১৯৯৯ খ্রী:)
১৩. ‘জগৎবাড়ি’ (২০০০ খ্রী:)
১৪. ‘মৌতা ও মহেশ্বর’ (২০০৫ খ্রী:)
১৫. ‘শাসকের প্রতি’ (২০০৭ খ্রী:)
১৬. ‘দু-দণ্ড ফোয়ারামাত্র’ (২০১১ খ্রী:)
১৭. ‘একান্নবতী’ (২০১২ খ্রী:)
১৮. ‘বিষ’ (২০১৩ খ্রী:) প্রভৃতি।

দু’টি স্তবকের চৌদ্দটি চরণের সনেট জাতীয় এই কবিতার প্রথম স্তবকে মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগরের প্রশস্তি রচিত হয়েছে। মেঘে ভরা ব্রহ্ম গাঙে চৌদো ডিঙা ডুবে গেলে চাঁদ মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। বলিষ্ঠ চিন্তাধারার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাঁদ

জানে সামনে বড়ো খাদ প্রস্তুত, তবুও মনসার ফেলে দেওয়া কাঠ সে ধরবে না। স্ত্রীর সিঁথির সিঁদূর মুছে গেলেও, হাতের শাঁখা ভেঙে গেলেও মনসার দয়া সে কিছুতেই নেবে না। তীর লাঠির দাপটে ভেঙে চুরমার করে দেবে মনসার শরীর, বিগ্রহ, এমনকি দেবীর ঘটও। বরং এই চাঁদ সদাগর জল ঠেলে, পাশ কাটাবে ডুবন্ত পাথরকে। কবির ভাষায় ফুটে উঠেছে বিষয়টি এইভাবে—

“যদি তাতে আছড়ে পড়ে ভাঙে

তার সখবার শাঁখা, তবুও চেংমুড়ী কানি, তোর

দয়া সে নেবে না; তোর শরীর, বিগ্রহ কিংবা ঘট

যা পাবে চুরমার করবে তার তীর লাঠির দাপট;

বরং সে ঠেলবে জল, পাশ কাটাবে ডুবন্ত পাথর ...”^{৫১}

বিশ শতকের শেষের সীমানায় বিধ্বস্ত সময়ে দাঁড়িয়ে কবি এমন এক চরিত্রের কল্পনা করেছেন যিনি যুগের কাণ্ডারী হয়ে উঠবেন। প্রবল শক্তির জোরে সে বিনাশ করবে অশুভ শক্তিকে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে মনসার বক্তব্য দেখা যায়। একদিন নাকি চাঁদ সদাগর ভুল করে মনসার কুঞ্জে ঢুকে পড়েছিল। তার হাতের ‘হেস্তালের লাঠি’ দেখেই পালিয়ে যায়। বিবস্ত্র হয়ে পড়ে মনসা। অসহায় এক নারীর অন্তরের দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে কবিতার এই পর্বের মধ্য দিয়ে। মনসার মুখে তাই শোনা যায় হতাশার সুর—

“এক চক্ষু কন্যা আমি, দিনে দিনে হয়েছি ডাগর।

ফিরেও দ্যাখেনি কেউ। তুমি কেন বুঝলে না তখন

সময়ে পূজা না পেলে দেহে লক্ষ ডিঙা ডুবে যায়।”^{৫২}

কবি জয় গোস্বামী আধুনিক যুগ-যন্ত্রণা তুলে ধরতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মধ্যযুগের সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যে। এই সূত্রে কবিতাটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের সার্থক নবনির্মাণ।

সকমালীন বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম একজন বিশিষ্ট কবি হলেন কৃষ্ণা বসু (১৯৪৭-)। তিনি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ বণিকের ডিঙাকে অনুসঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতা রচনা করেন ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’। কবিতাটিতে আলোচনা করার পূর্বে কবি সম্পর্কে কিছু কথা বলা যায়। আবহমানকাল ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিকতার তিনি ঘোর বিরোধী। যাপিত জীবন তাকে যেভাবে অভিঘাত করেছে, তার সবকিছু উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। আজও তিনি লিখে চলেছেন তাঁর সুদৃঢ় লেখনী দ্বারা। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আমরা

পাই—

১. ‘শব্দের শরীর’ (১৯৭৬ খ্রীঃ)
২. ‘জলের সারল্যে’ (১৯৮২ খ্রীঃ)
৩. ‘কর্ডিগানে কুসুম প্রস্তাব’ (১৯৭৬ খ্রীঃ)
৪. ‘নার্সিসাস ফুটে আছে একা’ (১৯৮৮ খ্রীঃ)
৫. ‘ও গান জাও, নাও ভাসাও’
৬. ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’
৭. ‘কবিতা সমগ্র’

‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ কবিতাটি কবি কৃষ্ণা বসু নাট্যকার শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকের অনুসরণে নামকরণ করেন। তবে তিনি পালাগানের থেকে বণিকের ডিঙাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে দেখি ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ মনসাদেবীর চক্রান্তে ডুবে যায় সমুদ্রের অথই জলে। আলোচ্য কবিতায় বণিকের ডিঙার মুখে সমস্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কবিতার প্রথমেই তাই দেখা যায়—

“আমি চাঁদ বণিকের ডিঙা,
নদীর নির্জনে ডুবে আছি বহুদিন!
সারা গায়ে শ্যাওলা ধরেছে।
চুপ করে পড়ে থাকি ঠাণ্ডা কালো জলের গভীরে।”^{৫০}

আমাদের অতীতের যে ঐতিহ্যপূর্ণ চরিত্র চাঁদ সদাগরের ডিঙা যেন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নিমজ্জিত এই ডিঙার মুখে যে আক্ষেপ, যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে তা যেন বিশ শতকের আটের দশকের অন্ধকার জগতে নিমজ্জিত সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা। এই ডিঙাতে মাছেরা ঠোঁক দেয়, ডিম পাড়ে, ছানাপোনা নিয়ে ঘর বাঁধে। গলে-পচে গেলেও তবুও দূর থেকে যখন ঢাকের গর্জন শোনে, তার শরতের ‘হিরণ রোদুরে’ ইচ্ছে হয় ভেসে উঠতে। সাদা গরিমায় পাল তুলে ভেসে যেতে চায় ব্রহ্মদেশ, জম্বুদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার বন্দরে বন্দরে স্বর্ণের ভাণ্ড, তিসি মোম, লাক্ষারস, মধু, রেশম বস্ত্রের বিভা, দারুচিনি, কর্পূরের ভাড় ও মাঝি মাঝীদের নিয়ে। কবির ইতিহাস চেতনার পরিচয় রয়েছে এই কবিতার মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগের বণিক সমাজের যে বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রা তার পরিচয় পাই এই কবিতায়। চাঁদ বণিকের জেদী কণ্ঠস্বর যেমনভাবে ভেসে চলে ডিঙার উপর দিয়ে। আজকে ডিঙাটি তেমনি ভেসে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে বিধ্বস্ত পরাজিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা

প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতাটির মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে পেছনে ফেলে সত্যের জয় ঘোষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখা হয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রাম বাংলার গান, বাংলার পূজোর ঢাকের উৎসব— সবই নির্জনে ডুবে থেকে টের পাই এই ডিঙা। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিতের কবলে পড়ে প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে। কবিতার শেষ দুটি চরণে তাই উঠে এসেছে—

“কতদিন ডুবে আছি চাঁদ বণিকের ডিঙাখানি,

হায়, উড়তে ভাসতে ভুলে গেছি!”^{৫৪}

কবি এই কবিতায় প্রতীকীভাবে বর্তমানের আশা, স্বপ্না, ভবিষ্যৎ ও সমৃদ্ধ জীবনের ঐতিহ্য ডিঙার রূপকে প্রতিফলিত হয় যায় মনসার চক্রান্তে উড়তে ভাসতে ভুলে গেছে। চারিদিকে উগ্র ভোগবাদী জীবনের বোধ, এসময় চাঁদ বণিকের ডিঙা প্রয়োজন যার মাধ্যমে বোঝাই করে আসবে সমৃদ্ধি।

মনসামঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করে ‘মনসা জীবন মানবী জীবন’ ও ‘আবহমানের মান্দাস কবিতা দুটিও রচনা করেন। ‘মনসা জীবন মানবী জীবন’ কবিতাটিতে দেবী মনসার জবানিতে নারীর অপমান, তুচ্ছতা, অসহায়তা, বিরহ, যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। নারীর এই অবহেলিত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে এইভাবে—

“দেবতার মেয়ে তবু সম্মান পাইনি,

আজীবন মার খেয়ে, মার খেয়ে খেয়ে,

অবশেষে বিষে ভরে সঞ্চয়ের থলি।

অন্ধ নই, কানা আমি, পূর্ণদৃষ্টি নেই,

পাঠশালে গুরুমশায়ের কাছে, হায়,

কখনো দেয়নি কেউ যত্নে ভর্তি করে।”^{৫৫}

বঞ্চিত হতে হতে নারীর যে হিংস্র রূপে পরিণত হতে পারে তা কবি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন এখানে। নারী দেবতা বলে শিবভক্ত চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দেয়নি, বরং লাথি মেরে মনসার ঘট ভেঙে দেয়। সনকা-বেছলা গোপনে দেবীর পূজা দিলে চাঁদ তা বিনষ্ট করে। বর্তমান যুগেও নারীকে হেলাফেলা করা হয় অনেক সময়। পুরুষ সভ্যতার প্রতি নারীর তীব্র ঘীর্ষার ও যন্ত্রণার বিষবাণ ধ্বনিত হয়েছে এই কবিতায়। কবির মুখে তাই উঠে এসেছে—

“বিষে ভরা ফণা তুলে হিস্ হিস্ দুলি।

তীব্র বিষ ছোবলের সামনে দাঁড়িয়ে

বাম হস্তে পূজা দেয়া পুরুষ সভ্যতা!”^{৫৬}

বর্তমানের লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা ও অসহায়তার যে চিত্র কবি তুলে ধরেছেন তার ফলে কবিতাটি সত্যি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ।

‘আবহমানের মান্দাস’ কবিতাটি মনসামঙ্গলের বেহুলার কলার মান্দাসে করে মৃত স্বামী লখীন্দরকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার ঘটনাকে নিয়ে রচিত। স্বামীকে নিয়ে বেহুলার যাত্রা যেন প্রতিবাদের যাত্রা। পুরুষ লখীন্দরের শব দেহ এখানে আবহমান কালের পুরুষের প্রাণহীন, হৃদয়হীন, ভালোবাসায় যেন পরিণত হয়েছে। তাতে বেহুলার প্রাণ ফেরানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এ আসলে নারীর একপ্রকার ঘৃণা ও লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ। ছয়টি স্তবকের মোট একশো সাইত্রিশটি চরণের বৃহত্তর এই কবিতায় নারীর হৃদয়-ভাবনার প্রতিকূল-পুরুষজাতির কাছে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার একপ্রকারের জীবনযুদ্ধ। এই যুদ্ধ দীর্ঘকালের। প্রাচীনকালের বেহুলা থেকে আজকের নারীও সেই পথের যাত্রী। কবিতার শেষের স্তবকে তাই কবি বর্ণনা করেছেন এভাবে—

“আকাশ, ওরে আকাশ, অসীম নীল আকাশ ওরে,
বাতাস ওরে গভীর বাতাস, অনন্ত কাল ধরে
এই কাহিনী ছড়িয়ে দিস দেশ আর দেশান্তরে
হায় রে প্রেমের জন্য কী প্রতিজ্ঞা মেয়ের অন্তরে
জন্ম নিয়ে শেষে ভেলা ভাসায় কালের পারাপারে,
ধারণ করো গহন সাগর আপন জলাধারে।”^{৫৭}

কবি কৃষ্ণা বসু শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকাতে বলেছেন যে, সুদীর্ঘ দিন ধরে আমাদের সমাজে নারীর প্রতি সব রকমের লাঞ্ছনা-অপমান, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার যত রকমের ভুল, মেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতা দমন-পীড়ন তার যে রক্ত ক্ষত দাহ টের পান, শব্দের মধ্যে দিয়ে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তার কবিতার মধ্য দিয়ে অবহেলিত নারীর আত্মকথা, নারী জাগরণের কথা উঠে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। মনসামঙ্গলের বিষয়কে নিয়ে রচিত অথচ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির এই কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি নবনির্মাণ।

উপরিউক্ত কবিতাগুলি আলোচনার পরেও আমরা মনসাপুরাণকে নিয়ে আরো কতকগুলি কবিতা পেয়ে থাকি যেগুলি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনতর হয়ে উঠেছে। সেগুলি হল—

১. কালিদাস রায়ের ‘বেহুলা’ কবিতা।

২. ভোলানাথ সাহার ‘বেহুলার ভাসান যাত্রা’ কাব্য।

৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়ের ‘মনসার সপসজ্জা’ কবিতা।

৪. সুতপা সেনগুপ্তের ‘বেহুলার, বেহুলার মাতার ও বেহুলার কন্যার বারমাস্যা’ কবিতা।

৫. শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘বেহুলার প্রতি অফিফুস’ কবিতা।

৬. অমিতাভ চৌধুরীর ‘কেন্দুলি’ কবিতা।

৭. সব্যসাচী দেবের ‘বেহুলার ভাসান’ কবিতা।

৮. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’ কাব্যের ‘বেহুলা’ কবিতা প্রভৃতি।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কবিতা ও একুশ শতকের প্রথম দশকের বাংলা কবিতা মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। আর প্রত্যেকটি রচনাই হয়ে উঠেছে এক একটি সার্থক নবনির্মাণ।

বর্তমান অধ্যায়ের কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পাই মনসামঙ্গল কাব্যের ‘চাঁদ সদাগর’ বেহুলা, লখীন্দর, সনকা প্রভৃতি চরিত্রগুলি এবং চম্পকনগর, চাঁদ বণিকের ডিঙা প্রভৃতি বিষয়গুলির কবিতায় এমনভাবে প্রয়োগ ঘটেছে যে, আমরা যেন ফিরে গেছি সেই সুদূর অতীতে। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নিয়ে এসেছেন মনসামঙ্গলের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগরকে। আবার আত্মসংকট, আদর্শহীনতা, নীতিহীনতা ও নারী অবমাননার সময়ে বেহুলা, লখীন্দর, সনকার আহ্বান যেন যুগের কাণ্ডারী করে তুলেছে চরিত্রকে। এইভাবে বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য সাধারণ। আর এখানেই হয়েছে আধুনিক কবির সার্থকতা। অত্যন্ত সুচারু দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসাকথার মিথকে আধুনিক কাব্য-কবিতায় প্রয়োগ করে ঘটিয়েছেন তার নবনির্মাণ।

তথ্যসূত্র:

১. সহায়ক পাঠ, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৮৫
২. তদেব, পৃ. ১৮৬
৩. তদেব, পৃ. ১৮৬
৪. সনৎকুমার নস্কর : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৫.০৮.২০১২, পৃ. ২০৫
৫. অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ৯০

৬. জীবননানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭১, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৫৪, ভারবি দ্বাদশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৩৯।
৭. তদেব, পৃ. ৪০।
৮. তদেব, পৃ. ৪০
৯. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, জুলাই ২০০২, পৃ. ১৬৮
১০. তদেব, পৃ. ১৬৮
১১. বিপ্লব চক্রবর্তী : লোকাভরণ, আধুনিক কবিতা শৈলী, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৬, পৃ. ১০১
১২. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১২, দ্বিতীয় সংস্করণ ভূমিকা।
১৩. তদেব, পৃ. ৩০
১৪. তদেব, পৃ. ৩১
১৫. তদেব, পৃ. ৩১
১৬. তদেব, পৃ. ৩১
১৭. বীরেন্দ্র সমগ্র ১ম খণ্ড, সব্যসাচী দেব সম্পাদিত, অনুষ্টিপ, ২ই নবীনকুণ্ড লেন, পরিবর্ধিত সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃ. ১৪৮
১৮. তদেব, পৃ. ১৪৮
১৯. বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সপ্তম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ, ১৪১৩, ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১৩৬
২০. তদেব, পৃ. ১৩৭
২১. তদেব, পৃ. ১৩৭
২২. জিয়া হায়দার : শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট ব্রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭, পৃ. ৩৫
২৩. তদেব, পৃ. ৩৫
২৪. তদেব, পৃ. ৩৯
২৫. তদেব, পৃ. ৪১

২৬. তদেব, পৃ. ৪৪
২৭. সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম
প্রকাশ-আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ১৭৬
২৮. তদেব, পৃ. ১৭৬-১৭৭
২৯. অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: নববর্ষ ১৪০৬,
এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ২০৬
৩০. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য: 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, ৫০ সীতারাম
ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ১৭৩
৩১. শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্দশ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১,
পৃ. ১২৬
৩২. তদেব, পৃ. ১২৫-১২৬
৩৩. তদেব, পৃ. ১২৬
৩৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার কালান্তর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৪০৭ আশ্বিন, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ২৪২-২৪৩
৩৫. শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রমা প্রকাশনা, ৫ ওয়েস্ট ব্রেক্স, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ,
পৃ. ৪৪।
৩৬. তদেব, পৃ. ৪৫
৩৭. উত্তম দাশ, 'একালের মঙ্গল কাব্য', মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা-১৪৪, প্রথম
প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ৯
৩৮. তদেব, পৃ. ৯
৩৯. তদেব, পৃ. ৯
৪০. তদেব, পৃ. ১০
৪১. তদেব, পৃ. ২৭
৪২. তদেব, পৃ. ২০-২১
৪৩. তদেব, পৃ. ২৯
৪৪. তদেব, পৃ. ৩১
৪৫. তদেব, পৃ. ৩১

৪৬. তদেব, পৃ. ৩২

৪৭. তদেব, পৃ. ৩৩

৪৮. তদেব, পৃ. ৩৭

৪৯. সনৎকুমার নস্কর : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রস্ত ও পুনর্বিবেচনা, দিশা পাবলিকেশন,
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২০১২, পৃ. ২১৩

৫০. রফিকউল্লাহ খান (সম্পাদনা) : বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা, একুশে পাবলিকেশন,
প্রকাশ-২০০৫, পৃ. ২১৬

৫১. জয় গোস্বামী : শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রতিভাস, ১৮ এ গোবিন্দ মঙ্গল রোড, কলকাতা, পঞ্চম পরিবর্ধিত
সংস্করণ-২০১৪, পৃ. ২৩১

৫২. তদেব, পৃ. ২৩১

৫৩. কৃষ্ণা বসু : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারী ২০০৩, পৃ. ৩৩-৩৪

৫৪. তদেব, পৃ. ৩৪

৫৫. তদেব, পৃ. ১২১

৫৬. তদেব, পৃ. ১২২

৫৭. তদেব, পৃ. ১২২

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসা-কথার নবনির্মাণ

বাংলা সাহিত্যের আউনায় উপন্যাস আধুনিকতম সাহিত্য সংরূপ। তবে চর্যাপদ থেকে শুরু করে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ যে পথ পরিক্রমণ, তার মধ্যেও যে উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে ছিল না একথা জোর গলায় বলা যেতে পারে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে—

“এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।।”^১

মুকুন্দরাম শুধু সময়ের প্রভাব অতিক্রম করতে, অতীত সাহিত্য রচনার প্রথা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং আলৌকিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি বলে খাঁটি ঔপন্যাসিক হতে পারেননি। তারপর বাংলা ভাষায় এই আধুনিক সাহিত্য সংরূপ উপন্যাসের পুরোপুরি যাত্রা আরম্ভ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই সার্থক বাংলা উপন্যাসের সূচনা। প্রাক্ স্বাধীনতা মুহূর্তের রাজনৈতিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিভেদ, দাঙ্গা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ইত্যাদি রক্তক্ষয়ী ইতিহাস উপন্যাসের মধ্যে উঠে আসে। তবে কিছু ঔপন্যাসিক উদার মানবিক বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ভুলে মানুষের মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ধারার পাশে আরও একটি ধারা বাংলা উপন্যাসে সচল ছিল তা হল— মনন-চিন্তা প্রধান বিতর্কমূলক ভাবনাকেন্দ্রিক উপন্যাসের। এ জাতীয় উপন্যাসের লেখকরা মানুষের মনের ভিতরের আত্মসমীক্ষা কিংবা ইতিহাস বা মিথ থেকে কোনো একটি তত্ত্ব বিষয়কে তুলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার পুনর্মূল্যায়ণে নতুন মাত্রা দান করেন। উপন্যাসে উঠে এসেছে মানুষের মনের অন্তঃকোণে পাপবোধ, স্বীকারোক্তি, ডিটেকশন, কনফেশন প্রভৃতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মনঃসমীক্ষামূলক ঘটনার বিকৃতি। সেই সঙ্গে সমাজ বা কালের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের রূপায়ণের দিকটিও গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনোত্তর বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে শুধু চরিত্রই প্রাধান্য পেতে থাকে না, চরিত্রের অন্তর্ধান রহস্য বা মানুষের মনের বাস্তবতা, জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। পরপর দুটি মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা, দেশভাগ, তজ্জনিত নানা ঘটনার উত্তাল তরঙ্গ সমাজের চেহারাটাকেই বদলে দিল এমন আমল যে,

সেই পরিবর্তিত দিনের কথা ও রূপ ধরে রাখার জন্য কথা সাহিত্যের ভাষায় তৈরি হল নতুন ডিসকোর্স। জন্ম নিল নতুন প্রজন্মের লেখক। যাঁদের লেখায় আধুনিক জটিল সমাজের বহুরূপ ও বহু অনুভব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উঠে এসেছে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের দুর্বোধ্য জটিল মন ও মানুষের জীবনযন্ত্রণার রূপ। এই উপন্যাসগুলিতে মানুষের সংকট অন্ততপক্ষে দুটি স্তরে চিহ্নিত— একটি সমাজ পরিস্থিতি জনিত অসঙ্গতি, অন্যটি হল আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা। পুরাতন ঐতিহ্যের দিকে হাত বাড়িয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে ব্যক্তিমনের প্রতিটি স্তরের, প্রতিটি বিভঙ্গের সচেতন বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা উপন্যাস নিয়ে আসে এক ভিন্নশ্রোতের ঢেউ। বিশ শতকের শেষার্ধ্বে থেকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরার জন্য এই উপন্যাসিকগণ হাত বাড়িয়েছেন বাঙালির ঐতিহ্যের দিকে। মিথ তথা পুরাণ কাহিনীকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে দাঁড় করিয়েছেন। এই সময় আমরা চর্যাপদকে কেন্দ্র করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’ (১৯১৯), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চর্যাপদের হরিণী’ (১৯৫৯), সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (১৯৮৫), শিবশিস মুখোপাধ্যায়ের ‘কাহ্ন’ (২০১০) উপন্যাস; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাধাকৃষ্ণ’ (১৯৭৬), দীপক চন্দ্রের ‘মন বৃন্দাবন’ (১৯৩৩), ও ‘যদি রাধা না হত’ (১৯৯৫) উপন্যাসে রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অমাবস্যার গান’ (১৯৭১), সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ (১৯৮৮), অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩), অভিজিৎ সেনের ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’ (১৯৯৫), সত্যপ্রিয় ঘোষের ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ (১৯৯৯), শচীন দাসের ‘নদীতরঙ্গের আয়না’ (২০০৯), মহাশ্বেতা দেবীর ‘ব্যাখণ্ড’ (১৯৬৪), ‘কবি বন্দ্যঘাটা গাওঁর জীবন ও মৃত্যু’ (১৯৬৭), ‘বেনেবউ’ (১৯৯৪), রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধনপতির সিংহল যাত্রা’ (২০০৭) প্রভৃতি উপন্যাস। বর্তমান অধ্যায়ে আমি মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাকথার মিথকে নিয়ে লেখা যে চারটি উপন্যাস নিয়েছি। সেগুলি হল—

১. চাঁদবেনে (১৯৮৪) — সেলিনা হোসেন
২. চাঁদবেনে (১৯৯৩) — অমিয়ভূষণ মজুমদার
৩. বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর (১৯৯৫) — অভিজিৎ সেন
৪. স্বপ্নের ফেরিওয়ালা (১৯৯৯) — সত্যপ্রিয় ঘোষ

লেখকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে এক একটি উপন্যাসে কীভাবে আধুনিক মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠে এসেছে, তা নিম্নে আলোচনা করব।

মনসামঙ্গলের বিষয় নিয়ে অর্থাৎ দেবী মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনায় কলম ধরেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য লেখিকা সেলিনা হোসেন। ১৯৮৪ সালে তাঁর ‘চাঁদ বেনে’ উপন্যাসটি প্রকাশ পায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা সেলিনা হোসেনের (জন্ম ১৯৪৭-এর ১৪ই জুন, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী শহর। তাঁর লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি, ও ঐতিহ্য। বাংলার লোকপুরাণের উজ্জ্বল চরিত্রগুলি নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সংকট। সেই সঙ্গে ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ তাঁর রচনাকে নতুন মাত্রা দান করেছে। রাজনৈতিক বাতাবরণকে তাঁর রচনার অন্যতম দিক বলে মনে করেন। তাই এক সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেছেন— "I love that my story may turn into a political idea."^২ তাঁর লেখা ৩২টির বেশি উপন্যাস আমরা পেয়ে থাকি এবং এখনও লিখে চলেছেন তাঁর সূচাঙ্ক লেখনী দ্বারা। উপন্যাস রচনা ছাড়া ৪টি ছোটগল্প সংকলন, বেশ কয়েকটি শিশু সাহিত্য ও প্রবন্ধাবলী রচনা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, ফ্রেঞ্চ, রুশিয়ান, ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় অনূদিত হয় তাঁর উপন্যাস। কর্মসূত্রে শিক্ষিকা এই লেখিকা বর্তমানে National Human Right Commission of Bangladesh-এর মেম্বর এবং Executive Board of UNESCO-এর representative হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিম্নে তাঁর রচনাগুলি ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি—

১. ‘জ্যোৎস্নায় সূর্য জ্বালা’ (১৯৭৩ খ্রী.)
২. ‘জলোচ্ছ্বাস’ (১৯৭২ খ্রী.)
৩. ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ (১৯৭৫ খ্রী.)
৪. ‘মগ্ন চৈতন্যে শিস’ (১৯৭৯ খ্রী.)
৫. ‘যাপিত জীবন’ (১৯৮১ খ্রী.)
৬. ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (১৯৮২ খ্রী.)
৭. ‘পদশব্দ’ (১৯৮২ খ্রী.)
৮. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৮৪ খ্রী.)
৯. ‘পোকা-মাকড়ের ঘরবসতি’ (১৯৮৬ খ্রী.)
১০. ‘নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি’ (১৯৮৭ খ্রী.)
১১. ‘ক্ষরণ’ (১৯৮৮ খ্রী.)
১২. ‘কাটাতারের প্রজাপতি’ (১৯৮৯ খ্রী.)

১৩. ‘খুন ও ভালোবাসা’ (১৯৯০ খ্রী.)
১৪. ‘কালকেতু ও ফুল্লরা’ (১৯৯২ খ্রী.)
১৫. ‘ভালোবাসা প্রীতিলতা’ (১৯৯২ খ্রী.)
১৬. ‘টানাপোড়েন’ (১৯৯৪ খ্রী.)
১৭. ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’ (১ম ১৯৯৪, ২য় ১৯৯৫ খ্রী.)
১৮. ‘দ্বীপাশ্রিতা’ (১৯৯৭ খ্রী.)
১৯. ‘যুদ্ধ’ (১৯৯৮ খ্রী.)
২০. ‘লারা’ (২০০০ খ্রী.)
২১. ‘মোহিনীর বিয়ে’ (২০০০ খ্রী.)
২২. ‘আনবিক আঁধারে’ (২০০৩ খ্রী.)
২৩. ‘ঘুম কাতুরে ঈশ্বর’ (২০০৪ খ্রী.)
২৪. ‘মর্গের নীল পাখি’ (২০০৫ খ্রী.)
২৫. ‘অপেক্ষা’ (২০০৭ খ্রী.)
২৬. ‘দিনের রসিতে গিটচু’ (২০০৭ খ্রী.)
২৭. ‘মাটি ও শস্যের বনন’ (২০০৭ খ্রী.)
২৮. ‘ছবির মগ্নতা’ (২০০৮ খ্রী.)
২৯. ‘ভূমি ও কুসুম’ (২০১০ খ্রী.)
৩০. ‘যমুনা নদীর মুশায়েরা’ (২০১১ খ্রী.)
৩১. ‘গাক্তির ছায়া নেই’ (২০১২ খ্রী.)
৩২. ‘সোনালী ডুমুর’ (২০১১ খ্রী.)
৩৩. ‘আগস্টের একরাত’ (২০১৩ খ্রী.)

এছাড়া ‘সাগর’ (১৯৯১), ‘কাকতাদুয়া’ (১৯৯৬), ‘আকাশপরী’ (২০০১), ‘চাঁদের বাড়ির পান্তা ইলিশ’ (২০০৮) প্রভৃতি শিশু সাহিত্য, ‘উৎস থেকে চিরন্তন’ (১৯৬৯), ‘মানুষটি’ (১৯৯৩), ‘মতিজানের মেয়েরা’ (১৯৯৬), ‘অবেলার দিনক্ষণ’ (২০০৭) প্রভৃতি গল্প সংকলন এবং ‘স্বদেশে পরবাসী’ (১৯৯৬), ‘একাত্তরের ঢাকা’ (১৯৮৯), ‘মুক্ত করো ভয়’ (২০০০), ‘নিজেরা করো জয়’ (২০০৮), ‘ঘর গেরস্থির রাজনীতি’ (২০০৮) প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী পেয়ে থাকি আমরা।

সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। গ্রন্থটির দ্বিতীয়

মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে। দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এক নিটোল কাহিনী রয়েছে এই উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, নতুন রাষ্ট্র গঠন প্রভৃতি ঘটনার পরেও বাংলাদেশে জমিদারতন্ত্রের অবসান ঘটেনি। একদল সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি, স্বার্থবাদী, হিংস্র লোভী মানুষ নিজেদের স্বার্থ ও সুখ চরিতার্থ করতে কৃষক ক্ষেতমজুর বা দরিদ্র চাষিদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বহারার দলে পরিণত করে। একদিকে জোতদারী শোষণ ও অত্যাচার, অপরদিকে আকস্মিকভাবে নেমে আসা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দরিদ্র মানুষকে আরো দরিদ্রতর করে তুলেছিল। জমি-জমা, ভিটে-মাটি, ঘটিবাটি, হালের বদল সবকিছু বন্ধক দিয়ে বা বিক্রি করে তারা হয়ে উঠেছে সর্বহারার দল। গ্রামের জোতদার, জমিদারের মতো সুবিধাভোগী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সাধারণ কৃষক বা খেতমজুরদের সর্বস্ব লুণ্ঠ করে নেওয়ার খেলায় মেতেছিল। চরম নিষ্ঠুর তথা ভয়ঙ্কর হিংস্র অত্যাচারী এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সাহস দেখাতে কেউ পারত না। নিজের বেঁচে থাকার তাগিদে অন্যায়কে আপোষ করে নিত। নির্বিবাদে সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া কারো উপায় ছিল না। এই চরম বৈষম্যতার ফলে মানুষের বিপন্নতা ও হতাশার মাঝখানে এক প্রতিবাদী চরিত্রের জীবনকে তুলে ধরার জন্য সেলিনা হোসেন রচনা করেন ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসটি।

উপন্যাসে চাঁদ চরিত্রকে আমরা পাই অধুনা বাংলাদেশের পদ্মার তীরবর্তী চম্পাইগঞ্জের বাসিন্দা রূপে। খরাতাড়িত রুম্ম আবহাওয়া ও শোষণ সম্প্রদায়ের শোষণ ও অত্যাচারের প্রেক্ষাপট দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখি চাঁদ জমিতে নিড়ানির কাজে কর্মরত। দুপুরবেলায় প্রচণ্ড রৌদ্র-ঘাস-লতা, গাছের পাতা আর মাটির নরম বুক সবই পুড়িয়ে দেয়। ফসল বাঁচানো সম্ভব নয় এই প্রচণ্ড খরায়। জমিতে কাজ করতে বুড়ো হানিফকেও দেখা যায়। বারো জনের সংসার তার। চম্পাইগঞ্জের আরো অনেক ব্যক্তিরই এরকম পারিবারিক বোঝায় ঘাড় বাঁকা। শুধু চাঁদের বউ ছাড়া আর কেউ নেই। চাঁদ বুড়ো হানিফের কাঁধে হাত রাখে, সান্ত্বনা দেয়। সবাই জানে দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাবে না এবার, আসন্ন বিপদের দিকে তাকিয়ে তারা আতঙ্কিত। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, পদ্মার বুক থেকে ঘূর্ণির পাকে ধূ ধূ বালি উড়ে আসে। চাঁদের চোখ-মুখ গোটা শরীর বালিতে কিচ কিচ করে। এই ঘূর্ণি সব সময় তাকেই আঘাত করে। যেন তার উপর প্রবল আক্রোশ নিয়েই ছুটে আসে। চাঁদের বুক জ্বলে যায়। তার সামনে চড়চড় করে মাটি ফাটলে ভয়ে, আতঙ্কে এবং সর্বস্ব হারানোর বেদনায় থমকে যায় তার দৃষ্টি। বুক চাপড়ে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে ও। আজু মৃধার মাটি হলেও মাটি ফাটা সহ্য করতে পারেনি সে। মনে হয়েছিল শরীরের রগে রগে

যেন চাবুক মারল, কলজেয় যেন লাঙল চষে গেল। মাটি ফাটা দেখে মনে হয়েছে মূলে ভাঙন ধরেছে, নাড়ি যেন উপড়ে আসছে। এই আঠাশ বছর বয়সের জীবনে সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে যায়। মাথা ঝিম ঝিম করে, শরীরের ভেতরে যেন দ্রুম দ্রুম করে ওঠে। মহাজন আজু মৃধার অত্যাচারের চাইতেও ভয়ঙ্কর এই মাটি ফাটার দৃশ্য। এই খরা যেন তার মারমুখো প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আগাছা না থাকলেও শক্ত মাটিতে গাছের গোড়া কোপানো যায় না। চম্পাইগঞ্জের মানুষের মাটিই প্রাণ। দরিদ্র সর্বহারা মানুষেরা ফসল উৎপন্ন করেই জীবনযাপন করে। আর ফসল ফলানোতেই চাঁদের জীবনের একমাত্র আনন্দ। মাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। এই টান প্রবল হলে তার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। পাগল বৌ-এর পাগলামি সহ্য হয়, গ্রামের লোকেদের ঝগড়া-ঝাটির কথা মনে থাকে না, আজু মৃধার দুর্ব্যবহারও অনায়াসে ঝেড়ে ফেলতে পারেন— কিন্তু ফসলের ভাগাভাগি তার সহ্য হয় না। পরিশ্রমের ফসল আজু মৃধার উঠোনে ঢেলে রেখে কষ্ট বুকে চেপে বাড়ি ফিরে আসে। পদ্মার বুকেও বন্ধ্যা নেমে আসে। ছোটবেলায় উথলা পদ্মায় এখন ধু ধু বালু। স্ত্রী ছমিরণও পদ্মার মতো যৌবনে পরিপূর্ণ ছিল। চৌদ্দ বছরের বিবাহিত ছমিরণও ছিল শীতল নদীর মতো। ছ'মাস ন'মাসের একে একে সাতটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে শেষে পাগল হয়ে যায়। পাগল ছমিরণ পদ্মার মতোই শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। খরা যেন চাঁদের জীবনেও নেমেছে। আজু মৃধার জমিতে ফসল নষ্ট হওয়ায় সে সমস্ত চাষীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে। মাটি বিরূপ যতোই হোক, বৃষ্টি নাই বা হোল, কিন্তু আজু মৃধার জমিতে ফসল ফলানোই চাই, গোলা ভরা চাই তার। এইভাবে গৃহে এবং বাইরে ব্যর্থ হয়ে পড়ে চাঁদ। ফসলহীনা মাটি, ফসলহীন দিন, ফসলহীন চাঁদ। সে প্রতিবাদ করতে চায়। তবে মেঘহীন, জলহীন দিনগুলোর নির্মম পেষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে মুখ খুবড়ে পড়তে হয় তাকে। একা সে কতজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। পদ্মা তার শত্রু, মাটি তার শত্রু, আজু মৃধাও সাক্ষাৎ যম। একা দু'হাতে হেতালের লাঠি নিয়ে কতজনের সঙ্গে লড়বে চাঁদ। স্ত্রী ছমিরণের চিকিৎসার জন্য শহরে যেতে চায় সে। তাজা ফটফটে ছেলের মা হবে ছমিরণ। কোল জুড়ে আলো করবে চাঁদমুখ। তার চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে। ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া বিশাল প্রান্তরে দিগন্তবিহারী শ্যামলতার থৈ থৈ চাঁদের রক্ষ্মতা গলিয়ে দেয়। কিন্তু তার মত দরিদ্র লোকের শহরে যাওয়া, দুর্বিনীত পদ্মার নিরুপায় দূরে সরে যাওয়ার মতো। ইচ্ছে করলেই ফুলে ফেঁপে গর্জে উঠতে পারে না। ফারাক্কা বাঁধ, পদ্মা নদী, আজু মৃধা, চাঁদ সবাই যেন একই সুতোর বাঁধনে জড়িয়ে রয়েছে। পরিস্থিতির করুণ চিত্র উঠে এসেছে জীবন্তভাবে—

“ও শুনেছে ফারাক্কা বাঁধের কথা। সেই বাঁধের দরুণ ওর শৈশব কৈশোরের কীর্তিনাশা

পদ্মার পায়ে শিকল। বর্ষার ঢলও সে শেকল ভাঙতে পারে না। সেজন্যে এখন
চাঁদের পায়েও বেড়ি। ... ফারাক্কার মতো আজু মৃধা। ওদের জওয়ানকীর পদ্মায়
বাঁধ দিয়ে রেখেছে। সারাদিনের পরিশ্রমেও পানির গভীরতা বাড়ে না, অনবরত
চড়া পড়ে, বালু বাড়ে।”

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে চাঁদের। বাবার সঙ্গে রাত্রিবেলা মনসার পালা শুনে ফেরৎ আসার
সময় ফণিমনসার গাছ দেখে তার সাপ মনে হয়েছে। ছোটবেলার পালাগান দেখে মনসাই প্রধান
হয়ে উঠত তার কাছে। এখন যৌবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চাঁদ বণিকের বলিষ্ঠতা, সততা তাকে
মোহিত করে তোলে। তাই বণিকের সপ্তডিঙা ডুবে গেলে তার লোম খাড়া হয়ে যায়। মনসাপালায়
চাঁদকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে। অভাব পিতাকে কোনদিন টলাতে পারেনি। ডাকু বুক
কোনো ভয়-ডর ছিল না। অবলীলাক্রমে নৌকা ভাসিয়ে দিত নদীতে। হেরে যাওয়া কাকে বলে
জানতো না। চাঁদের মনে হয় বাবার সামনে পদ্মা নামের একটা দিগন্তস্পর্শী কালীদহ ছিল বলেই
অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তার কোনো কমতি ছিল না। তাই সবসময় এগিয়ে যাওয়ার পথে বিশ্বাসী
ছিলেন। কিন্তু সামনে শুধু মজে যাওয়া পদ্মা ও প্রতিপক্ষ খরা। আদর্শ মেনে নেওয়ার মতো কোনো
কিছু সামনে দেখতে পায় না সে। সাহস বাড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো কিছু অবলম্বন খুঁজে পায়
না। সে জানে শূন্যতায় স্বপ্ন থাকতে নেই, তার জন্যে চাই পলিমাটির উর্বরা সমতল। আর জীবনের
সব শূন্যতার মধ্যে একমাত্র সম্বল জমি। সেই জমিই এখন ফেটে চৌচির। চাঁদের মতে বাবা মানুষের
মতো মানুষ ছিলেন— যেমন গোয়ার, তেমনি জেদী। গ্রামের লোকে মানত, ভয় পেত, লোকে
পিছন দিক থেকে শত্রুতা করত। নৌকা বাইতে যাওয়ার সময় তার নৌকা সবার আগে ছুঁত।
পদ্মার সর্বনাশা স্রোতে নদীর পাড় ভেঙে গেলে হা হা করে হেসে ওঠে। পদ্মা সমস্ত জমি গ্রাস করে
নিলেও সে মাথা চাপড়ায় নি। কত খেতে পারবি খা বলে নদীকে গালিগালাজ করে। বাবার মতো
শরীরের শক্তিকেই নিজের অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে চাঁদ। মানুষ সমস্ত কিছু নিলেও, নিতে পারে না
শুধু এই গায়ের বল। বাবার মতোও তার একমাত্র সম্বল শক্তি ও পরিশ্রম। তাছাড়া আর কোন মূল্য
নেই তার। এই জন্যই আজু মৃধা তাকে পান্তা দেয়, আজু মৃধার তাকে প্রয়োজন। এই নিয়েই তার
বেঁচে থাকা। এই নিয়েই তার যুদ্ধ। খরা তার পেছনে ছুটে আসে, নদী মুখ ফিরিয়ে নেয়। মাটি
ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে যায়, তবুও সে লড়ে যায় বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে। চাঁদ নিঃস্বের বেদনা অনুভব
করে ছমিরণকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। যৌবনে যে ছমিরণ কালীদহ ছিল, যেখানে নির্বিবাদে
সপ্তডিঙা ভাসিয়ে দিত চাঁদ। কেমন করে মনসার অভিশাপ এসে সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দেয়। চাঁদ এই

ছমিরণের শুষ্ক শরীরে শীতলতা প্রবাহিত করে, শরীরের বাঁধ দূরে সরিয়ে স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিশীতে পরিণত করে। এইভাবে আশার মধ্য দিয়ে প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটান লেখিকা। ছমিরণের ত্রুর হাসিকে থামিয়ে চাঁদ তাকে শান্ত ও শীতল করে তোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে চাঁদের একক লড়াই-এর সংকল্প নিয়ে। কারণ চম্পাইগঞ্জের মানুষের শিরা-উপশিরায় বিষ। সেই বিষে নিজীব হয়ে গেছে শরীরের টগবগে রক্ত। শুধু চাঁদ একা আজু মৃধার সঙ্গে লড়াই করে যায়। অন্যায় হলে ছেড়ে কথা বলে না। সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে আজু মৃধার চর্বিমাখা গলা। মুখে কিছু না বলে আজু মৃধা গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে থাকে। এতে চাঁদ ভীষণ আনন্দ পায়। বাতাসে উড়িয়ে দেয় লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদের বীজ। চম্পাইগঞ্জের মাটিতে এই বীজ থেকে হবে কালচে সবুজ চারা। কারণ একা আজু মৃধা বেশিদিন অত্যাচার চালাতে পারবে না। তাই বিপদ মুক্ত চম্পাইগঞ্জ এবং গ্রামে সৎ ব্যক্তি আগমনের স্বপ্ন দেখে সে। চাঁদ নিজের ব্যক্তিত্বে অটল থাকে। পিতা প্রসঙ্গে আবার চাঁদ বলে— বাবা মহাজনের নৌকায় পণ্য নিয়ে পদ্মার বুকে অনায়াসেই পাড়ি দিত। মায়ের দুঃখকে পান্ডা না দিয়ে পদ্মায় ঘোরার নেশায় মহাজনের নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। ফিরে আসত শূন্য হাতে। আসলে বাবা অভাবকে কোন আমল দিত না। পুত্রের মধ্য দিয়ে সে ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়, জয় করতে চায়। আজু মৃধা বিলের জমি দখল করলেও, পরিশ্রমের পয়সা না দিলেও মহাজনের বিরুদ্ধে বাবার কোনো নালিশ ছিল না। বিরাট আকৃতির শরীর থাকা সত্ত্বেও রুখে দাঁড়াবার কথা ভাবত না। মহাজনের সঙ্গে ছিল তার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। সামনে অটল সবুজের ফলে পিতার মনে দরদ ছিল। কিন্তু এখন আর সবুজ নেই, ফসল নেই, পদ্মায় জল নেই। তাই মহাজনের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। মাথার মধ্যে কাজ করে শুধু ধুলোয় লুটিয়ে দেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সে আজু মৃধাকে ঘৃণা করে, মুখে থু থু ছিটোতে চায়, পায়ে দলিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। চাঁদ আরো বলেন—

“সুযোগ পেলে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে সেটা পদ্মার বালুতে পুঁতে রাখবো। আমার নিজের জমি নেই। তবু আমি মাটি ভালোবাসি। হোক না তা অন্যের।”^৪

মানুষের মন থেকে এখন উৎসবের জোয়ার-ভাটিতে নেমে গেছে। এই ভাটি চিরকালের। সেখানে আসা যাওয়ার খেলা নেই। শৈশবে মনসার পালা শুনে ফণিমনসার যে ঝোপগুলি দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরতেন সেগুলি আর নেই। এখনকার গাছ, লতাগুল্ম কোন কিছুতেই চোখ জুড়োয় না, মন ভরে না, পেটও ভরে না। পথঘাট শুধু শুকনো ধুলোয় পরিপূর্ণ। তবুও চাঁদ চোখ বুজলে মনসার

পালা দেখে। চাঁদ বণিকের গল্প শুনতে শুনতে রাত ফুরোয়। আকাশের তারা মিলিয়ে গিয়ে দিনের আলো ঘনিয়ে আসে। মগজে তার ঘূর্ণি ওঠে। চাঁদবেনে হয়ে সে পথে নামে, চাঁদবেনে হয়ে ঘরে ঘরে ফেরে, দিনযাপন করে।

পদ্মার যৌবনও ছমিরণের মতো ফুরিয়ে গেছে। রক্ষ নিদারণ দিনগুলো ছমিরণের মতো রাগী, বদমেজাজী, অসহিষ্ণু। মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। শহরে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করার কথা ভাবে। অথচ আজু মৃধার মতো ব্যক্তির গোলা পূর্ণ হয় ধানে। চাঁদ তাই সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকার আশ্বাস দেয়, যেভাবেই হোক ভাত-খাবার কথা বলে। জমির, কাশেম, হাসু, ফালু, হাফিজ মিঞাদের নিয়ে আজু মৃধার গোলার ধান লুঠ করবে বলে স্থির করে।

বিরূপ প্রকৃতির দরুণ বাতাসে ভ্যাপসা গরম, চামড়া পুড়িয়ে কালো করে তোলে। একসময় চম্পাইগঞ্জের পাশ দিয়ে সপ্তডিঙা মধুকর ভেসে যেতো। এখানে বেতলারা কলসি কাঁখে জল আনতে গিয়ে নদীতে নেমে জল ছিটোতে ছিটোতে চোখ লাল করে ফেলত। সেই স্থানে এখন শুধু অভাব। পদ্মার জল শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জমি, ফসল সবই শুকিয়ে গেছে। ঐ আজু মৃধার যতকাল আছে, আকাল দরিদ্র কৃষক মজুরদের থেকে ততদিন দূর হবে না। এই নিঃস্ব, সর্বহারা মানুষদের কেউ নেই। ঘরের বউও বেতলা নাচনি হতে পারে না। যতক্ষণ নিজের শক্তি আছে, নিজের পায়ের তলার মাটি আছে এবং বুকে সাহস আছে ততদিন তারা বাঁচবে। না হলে নেতা ধোপানীর কাপড়ের ময়লার মতো ধুয়ে মুছে যাবে। গ্রাম আর সাধারণ মানুষের থাকে না। চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি এখন অন্যের দখলে। নিজের কোন কিছুই থাকে না। তাই পেটের দায়ে হাফিজ মিঞার মতো বৃদ্ধ মানুষ ভাত খাওয়ার থালা দুটি বিক্রি করে ফেলে। চাঁদের তাই মনে হয় আজু মৃধার গোলাতে যতোই লোহার দেওয়াল থাক না কেন, একটা না একটা ছিদ্র তো রয়েছে। যেখানে তারা অনায়াসে ঢুকতে পারবে। ধান চুরি করে এনে এভাবেই তাদের বেঁচে থাকতে হবে। কারণ চম্পাইগঞ্জের শরীরের ফুটো দিয়ে অভাবের সাপটা যে ঢুকেছিল সেটা এখন কিছুতেই বেরোচ্ছে না। সেটা এখন পাগলের মতো কামড়াচ্ছে তাদের। হাফিজ মিঞা, জমির, কাশেম, শহরে যায় লাইনে দাঁড়িয়ে আটা আনতে। উপন্যাসে অভাবের চিত্র করণভাবে ফুটে ওঠে হাফিজ মিঞার বাড়ির বর্ণনায়। হাফিজ মিঞার মেয়ে স কিনা তার ভাই-বোনদের মাসকলাইয়ের রুটি, ছোলাভাজা খাইয়ে ঘুম পাড়ায়। একবেলাও ভরপেট না খেতে পেয়ে হাফিজ মিঞা ভিটা বিক্রি করে শহরে চলে যেতে চায়। এমনকি আজু মৃধার গোলায় ধান লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ভাত খাবার কথা ভেবে খুশি হয় তারা। কিন্তু চাঁদ আপোষ করতে নারাজ। ছমিরণ ও সে মিলে

লখীন্দরের মতো সন্তান নিয়ে আসবে ভবিষ্যতের জন্য। আজু মৃধার গোলা লুঠ করে এবং ছমিরণের পেটে একটা তাজা ফটফটে ছেলের বীজ রোপন করে নিজেকে এক সার্থক পুরুষে পরিণত করতে চায়।

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি অভাবের তাড়নায় কাকতাদ্রুয়ায় ভরে গেছে চম্পাইগঞ্জের পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর, খাল-বিল, পদ্মার বালুচর। মানুষ মারমুখী হয়েছে, নিষ্ঠুরতার জাল ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। এখন আর সেই চম্পাইগঞ্জ নেই, যেখানে চাঁদ সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে ধনপতি চাঁদ সদাগর হয়ে বাণিজ্যে যাবে। হাতির দাঁতের কাজ, সুগন্ধী মশলা আর মসলিনে বোঝাই জাহাজ নিয়ে বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরবে সে। তার পণ্যের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে সবাই। এইভাবে চাঁদ আশার মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। উপন্যাসে চাঁদের মুখে তাই অনায়াসেই শোনা যায়—

“চেঙমুড়ি কানী বিটি আজু মৃধা আমাকে ছোবল দেয়। সে বিষে আমি মরি না। আমি তা হজম করে নীলকণ্ঠ হই। আমি জানি আমার বেতুলা নেই যে মরা লাশ বুকে নিয়ে জলে ভেসে বেড়াবে।”

মনসামঙ্গলের বেতুলা দেবসভায় গিয়ে অনুনয়-বিনয় করে শ্বশুর চাঁদের দ্বারা মনসাপূজা দেওয়ার শর্তে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনে। এই ভিক্ষাবৃত্তিতে চাঁদের বিশ্বাস নেই। সে এমন এক বেতুলা চায় যে বিষক্ষয়ের অয়োজন করে শক্তিমান হয়ে লোহার চাল হজম করতে পারবে। আসলে পিতাই চাঁদকে অন্য মানুষ করেছে। ভর দুপুরে আম বাগানেয় ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা তার পোষায় না। বলদের মতো খাটনি খেটে খেটে জাবর কাটায় তার দারুণ ঘৃণা।

কখনো কখনো তার হাতে পায়ে অসুরের শক্তি বেড়ে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে সে মাঠে নামে। দিগন্তরেখার সীমানায় তাকিয়ে তার বোধ ফসলের প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। নতুন দিনের স্বপ্ন দেখে সে। তার মতে, চাঁদ বণিকের ময়ূরপঙ্ক্তীর স্বপ্ন দেখে বুক বাঁধে সে। চাঁদের জীবন থেকে সবকিছু হারিয়ে গেলে নতুন সম্ভাবনায় অন্ধকার দেখে। মায়ের সোহাগ, বাপের ভালোবাসা। আজু মৃধার ক্ষেত মজুর ছমিরণের স্বামী চাঁদবেনে কোন জমির মালিক হতে পারে নি। সন্তানের বাবা হতে পারেনি। তাই ভিটেমাটি বন্ধক রেখে স্ত্রীর চিকিৎসা করাবে বলে স্থির হয়। কারণ ভালো ডাক্তার পেলে, ওষুধ পেলে তাদের জীবনটা অন্যরকম হবে। চাঁদ ছেলে-মেয়ের বাবা হবে। আজু মৃধার ঘাড়ের উপর থেকে মাথাটা ফেলে দিবে। সব জমি ক্ষেত মজুররা ভাগ-বাটোয়ারা করতে পারে। জমির মালিক হবে। চাঁদের বাবার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বিল জমিতে আজু মৃধা চাষ করতে চায়। এই জমিতে চাঁদকে পাঠাতে চায় সে। তাই চোখ রাঙালেও মহাজন তাকে তোয়াজ করে।

তার শরীরে শক্তি আছে। বুকে সাহস আছে। প্রয়োজনে হেতালের লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হতে পারে। আজু মৃধার তোয়াজে তার কিছু যায় আসে না। ‘তাঁর জীবনের পুরোটাই খরা। ফসলহীন জীবনটার শ্যামলার জন্য চাঁদ তৃষার্ত। চাঁদ তাই সুদিন চায়। সব মানুষকে নিয়ে চম্পাইগঞ্জের একটাই পরিবার গড়তে চায় সে।

মানুষ নিজের অস্তিত্বের সংকটে পড়ে অভাবের তাড়নায়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় সান্ত্বনার মা অনায়াসেই চেয়ে বসে ছেলেকে ধার দেওয়া টাকা। ছেলে, বৌ, নাতিপুতি না খেয়ে থাকলেও তার কোন আক্ষেপ নেই। সুদের ব্যবসার মহাজন হবার চিন্তায় সে মগ্ন। চিবোতে না পারলেও চাঁদের প্রতিবেশী চাচীকে মাসকালাইয়ের রুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কয়েক কেজি আটা পাবার আশায় শহরে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মারা যেতে হয় গ্রামের ক্ষেতমজুর জমিরকে। আর এভাবেই জমিরের মতো চম্পাইগঞ্জের মানুষগুলো মারা যাবে। আবার নজিবর ভাই পেটের দায়ে হালের বলদ বিক্রি করে দুই ছেলে ফজর ও নজরকে হাল টানার কাজে লাগায়। অন্যদিকে চাঁদ ও সকিনার রোম্যান্টিকতার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে সুন্দরভাবে। ভিটে বন্ধক রেখে স্ত্রী ছমিরণকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায় চাঁদ। কিন্তু চাঁদ সমস্ত টাকা খরচ করে উজাড় হয়ে ঘরে ফিরে। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে শহরে গিয়েছিল সমস্তটাই সে পাথুরে দেওয়ালের শহরে রেখে এসেছে। সারাজীবনে সে যতটুকু পেয়েছে তার থেকে হারিয়েছে বেশি। নিজের জীবন সে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতি এসে বাধা দেয়। প্রকৃতির কাছে হার মানতে নারাজ চাঁদ। শহরের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সে ঘরে ফিরেছে তাকে সে অতিক্রম করতে চায়। ছমিরণ যে সন্তান পাবে না, আজু মৃধা ভিটে দেবে না— এই দুটোকেই অতিক্রম করবে চাঁদ। মানুষ ও প্রকৃতি দুটোকেই সে জয় করতে চায়। চম্পাইগঞ্জের মানুষ তাকে পরাজিত ব্যক্তি ভাবলেও চাঁদের একটা লখীন্দর চাই। যে লখীন্দরকে সাপে কামড়ায় না। যে লখীন্দরের জন্ম হলে চম্পাইগঞ্জের খরা, অজন্মা, অনাবৃষ্টি কেটে যাবে। এই গ্রাম ও গ্রামের মানুষ তার আপনজন। এ ভূমি হচ্ছে তার প্রিয় ভূমি, এখানে তার শেকড় প্রোথিত। তাই সে তোরাব, নুরু, কাশেমদের মতো কাজের খোঁজে শহরে চলে যায়নি। আপাতদৃষ্টিতে যতই পরাজিত হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। এক ছমিরণ না পারলে সে অন্য ছমিরণ খুঁজে নেবে। সে মাটি চিনেছে, চষা জমি চিনেছে, বীজ চারা, আগাছা চিনেছে। কিন্তু ফসল চিনতে পারেনি। জন্মের সময় শরীরের ফুটো দিয়ে যে সাপ তার শরীরে প্রবেশ করেছে, সেটা এখনো ফোঁসফোসায়। তার হাত দিয়ে আজু মৃধার গোলায় ফসল চলে যায়, তার বাবা-দাদা কেউই আড়াল করতে পারেনি। কিন্তু সে চাইনি আর কেউ দিক। নিজেদের ভাগ্য

তারা নিজেরাই গড়ে তুলতে চায়। নিজেদের উৎপাদিত ফসলের গোলা নিজেরাই বানাবে। চষা জমি বানাবে। নবান্নের উৎসব মাসব্যাপী জাগিয়ে রাখবে। সে এমন চাঁদবেনে চায় যার ‘হিস্তালের’ লাঠির ভয়ে মনসা লুকিয়ে থাকবে, মাথা তোলার সাহস পাবে না। সেই সঙ্গে সে নতুন ভিটে গড়বে। সকিনা এখন তার সেই স্বপ্নের ইঙ্গিত। এক ছমিরণের ব্যর্থতায় সে ফুরিয়ে যাবে না। তাই আজু মৃধার দখলকৃত ভিটের জন্য লড়াই করবে। কোনরকম গ্লানি হতাশা সে মনে রাখবে না। সকিনাকে উর্বরা নারী রূপে গ্রহণ করবে। তার কথা ভাবতে ভাবতে প্রশান্তির ঘুম দেয়। এই ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখতে চায় কালীদহে সপ্তডিঙা প্রস্তুতের, যার সাহায্যে বাণিজ্যে যেতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়ে কাদা-জলে আটকা পড়ে স্ত্রী ছমিরণের মৃত্যু হলে চাঁদ সকিনার মধ্যে নতুন জীবন খোঁজার চেষ্টা করে। চাঁদ ও সাকিনার রোম্যান্টিকতার চিত্র পাই আমরা এভাবে—

“চাঁদ সকিনাকে কাছে টানে। ওদের ভাষা বদলে যায়। স্পর্শ এবং ঘ্রাণের মধ্যে দুজনে বিহ্বল হয়ে থাকে। অন্ধকার গাঢ় হলে আম বাগানের পথে সকিনাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসে চাঁদ। আম বাগানের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওকে বিদায়ের চুমু দেয়। আগামীকাল চলে যাবে বিলের জমিতে।”^{৯৬}

আজু মৃধার বিলের জমিতে কাজ করতে যায় চাঁদ। এখান থেকে ফিরে এলেই সকিনার সঙ্গে তার বিয়ে। নতুন জীবনের স্বপ্ন চাঁদকে আচ্ছন্ন করে। সকিনার ভালোবাসা পেয়ে সে নিজেকে সম্পন্ন মানুষ বলে মনে করে। সকিনা তাকে ফসলের স্পর্শ দিয়েছে, তাই চাঁদের সাহস দ্বিগুণ বেড়েছে। সকিনার গাঙুড়ের জলের স্রোতে সে অমিত বিক্রমে সপ্তডিঙা মধুকর পাল উড়িয়েছে। তার বুকে মুখ গুঁজে সে হাজার বছরের চম্পাইগঞ্জ খুঁজে পায়। উপন্যাসের শেষের দিকে চাঁদের বিদ্রোহের প্রকাশ চরমভাবে দেখা দিয়েছে। নিজের অধিকারবোধ চূড়ান্তপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আজু মৃধা তার বন্ধক রাখা ভিটেমাটি কায়দা করে হস্তগত করে নেয়। চাঁদ এই প্রতিশোধ নেয়, আজু মৃধার বিলের জমিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে; আজু মৃধা এই পোড়া জমি দেখে চাঁদকে গালিগালাজ করলে প্রতিবাদের সুরে বলে—

“হামি চম্পাইগঞ্জের মাটি চিনি, ফসল ফলাই। হামার আবাদ বাদে আপনাগোরে গোলা ভরে না। চম্পাইগঞ্জে হামি থ্যাকবো নাতো থ্যাকবেন আপনি?”^{৯৭}

আজু মৃধা চাঁদের গালে চড় মারলে চাঁদ মুহূর্ত দেরি না করে হাতের ধারালো দা দিয়ে তার ঘাড়ের উপর কোপ দেয়। আজু মৃধার রক্ত দেখে চাঁদের বড় আনন্দ হয়। লাথি দিয়ে শরীরটাকে এ পাশে ও

পাশে গড়ায় ফুটবল খেলার মতো। বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায় পদ্মার ধারে। দেহ ও মুণ্ডু পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেয়। অত্যাচারী আজু মৃধাকে নির্মূল করে চারিদিকের শত্রুকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয় চাঁদ। অন্যদিকে সকিনার পেটে জন্ম হয়, ভবিষ্যতের প্রজন্ম। সে নিজেকে চম্পাইগঞ্জের স্বাধীন মানুষ এবং ধনপতি বণিক মনে করে। তার জাহাজভরা সাহস ও শক্তির পণ্য আছে। আরো আছে পরিশ্রমের ‘মাদুদি’। সে যে ঘাটেই জাহাজ নিয়ে যায় না কেন, সবাই হুমড়ি খেয়ে তার পণ্য কিনবে। তবে সে কোন মূল্যে পণ্য নিঃশেষ করবে না। বাতাসে উড়িয়ে দিবে তার বীজ। সেই বীজে চারা গজাবে এবং তা দ্রুত বেড়ে মহীরুহে পরিণত হবে। আর আজু মৃধার মতো স্বার্থান্বেষী, লোভী কাপুরুষ ব্যক্তির তাকে ভয় পায়। তার মধ্যে আরো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে বিদ্রোহের ধ্বনি এই বক্তব্যে—

“আমি শাণিত ছুরি হয়ে ওদের মেদবহুল বুকে আমূল সঁধিয়ে যাই। চাঁদ
সদাগর মনসাকে দিয়েছিলো কড়ে আঙুল দিয়ে পূজো। কড়েতে আমার
বিশ্বাস নেই। আমি চাই মুণ্ডু।”^৮

বিচ্ছিন্ন ধড় থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তে কীর্তিনাশার পলি ফেলে যে উর্বরা জমি তৈরী হবে সেখানে ফসল ফলানোর সংকল্প করে। নিষ্ফলা মাটিতে এভাবে গড়ে তুলবে ফসলের রগরগে বৈভব। তাই সকিনার পেটের সন্তান তার অহংকার। সে একজন গর্বিত পিতা হবে। তাদের লখীন্দরকে লোহার দেয়াল দিয়ে আড়াল করতে হবে না। এই লখীন্দরের জন্ম হবে খোলা আকাশের নীচে গাছের উন্মুক্ত তলায়। তারা কোনো পাপ করেনি। তাই কোন লজ্জা নেই, ভয় নেই। এই লখীন্দর আজু মৃধাদের বেড়ে ওঠাকে রুখবে। চম্পাইগঞ্জের মাটিতে আর কোন আজু মৃধা থাকবে না।

জনপ্রিয় লেখিকা সেলিনা হোসেন ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে লেখেন এক নতুন জীবন সংগ্রামের কাহিনী। তাঁর কলমে রচিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক ডিসকোর্স। পুরাণের কাহিনী বা মিথের পুনর্নির্মাণে নয়, তিনি রচনা করেন বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের এক দরিদ্র নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। চাঁদবেনে চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটিয়েছেন আমাদের চেতনার মধ্যে দিয়ে লোকপুরাণের ভাঙা গড়া। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্তর্বিষয়বস্তুকে ‘বিকল্প প্রেরণা’ হিসাবে গ্রহণ করে তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ সময়ের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বগ্রাসী অবক্ষয় ও বিপন্নতার বিরুদ্ধে যাত্রা করার জীবনী শক্তি হিসেবে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে ব্যবহার করে তিনি নতুন কাহিনী রচনা করেন। আধুনিক জীবনসংগ্রাম ও প্রতিবাদী চেতনার কেন্দ্রে উপনীত করেছেন চাঁদ চরিত্রকে।

তাঁর চাঁদবেনেকে দেখি বিশ শতকের সংকটময় বেড়াজালের মধ্যে মনসামঙ্গলের চাঁদবেনের বিশ্বাস নিয়ে জীবনসমুদ্রে শোষণ ও বঞ্চনার আবরণকে ভেঙে প্রারম্ভিক বিপর্যয়ের আঘাত ও মানুষের তৈরী নিয়মাবলীকে অতিক্রম করতে চায় সে।

আমরা দেখি চাঁদ চরিত্রের কথনের মধ্য দিয়ে পুরো উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন লেখিকা। নিজের জীবনের অতীতের বর্ণনা করে চাঁদ পিতার জীবনের দারিদ্রের কথা, বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে নিজের জীবনের বিপর্যয়, হতাশা গ্লানির বর্ণনা করেছেন। তবে সে নিজের জীবনে হেরে যাওয়ায় থেমে থাকেনি। খুঁজে নিয়েছে বিজয়ের পথ। জীবনের সার্থকতায় উদ্ভীর্ণ হয়েছে সে। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি এই উপন্যাসে। তবে চাঁদ চরিত্রকে অবলম্বন করা হয়েছে প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে। মনসার প্রসঙ্গ এসেছে বিশ শতকের অন্যায়-অত্যাচারী হিংসাত্মক শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের আলো হিসেবে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন লেখিকা। যেমন— ১. উপন্যাসের প্রথমেই আমরা জানতে পারি উপন্যাসের প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য চরিত্র চাঁদের নামের কথা। মা তাকে আদর করে ডাকত চাঁদ। বাবা ‘আকিকা’র সময় ভালো নাম রাখলে সেটা বিয়ের কাবিল এবং জমির দলিল ছাড়া একবার শুধু আজু মুখা পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। তারপর সেই নাম অস্তমিত হয়েছে। মানুষে তাকে চাঁদ নামেই চেনে। নামের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ চরিত্রের বলিষ্ঠতা, সততা, একনিষ্ঠতা মনসামঙ্গলের চাঁদের মতো পাই। সে নিজেকে একা ভাবে, পাগল স্ত্রী ছাড়া সাতকূলে তার কেউ নেই। ধূর্ত মহাজনের জমিতে চাষ করে। জীবনের চলার পথে সবকিছু হারিয়ে ফেলে চাঁদ। কিন্তু মনোবল হারায়নি সে। নতুন করে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের মতো হেতালের লাঠি নিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে দূর করতে চায়। মনসারূপী অন্যায়কে দূরে সরাতে চায়।

২. সাপের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। রাত্রিবেলা বাবার সঙ্গে মনসার পালা দেখে ফেরার সময় ফণিমনসার গাছ দেখে তার সাপ মনে হয়েছে। সাপের ফণার মতো ফণিমনসার গাছ দেখতে। তাই দেখে ভয় পায় চাঁদ।

৩. বাবাকে চাঁদ বণিকের সঙ্গে তুলনা করেছে চাঁদ। চাঁদ সওদাগর যেমন সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। উপন্যাসে চাঁদের পিতাও অবলীলাক্রমে নৌকা বেয়ে যেত পদ্মানদীতে। বাবাকে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর মনে হয়েছে। তাই বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

“প্রবল ঢেউয়ের মাথায় তুমি কি অবলীলায় নৌকা বাও? পণ্য-ফেরি

করো ঘাট থেকে ঘাটে। মহাজনের পণ্য। তুমি কি সেই মনসার পালার
সদাগর।”^{৯৯}

তেমনি চাঁদের বাবা নিজে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, বিপক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি ঠিকই,
কিন্তু স্বপ্ন দেখা ছাড়াই। জমি, ফসল সমস্ত হারিয়েও সে ভেঙে পড়েনি। মুখে হাসির ফোয়ারা
নিয়ে সবকিছু ভুলে থাকত। পুত্র চাঁদকে সে লখীন্দর বলে উল্লেখ করে। এই লখীন্দর সপ্তডিঙা
মধুকর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রে। চাঁদের বাবার কথায়—

“তুই হামার লখীন্দর। পারবু না সপ্তডিঙা মধুকর ব্যানাবার? আমি বলতে
পারতাম না যে কেমন করে বানাতে হয় বাবা? আমি ঘাড় নেড়ে বুক টান
করে বলতাম, প্যারমো বাবা, প্যারমো।”^{১০০}

৪. উপন্যাসে ছমিরণকে কালীদহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যৌবনে ছমিরণ ছিল
কালীদহের মতো। সেখানে চাঁদ তার সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে দিত নির্বিবাদে। সেখানে মনসার
অভিশাপ এসে সব ডুবে গেল, ডুবে গিয়ে তলিয়ে গেল। আবার ছমিরণের হাসিকে ছোটবেলায়
দেখা মনসা পালার মনসার ত্রুর হাসি মনে হয়।

৫. অনাহার ও দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষ গল্প শুনে শান্তি পায়। কোন কিছু অবলম্বন না পেয়ে,
আশার আলো দেখতে না পেয়ে শুধু গল্পের মধ্যে নিজেদের মুখ খুঁজে নেয়। তা শুনে আরাম পায়।
তাই মানুষ রাত জেগে জেগে মনসার পালা দেখে। সপ্তডিঙা মধুকরের সমুদ্র যাত্রা, লখীন্দরের
মৃত্যু, বেংলার নাচ করে স্বপ্নের সপ্তডিঙা দেবতার কাছ থেকে চৌদ্দডিঙা করে আনা, ছয় ভাসুরকে
জীবিত করে নিয়ে আসা প্রভৃতি গল্প শুনতে শুনতে তাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সাধারণ দরিদ্র
মানুষের শান্তির গল্প হয়ে ওঠে এই মনসার কাহিনী।

৬. উপন্যাসে চাঁদ নিঃস্ব, হেরে যাওয়া মানুষ হিসাবে সবকিছু মেনে নেয়নি। প্রতিবাদী চরিত্র
হিসেবে চাঁদবনে হয়ে ঘরে ফিরে, নতুন স্বপ্ন দেখে, তাই নিজের সন্তান কামনা করে। যে লখীন্দর
হয়ে আবার নৌকার হাল ধরবে, জীবন সমুদ্রে জয়লাভ করবে। তাই ছমিরণের পেটে সন্তান আসার
খবরে সে উল্লসিত হয়, আনন্দে মাতিয়ে তোলে গোটা ভুবন, প্রশান্তির ঘুম দেয়।

মনসামঙ্গলের উপরিউক্ত অনুষঙ্গগুলি থাকলেও লেখিকা এই মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্য
দিয়ে অগ্রসর হয়ে তৈরী করেন আর এক কাহিনী। বিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমকালীন
মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে চাঁদের এই সংগ্রাম কোন গোষ্ঠী চেতনায় আবদ্ধ না
থেকে চম্পাইগঞ্জের মাটি ও মানুষজনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সে একাই যুদ্ধের ময়দানে

নেমেছে। তাদের শ্রেণীশত্রু আজু মৃধাকে খুন করেছে সে একাই। এখানে লেখিকা সেলিনা হোসেন চাঁদ চরিত্রের গৌরবকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব দিয়ে অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একাই সংগ্রাম করে স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এখানে তার জয় সমাজ বিবর্তনের নতুন দিগন্ত রচনা করে। চাঁদের এই সাফল্যের কেন্দ্রে রয়েছে মনসাপুরাণের আবেগ। লেখিকা এখানে প্রচলিত বিশ্বাস ও পুরাণকল্পকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলে নিজের মতো করে মনসাপুরাণ রচনা করেন। প্রচলিত কাহিনীকে ভেঙে নির্মাণ করেন নতুন জীবনের কাহিনী। উপন্যাসের চাঁদ হল আজকের চাঁদ। পুরাণের চাঁদ বণিকের মতো মনসার কাছে আত্মসমর্পণ করা অসহায় পুরুষ নয়। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এক সাফল্যময় পুরুষ। এই চাঁদ তাই অনায়াসেই খুন করে ফেলে মনসার প্রতিভূ মহাজন আজু মৃধাকে। পুরাণের চাঁদ সদাগর বাধ্য হয়ে দিয়েছিলেন বাম হাতের কড়ে আঙুলে মনসাপূজা। কিন্তু আজকের এই চাঁদের কড়েতে বিশ্বাস নেই। তার চাই মুণ্ডু। রক্তমাখা মুণ্ডুহীন ধড়। রক্তক্ষয়ী সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় নতুন সমাজ। আজু মৃধাদের ধড় থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে কীর্তিনাশার পলি মিশে তৈরি হবে উর্বরা ভূমি। আজকের চাঁদেরা সেখানে ফসল ফলাবে। নিষ্ফলা মাটিতে জন্ম নেবে জীবনের ফসল। এই চাঁদ তাই এমন এক লখিন্দরের জন্ম দেবে যাকে লোহার চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা যাবে না। এই লখিন্দর বড় হবে খোলা আকাশের নিচে গাছের উন্মুক্ত তলায়। মনসামঙ্গলের লখিন্দরের কাহিনীকেও সেলিনা হোসেন বিনির্মিত করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন নতুনভাবে। এইভাবে বিশ শতকের হতাশাগ্রস্ত বিপন্ন জাতির কাছে চাঁদের এই শক্তি সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। এমন এক চাঁদ বণিকের আহ্বান করেছেন উপন্যাসের নায়ক চাঁদ, যার ভয়ে মনসা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই এখানে সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—

“প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয় নয়, বিশ শতকের ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ নয়, চাঁদ এখানে আধুনিক মন ও মননের দৃঢ় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার অভাবনীয় সাহস ও গভীরতর সমাজবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের মতো করে। মনসামঙ্গলের লখিন্দরের মতো জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করা ও অপরের করুণায় বেঁচে ওঠা অসহায় সন্তানের জন্ম দেবে না চাঁদ ও সাকিনা, তাদের লখিন্দর আজু মৃধাদের বেড়ে ওঠাকে রুখবে, চম্পাইগঞ্জের মাটিকে উর্বর করে তুলে রাশি রাশি ফসল ফলাবে।”^{১১}

উপন্যাসে সর্পের উপস্থিতি সরাসরি দেখা যায়নি। তবে সর্প সমস্ত উপন্যাসটি জুড়ে রয়েছে। সর্প চাঁদের জীবনে বিশাল ভূমিকা নিয়েছে। সর্পরূপী আজু মুধাই চাঁদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই চাঁদ এই নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করেছে নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে। লেখিকা মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়ে তৈরি করেন নতুন আর এক কাহিনী। সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের গ্রাম, জনপদ, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি পরিবেশে ও সমাজ-সমস্যার প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে। তিনি বিশ শতকের পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের যন্ত্রণা, অবক্ষয় ও হতাশাকে অনুভব করেছেন নতুনভাবে। পাশাপাশি এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ গঠনের সম্ভাবনাকেও ভাষারূপ দিয়েছেন। বাংলাদেশ গড়ে ওঠার কালপর্বে তাই চাঁদের মতো দৃঢ়, ব্যক্তিত্বময়, জেদি, স্বপ্নশীল, সাহসী ও শক্তিমান মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি— এই সত্যটিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে। এইভাবে প্রচলিত মনসামঙ্গলের পৌরাণিক কাহিনীকে গড়েছেন নিজের সময়ের বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। সেদিক থেকে সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ বাংলা সাহিত্যের একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া একটি আধুনিক উপন্যাস।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের চম্পক নগরের বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগরের ও দেবী মনসার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের শেষের দশকে ১৯৯৩ সালে লেখা আরেকটি উপন্যাসের সন্ধান পাই আমরা। সেটি হল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাস।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চাশের দশকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আবির্ভাব (২২শে মার্চ, ১৯১৮ - ৮ই জুলাই ২০০১) এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের যাঁরা স্বাতন্ত্র্যদীপিত কথাকার; অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ ও অসম শিলচর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের জীবনালেখ্য তাঁর কথাসাহিত্যের অন্যতম বিষয়। এছাড়া স্বাধীনতা, দেশভাগ, জাতিদাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মানবিক চেতনার অবমূল্যায়ন তাঁর সাহিত্যে বারে বারে ছায়া ফেলেছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও মিথও হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যবিষয়।

তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘নীলভুঁইয়া’ (১৯৫৫) যার পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ‘নয়নতারা’ রূপে ছাপা হয়। যদিও অন্যতম এপিক উপন্যাস ‘গড় শ্রীখণ্ড’ ১৩৬০ সালে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘পূর্বশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে ‘দুখিয়ার কুঠি’ (১৯৫৯),

‘নির্বাস’ (১৯৫৯), ‘উদ্বাস্ত’ (১৯৬২), ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ (১৯৮১), ‘বিলাস বিনয় বন্দনা’ (১৯৮২), ‘রাজনগর’ (১৯৮৪), ‘মধুসাধুখাঁ’ (১৯৮৮), ‘ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর’ (১৯৮৮), ‘বিবিক্তা’ (১৯৮৯), ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩), ‘বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী’ (১৯৯৭) ইত্যাদি উপন্যাস পেয়ে থাকি।

ইতিহাস ও পুরাণের নবনির্মাণে রচিত তাঁর দু’খানি উপন্যাস পেয়ে থাকি আমরা—

১. মধুসাধুখাঁ (১৯৮৮)

২. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩)

বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনীতি সঙ্গে কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, চিত্রকলা অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে দেখা যায়। জ্ঞানের জগৎ ও কল্পনাশক্তি মিশিয়ে তিনি জীবনের বাস্তবতা নির্মাণ করতে চান। ইতিহাস, পুরাণ-বাস্তবতা এবং মিথকে একত্রিত করে রচিত করেছেন তিনি ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে। প্রাগাধুনিক রচনা অবলম্বনে বর্তমান অস্থিরতাময় সময়ে জীবন জিজ্ঞাসাকে, চরিত্রের জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক আধুনিকতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ আধুনিক পর্যায়ের বিস্তৃত আখ্যান গ্রন্থন পরম্পরাকে পুনরুদ্ধার করতে দেখা যায় তাঁকে। এক্ষেত্রে তাঁর ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসটি ‘চতুরঙ্গ’ ও ‘বসুধারা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে। চারটি তরঙ্গ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত মোট ২৯টি অধ্যায়ে সুবৃহৎ এই উপন্যাস পুরাণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্ভর এক সাহিত্য। অধ্যায়গুলি নিম্নে দেওয়া হল—

প্রথম তরঙ্গ :

১. সমতটের বসুবণিক,

২. মধুলিট জাহাজ,

৩. পক্ষধরের গল্প

৪. চাঁদের জাহাজ মধুলুকা

৫. সমতটের যৌবন,

৬. শিব ও সর্প

৭. অন্য বাণিজ্য, অন্যপথ

৮. ধর্ম সুরা ও ক্রীতদাস

৯. এক অবিশ্বাস্য বাণিজ্য যাত্রা

১০. বদরিফল ও অলৌকিক তক্ষক
১১. নাগরী সমতট
১২. সুরা ও আলো
১৩. বিপর্যস্ত পণ্ডিত ও বংকদেশের গল্প
১৪. ভগ্নশিরা যক্ষ এবং রাজা জম্বুবান।

দ্বিতীয় তরঙ্গ:

১৫. এক দশকের স্বর্ণ হেমন্ত
১৬. জনৈকার জন্য
১৭. সে এক চিত্রাপিতা
১৮. কাম্পিল্যর আশ্রয়ালী,
১৯. অলৌকিক সর্পগুলি এবং শ্বেতময়ূর
২০. ব্যস্তসমস্ত সমতট
২১. বিচিত্র-মানুষেরা এবং অন্য এক পক্ষধর
২২. বৃহত্তম সিন্ধু শকুন ও রসিক রাক্ষসেরা,
২৩. অন্ধকার সুরা-আমোদিত গর্ভগৃহ ও ভাগ্য

তৃতীয় তরঙ্গ:

২৪. বণিক, নটিনী ও সন্ত

তরঙ্গ ভঙ্গি:

২৫. ইন্দুধর পর্ব
২৬. বিদূষক ও বিষ্ণুগুপ্ত
২৭. অরিমত্ত পর্ব
২৮. শূরসেন পর্ব
২৯. শান্তিপর্ব

লেখক মনসামঙ্গলের কাহিনিকে স্থাপন করেছেন বিস্তৃততর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তবে মনসামঙ্গলের কাহিনি নিলেও তিনি নবম থেকে দশম শতাব্দীর সময়ের ইতিহাস-পালযুগের শেষ পর্ব ও সেনযুগের সূচনাপর্বের মধ্যবর্তীকালীন অরাজকতাময় সময়কে উপন্যাসের কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছেন। এমনকি, পল্লব-চোল যুদ্ধ প্রসঙ্গও এসেছে। উপন্যাসের কাহিনী

বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের দেশ সমূহ তথা পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্র, সেখানকার জনপদ ও সমাজ ইতিহাস লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে।

উপন্যাসের প্রথমেই আমরা পাই সমতটের অধিবাসী চন্দ্রশেখর বসুর কথা। সেই সঙ্গে সমতটের সূচারু ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা, যা তৎকালীন সময়ের ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে উপন্যাসে। সিংহল থেকে বেরিয়ে একদল সিংহ বংশীয় বাঙালি বণিক বায়ু ও সমুদ্রস্রোতের আনুকূল্যের দরুণ মূল ভূখণ্ডের উপকূলে একটা ছোট উপনিবেশ গড়ে তোলে। যার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে পাহাড়। আর চম্পাবতী নামে গভীর খাড়ি সমেত নদী মধ্য সমতলকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে। উপনিবেশিক নগর চম্পক বা চম্পা। প্রসিদ্ধতর এই চম্পার বন্দর থেকে এই বণিকগোষ্ঠীরা পশ্চিমে—সিংহল, কেরল, ভৃগকচ্ছ, আরব, মিশর এবং পূর্বে কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, সুবর্ণভূমি, স্বর্ণদ্বীপ, কম্বুজ, চম্পা, চীন দেশে বাণিজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলতেন। এই দুই বাণিজ্যপথের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল চম্পক নগর। জৈন সন্ত-পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি তামিল কবিদের শিবগাথা এসব উপনিবেশে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত বহুল, পালিমিশ্র অবহট্টবাসী ছিল সমতটের অধিবাসীরা। এই নগরের বৃদ্ধি ছিল দ্রুতগতি সম্পন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত। চন্দ্রশেখর বসু অষ্টবসুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, রূপসী স্ত্রী স্বর্ণকায়া সনকা থাকায় সে ছিল সৌভাগ্যের অধিকারী। পিতা পারিবারিক বাণিজ্যতরী হারিয়ে শোকে ও আশাভঙ্গে অকালে গত হলে চাঁদবেনে সেই জাহাজগুলি পুনরায় নির্মাণ করে এবং জাহাজের সংখ্যা বাড়িয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। তবে শোনা যায়, প্রথমবার সাফল্যলাভ করলেও পরের বার সাতখানা জাহাজ খুঁইয়ে নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রথমবারে সে তাম্রপর্ণীর মুক্তা ও কদম্বের হাতির দাঁতের অলঙ্কার নিয়ে স্বর্ণদ্বীপে গিয়েছিল। দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ছাড়াও খাস বরেন্দ্রের কৃষ্ণদুকুল ও দিগনগরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্পাস শাড়ি এনেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার একেবারে নিঃস্ব হয়ে ফেরে চাঁদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (মধুলিট জাহাজ) চন্দ্রশেখরের তৃতীয় বৃহত্তর জাহাজ মধুলিট প্রস্তুত। অধ্যক্ষ পক্ষধরের অধীনে প্রধান মাঝি অথবা কাণ্ডারী গনা সহ চাঁদপুত্র বিজয় ঘোষ সুমদ্রযাত্রায় পাড়ি দেয়। মধুকরের অধ্যক্ষ মহানাদ এবং মধুপের অধ্যক্ষ মন্মটের মতো পক্ষধরকে চন্দ্রশেখর পাড়ি দিতে উৎসাহ দান করে। অনেকদিন ধরে মহাচীন যায়নি বলে পক্ষধরকে বলে। সেখান থেকে সুদৃশ্য অভূতপূর্ব-সুন্দর পানপাত্র আনার কথা ভুলে গেলে হবে না। পক্ষধরকে তাই যাত্রা করার জন্য

আহ্বান জানায়। বাণিজ্যযাত্রার পথ সে পক্ষধরকে জানিয়ে দেয়। বঙ্গোপসাগরের বৃত্তচাপ অনুসরণ করে কুলবাহী হয়ে মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কম্বুজ, আন্নমচম্পাকে বেষ্টিত করে মহাচীনের কিস্তচাত্তকে স্পর্শ করতে পারবে। সেখানে ভারতীয় বণিকদের ও শ্রমণদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সাগরের যাত্রায় আরেকটি অন্য পথের কথা বলে। মহাচীনের উপকূল থেকে সরে সোজা দক্ষিণে নেমে যবদ্বীপের মধ্যবিন্দুকে স্পর্শ করা যায়। মধুলিটের এবারের সমুদ্রযাত্রার সব চেয়ে বড় সার্থকতা হয়, মালয় উপদ্বীপ থেকে মহাচীন এই বিস্তীর্ণ বিচিত্র দ্বীপ ও দেশে সংগঠিত মহাদেশের সঙ্গে বণিকপুত্র বিজয়ঘোষের সংযোগ ঘটানো। রাজন্যবর্গ, অভিজাতবর্গ অথবা বণিকশ্রেষ্ঠ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুশল বিনিময়, উপহার বিনিময়, কার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে চন্দ্রশেখর বসুর অথবা তাঁর পূর্বপুরুষের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল, তা খুঁজে বার করে সম্বন্ধটাকে পুনরায় দৃঢ় করে। কম্বুজ সম্রাট বিজয় ঘোষ সর্বজয়ীর একখানি করে বাণিজ্যপোত বিনা শুষ্কে, তাঁর রাজ্যের বন্দরে বাণিজ্য করতে দেয়। যবদ্বীপের শ্রেষ্ঠী অদুলবিক্রমের গৃহে তিনদিন তিনরাত অবস্থান করে। বিক্রমের দ্বিতীয় কন্যা উনষোড়শ বর্ষীয়া সুবলপদুমার সঙ্গে প্রেমালাপ হয়। যাত্রার সময় শান্তশীল, বিনয়পালের মতো ত্যাগী, অনুসন্ধানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হয়। উপকূল থেকে সমদূরত্বে থেকে দক্ষিণাবর্ত সমুদ্রপ্রবাহ, উৎসাহিত জোয়ারের উত্তরমুখী অগ্রগতি, উপকূলমুখী সমুদ্রবায়ু— তিন বলকে নিজের প্রয়োজনে লাগিয়ে দান্তিক ময়ূরপঙ্খী মধুলিট এয়োদেশীর আলোয় গলুইয়ের পিতলের অলঙ্করণ ঝলকাতে ঝলকাতে উত্তরমুখে এগিয়ে যায়। সে এক বছর সময় ধরে উত্তর-পূর্বে চীনকে স্পর্শ করে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়, সুমাত্রা, যব ইত্যাদি দ্বীপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবশেষে সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে পূর্বে রেখে সেক স্ট্যান্ট, কম্পাস, দূরবীক্ষণ, ক্রোণোমিটারের সাহায্য ছাড়াই সাগরদ্বীপকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এই জাহাজ একসময়ে সমুদ্রেই হারিয়ে যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে পক্ষধরের গল্পে শোনা যায় চাঁদবেনে স্বর্ণকায়া সনকাকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করে। প্রবল আকাশ বিদীর্ণ ঝড়, শিলাবৃষ্টিতে চাঁদের জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, সেই সঙ্গে সনকাও হারিয়ে যায়। এই ঘটনার চারবছর পরে চাঁদ একটি মাত্র জাহাজ নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। এই পুরনো মধুলিকা জাহাজের জীর্ণাবশেষ দিয়ে সে নতুন মধুলিট তৈরি করে। পরে মধুলিকা জাহাজ নিয়ে কোন্নগরে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে নগর-নায়িকা ক্ষিরোদ সম্ভবার ভবনে যায়। পরে নটী লীলালতিকার গৃহে যায়। নটী লীলালতিকার সঙ্গে চটুল আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়। শেষে চিত্রকর চারুদত্তের ভৈরবীর চিত্র অঙ্কন এবং সেই সূত্রে চাঁদ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং ভৈরবীর সাহায্যে তাঁতী সংগ্রহ করে।

এখানে চাঁদ ছলনা করে তাঁতীদের নিয়ে আসে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি চাঁদকে ভৈরবী দাসব্যবসায়ী বলে অভিযোগ জানায়। এই ভৈরবীর মধ্যে চাঁদ স্ত্রী সনকার ছায়া অনুভব করে এবং ভৈরবীকে প্রেম নিবেদন করে। শেষে এই ভৈরবী ও সনকা একাকার হয়ে যায়। চন্দ্রশেখর বসুর ছলনা বুঝতে পারলে হলো ভৈরবী আত্মহত্যা করে এবং পাঁচ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সনকার আবির্ভাব হয়। ভৈরবীপুত্র সাগরকে সনকা কোলে তুলে নেয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে সমতট নগরের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। নগর প্রধান শেখর সেন, মটুলিটের শাসন পরিচালক মণিভদ্র, জনপদ প্রধান মহাস্থপতি, স্থাপত্য বিশারদ চিত্ররথের কথায় উঠে আসে উপন্যাসে, সেই সঙ্গে বণিক ইন্দুধবের কথাও আমরা পাই। বিভ্রান হলেই মানুষ প্রাসাদ ইত্যাদি তুলে থাকে। আর বহুদিন থেকে সেসবকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুদৃশ্য করার চেষ্টাও হয়ে আসছে। চিত্ররথের সময়ে নগরকে আগে সুশোভিত করার হাওয়া এসেছিল। অভিজাত বণিকশ্রেণী বাদ দিয়ে সম্পন্ন আদিবাসী, বর্ণসঙ্কর, আদিবাসী, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মধ্যেও তার প্রভাব ছিল। এইসময় সমতটের স্বর্ণযুগ ছিল। আর এই স্বর্ণাগমের মূলে ছিল মহানায়ক চন্দ্রশেখর। এইসময় আরেক প্রতিপত্তিযুক্ত বণিক ছিল ইন্দুধব। বসুবণিকদের অন্যতম এবং চন্দ্রশেখরের আবাল্য সুহৃদ-সখা শূরসেনের সে ভগ্নিপতি। চন্দ্রশেখর-শূরসেনের সঙ্গে এই ইন্দুধবের ছিল অসম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে চন্দ্রশেখরের পক্ষভুক্ত বণিকশ্রেণী হলেন রহস্যপটু, শিল্পরসিক, দ্বিতীয় চাণক্য মণিভদ্র, অধীরগামী, বাগ্মী, অর্বুদস্বর্ণের পতি সোমদত্ত, রুদ্রকর্মা, বিপুলদেহ বজ্রদন্ত যার চার চার খানা জাহাজ খনিজ বহন করে সমস্ত ঋতুতে সমুদ্র লঙ্ঘন করে কূটবুদ্ধি হরিষণ; স্থিতধী কামন্দক; গাণিতিক বিরূপাক্ষ; বৃদ্ধাপুষ্ঠের নখে সমতটের সমগ্র বাণিজ্যের হিসেবে পড়ে অমিততেজ বুদ্ধ। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে বন্ধু শূরসেন ও দময়ন্তীর সঙ্গে আলাপচারিতায় দেখা যায় চাঁদকে। সেই সঙ্গে দুই বন্ধুর সুরাপানও চলতে থাকে। ‘শিব ও সর্প’ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা প্রথমে চাঁদ ও সনকাকে দেখতে পাই।

চাঁদ পুনরায় বাণিজ্যযাত্রার জন্য নতুন জাহাজ তৈরি নিয়ে ব্যস্ত। সঙ্গে জাহাজডুবির জের তত সহজে মেটার নয়। মৃত সেই নাবিক, মাঝি-মাল্লাদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে, সাহায্য দেয় এবং অন্য সাহায্যও করে। বন্ধু শূরসেনের সঙ্গে দপ্তরে দেখা করে গোপনে পরামর্শ করে। পরামর্শে স্থির হয় বণিকদের নিয়ে সভা ডাকার। সভার নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়ে চাঁদ তার জাহাজে করে আনা মাটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সপ্তম অধ্যায়ে শূরসেনের উদ্যানবাটীতে চাঁদের সঙ্গে বৃদ্ধ মণিভদ্র, সোমদত্ত, বুদ্ধ, দর্ভপানি, প্রৌঢ় হরিষণ, ওদন্ত সেনের পুত্র বজ্রদন্তের মধ্যে

নতুন রকম ধাতু আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা হয় যা মাটির সঙ্গে জাহাজের খোল বোঝাই করে চাঁদ সমতটে নিয়ে আসে। এখানে ধাতুর প্রকৃতি, বাণিজ্যিক উপকারিতা ও অভিনবত্ব নিয়ে বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা হয়। চাঁদের চেষ্ঠায় শূরসেন মণিভদ্র, সোমদত্ত, রুদ্রকর্মা, বজ্রদত্ত, হরিষণ, কামান্দক, বিরূপাক্ষ, ইন্দুধব প্রমুখ ব্যক্তিত্ব নতুন উদ্যমে জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য যাত্রা শুরু করে। চাঁদ এই সময় একই সঙ্গে তিনখানা জাহাজ কেনে— সেগুলি হল মধুকর, মধুলিট ও মধুপ। বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর ছিল অফুরন্ত উদ্যম ও গভীর নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতা। প্রথর ব্যবসায়ীবুদ্ধির অধিকারী চাঁদ নানাভাবে বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। কখনো অন্য দ্বীপ থেকে মাটি নিয়ে এসে বিক্রয়, কখনো ধাতু সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। লোহাকে রূপায় পরিণত করার কৌশলও অনুসন্ধান করে সে। কখনো বা চীনা, শুক অথবা দিগনগরী বা কাজীপুরমের বস্ত্র সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন দ্বীপে রপ্তানী করেন। এইভাবে বাণিজ্যের নতুন নতুন দিক আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এমনকি খনিজ বাণিজ্যে যৌথমূলধনী ক্ষেত্রটিকেও চাঁদ গুরুত্ব দেয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল— এতে এগারোটি জাহাজ নিযুক্ত করতে হবে। চাঁদের নিজের থাকবে দুটি এবং অন্যান্যদের একটি করে। এরই মাঝে চাঁদ পুনরায় বাণিজ্যে যাত্রা করে। সমুদ্র ঝড়ের মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত হন। পরে কন্যাকুমারী অন্তরীপ হয়ে ফিরে আসে। এরপর তিনি সমতটের প্রান্তে অবস্থিত সাঁওতালি পাহাড়ে নির্মাণ করে এক বৃহত্তর সুন্দর প্রাসাদ। ছোটো বড়ো সাতটি উপত্যকায় সাজানো সাঁওতালি পাহাড়ের পরিবেশ শীতল, স্নিগ্ধ, চন্দনগন্ধে সাজানো ও মনোরম। এখান থেকেই নেমে এসেছে একটি পাহাড়ি ছোট নদী। সমতলে তার নাম সুবর্ণমুখী বা চম্পাবতী।

চাঁদ ও সনকা এই সাঁওতালি পর্বতের শীতল ধূলিহীন, চন্দনগন্ধযুক্ত ভূমিজ বায়ুর টানে সেখানে মাঝে মাঝেই বেড়াতে যায়। সেখানে মনসিজ গাছের ঝোপের চারিদিক ঘিরে পাঁচ-ছয়জন মানুষ খোলা আকাশের নীচে মনসা পূজা করে। বণিক বংশের মঙ্গল কামনায় সারি নামক সনকার এক ক্রীতদাসী এই মনসা পূজা করে। চাঁদের মতে এই সাপ কুটিলতা, ক্রুরতা আর বিষের প্রতীক। মাটিতে মিশে চলে কপট কোমলতা আর বিনীত ভাব দেখিয়ে। মানুষ অসতর্ক হলেই ছুবলে দেয়। পূজা মানুষের অনুভূতিকে উদার ও মহৎ করে। তা হয় সরীসৃপের ধ্যানে। আদিবাসীদের মনসাগাছের নিচে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে মনসাপূজা করাকে চাঁদ সমর্থন করে না। কিন্তু সনকা এই সাপকে দাস গোষ্ঠীদের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করে। মূর্খ ও মূক মানুষের নিজের অনুভূতি এই পূজার সঙ্গে জড়িত। বণিকপুত্র বিজয় ঘোষকে নিয়ে পক্ষধর সমুদ্রযাত্রা করে। পক্ষধর বিজয় ঘোষ, দণ্ডপানি, শান্তশীল ও কুমার বিনয় পালকে নিয়ে চাঁদের সপ্তডিঙা তলিয়ে যাওয়ার যে পূর্ব ঘটনা বলে তা

বিজয়ঘোষকে নৌচালানো শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বংশের ইতিহাস জানানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে। বন্ধু শূরসেন ও তার স্ত্রী দময়ন্তীর উপস্থিতি তাঁদের জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চাঁদ শূরসেন, দময়ন্তীর আলোচনায় উঠে আসে দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, সাহিত্য শিল্প ও সভ্যতার নানা দিক।

উপন্যাসের দ্বিতীয় তরঙ্গের সূচনা হয়েছে সমতটের স্বর্ণযুগের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। দশ বছর যুগব্যাপী সোনার হেমন্ত সমতটে। হেমন্তের সোনা প্রবাদে শস্য হলেও সমতটের সোনা সেই অভূতপূর্ব মৌলিক বাণিজ্য। ঔপন্যাসিক এই স্বর্ণযুগের বর্ণনা করেছেন এভাবে—

“প্রথম দশ বৎসরেই সমতটে যদি একশো জাহাজ এসে থাকে, অন্যান্য ধাতু এসেছে চতুর্গুণ। আর এই দশ বৎসরে খনিজ-অঞ্চলেও শুধু ধাতু শ্রমিক, ধাতু কারিগর নয়, ধাতুবিল্লেখক নামে এক শ্রেণীর পণ্ডিত সৃষ্টি হয়েছে সমতটে। তারা উত্তাপ আর অগ্নির সাহায্যে পাথর থেকে ধাতু, এক ধাতু থেকে অন্য ধাতু পৃথক করে।”^{২২}

বাণিজ্যযাত্রার জন্য চাঁদ মধুভূঙ্গ ও মধুতপ্ত নামক জাহাজ তৈরি করেন। চম্পকনগরেও তৈরি হয়েছে বৃহত্তর, সুদৃশ্য এক অট্টালিকা। এই প্রাসাদের ঐশ্বর্যসুখ ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও তাঁদের মন অস্থির। আলাদা একটা ভয়-ভীতি তাঁর মধ্যে আসে। তাই সে বন্ধু শূরসেনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে হিসেব ঘরে প্রদীপের আলোয় বাতায়নের চৌকাঠ পর্যন্ত উঁচু এক ধূসর খয়েরি ফণায়ুক্ত সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়। সাপটি যেন সেই মুহূর্তেই জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে আকাশে উঠে যায়। তার জ্বলন্ত চেরা জিভ বিদ্যুতের মতো আকাশকেই ভাগ করতে লাগল। আর তারই ফলে প্রবল ঝাপটায় ঘরের প্রদীপ নিভে যায়। পূর্ণিমার আকাশে বৃষ্টি নামে। তাঁদের মতে এটি ছায়ামাত্র। সে হা হা করে হেসে সাপের দিকে আঙুল তুলে দেখায়— “দেখো, সনকা, দেখো, চাঁদকে ভয় দেখায়, চাঁদকে।”^{২৩} পরে চাঁদ নিজেকে সামলে নিয়ে এই দৃশ্যকে অলৌকিক নয় বলে উড়িয়ে দেয়। এটি এক রকমের বৃষ্টি, উত্তাপ সঞ্চালনে হয়। বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র পড়ে। চাঁদ একসময় রাত্রে বীভৎস স্বপ্ন দেখেন। সেই দিন ছিল প্রচণ্ড গরম। ঘুম না হওয়াতে বিরক্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন চাঁদ স্বপ্নে ‘হেস্তাল’ বলে চিৎকার করে। মনে হয়েছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতায় নদীর ধারে আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তায় প্রাচীন হিজল গাছটা বীভৎস হয়ে উঠেছে। তার পত্রহীন ডালগুলো বিস্তৃত হয়ে যেন ডাইনির মতো দাঁড়িয়েছে। সেই গাছের ভয়াবহ অন্ধকারময় কোটর থেকে আর্ত চিৎকার করে বেরিয়ে আসছে একটা পাখি। আর একটা কুৎসিত দর্শন সাপ পিচ্ছিল গতিতে ফণা লুকিয়ে সেখানে ঢুকতে

উদ্যত হয়েছে। তখনই অসহায়ের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে আসার অনুভবে চাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। উনিশ অধ্যায়ের শেষে, বন্ধু শূরসেনের মতে মনসাপূজা বা সর্প যদি সাধারণ কৃষ্ণবর্ণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পদপিষ্ট অনুভূতির প্রতীক হয় তাহলে সেগুলি একসময় বিষ সঞ্চয় করে বিষাক্ত ও ত্বর হয়ে উঠতে পারে। দময়ন্তীর গল্প মতে সেকালে সাপকে ঐশ্বর্য আদায়ের শক্তি রূপে ধরা হত। কিন্তু আরো লোভ, আরো ঐশ্বর্য আদায় করতে গেলে বিষ উগরে পড়ে। উপন্যাসের সতেরোতম অধ্যায়ে দেখি এগারো বছর পেরিয়ে যাবার পরে পুনরায় যৌথ বাণিজ্যকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর জন্য মণিভদ্রের বাড়িতে হরিশেখর, সোমদত্ত, দর্ভপানি, বজ্রদত্ত, বুদ্ধ, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বণিকদের মধ্যে আলোচনা হয়। উপন্যাসে কলিঙ্গ বণিক বাকপতি, ইহুদী সুরা বণিক সলেমান, সুলতান বণিক বিণ চাচ ও বমিয়ান আকমদ চাঘতাই, জিড্ডার বণিক আব্বাস, সুমালির কথা জানা যায়। সেই সঙ্গে বসুশ্রী পুত্র হলায়ুধ ও শূরসেন পুত্র শাতনীকের বিণ চাচের সঙ্গে উত্তর ভারতের রাষ্ট্র, পাল, প্রতিহার এই তিন সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে যাওয়ার কথা শোনা যায়। চাঁদপুত্র সাগর বাণিজ্যে গিয়ে পিতার মর্যাদা রক্ষা করতে ইচ্ছুক। সাধারণ লোকে যে পিতাকে লোভী, নির্বোধ ও ঘাতক বলে এবং বিনা কারণে জাহাজগুলোকে সমুদ্রে পাঠিয়ে অধ্যক্ষ ও নাবিকদের হত্যা করেছে— পিতার এই অপবাদ ঘোচানোর জন্য, মিথ্যা রটনা দূর করার জন্য সমুদ্রে যেতে চায়। সে নিজে সমুদ্রে গিয়ে প্রমাণ করতে চায় শ্রীমন্ত, রুদ্রসেন, কৌমিলরা যারা লোহিত সাগরে গিয়েছিল কুড়ীর জাহাজে, পুরন্দর যে মধুতৃপ্ত নিয়ে গিয়েছিল আরব সাগরে— তারাও চাঁদের প্রিয় ছিল। সে পিতার যোগ্য পুত্র হতে চায়, সমুদ্রযাত্রাগুলো যে উদ্দেশ্যহীন ধ্বংস নয়— তা প্রমাণ করতে চায়। মধুকর, মধুপ, মধুবহ, মধুমক্ষী ও মধুভৃঙ্গ জাহাজ নিয়ে সাগরদত্তের বাণিজ্যযাত্রা এবং পুত্র সাগরের নিমজ্জিত হওয়া চাঁদের জীবনে ব্যর্থতা নিয়ে আসে। তাঁর হাহাকার ও মধুলিট জাহাজ নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়তির কাছে পরাজয় যেন। চাঁদ একবুক জলে নেমে মধুলিটের সাতহাঁড়ি ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, একশত নারিকেল সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তখন তার চোখ দুটি যেন অন্তগামী সূর্যের মতো রক্তিম। সেই জীর্ণ মধুলিটেই উঠে এসেছিল চাঁদ। উত্তর-পূর্বা বায়ু তখন উত্তর-পশ্চিম বায়ু, প্রবল সমুদ্রস্রোতে পূর্বমুখী ছুটছে বামাবর্তে। বন্ধু উসমান ও বাপা দায়ুদকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত কাণ্ডার-মঞ্চ গিয়ে উঠেছিল। দায়ুদ ও উসমান জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ার সময় ‘বাপা সাগর’ বলে চাঁদের হাহাকার শোনা যায়। দায়ুদও নৌকায় নেমে গেলে উসমানের সেই দীর্ঘ নৌকার গলুই সমুদ্র ফেনার মতো আন্দোলন করে। দায়ুদের মতে সেই প্রবল বায়ু ও সমুদ্রস্রোতের মুখে যে হাল ধরে, তাকে আদমের সন্তান বলে মনে হয় না। সেই জরাজীর্ণ মধুলিট তারপর কোথায় গেল কেউ জানে না। যেমন করে

এক পিতা সাগরকে খুঁজেছিল, তেমন করেই বিজয়কে সমুদ্রে পাঠিয়ে এখন অনুশোচনায় তাকে খুঁজছে? সেই পাঁচ কার্যপণের জাহাজ? শীতে, গ্রীষ্মে কখনই বা সমুদ্র প্রমত্ত নয়। চাঁদ হয়তো কালকে অতিক্রম করতে চেয়েছিল। তাই বন্ধু শূরসেনের মুখে শোনা যায়—

“ভাগ্য বলে কি কিছু আছে? এবার কি ভাগ্যকে প্রলুব্ধ করতে সে তার দরজায় আঘাত দিতে চাইছে? সে কি, অথবা, পালের রশি নিজের হাতে ধরে তারমুখোমুখি দাঁড়াতে চায়?”^{১৪}

তৃতীয় তরঙ্গে বিজয়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া চাঁদের জীবনে আরো ট্রাজেডি নিয়ে আসে। নিজে সপ্তসাগর পাড়ি দেয়; কিন্তু সেখানেও তার ব্যর্থতা। সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় জীবনের তরঙ্গও বহমান, তার কোন সীমা নেই, অনন্ত তার ব্যাপ্তি তার অপর তীরে কী আছে কেউ জানে না। সব ধর্মেই জীবাত্মা হোক, বা পুঙ্গল হোক সব মানুষকে জীবন সমুদ্রে নাবিক হতে হয়। পিতা বিজয় ঘোষকে সর্বজয়ী নায়ক হতে বলেন। তাঁর কাছে কালের তরঙ্গভঙ্গ, লবণসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ অপেক্ষা বেশি বিপজ্জনক ও ভয়াবহ মনে হয়। অথবা বেশি বিচিত্র। পিতার আশীর্বাদকে সফল করার জন্য নিজের মধ্যে এভাবে আত্মজিজ্ঞাসা উঠে আসে বিজয়ের। আত্মসংকটের মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে সমুদ্রের মধ্যে। বিনা মেঘের বজ্রের আঘাতে বিরূপাক্ষ ও ভৃঙ্গীবৎ চাঁদ ‘ও বিজয়’, ‘ও বিজয়’ বলতে বলতে তাঁর দু’চোখ জলে ভরে ওঠে। প্রভাতে ও অপরাহ্নে, সায়াহ্নে, পাটাতনে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায়। দভভপানির মুখে তাই ঔপন্যাসিক শুনিয়েছেন—

“পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ মধুলিটে সপ্তসাগর চষে বেড়ানো, সে তো মূর্তিমান হাহাকারই। তার উদ্দেশ্য কি ছিল, সাগরদত্ত থেকে দুর্ভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা? হায়, দেবী হয়ে গিয়েছিল যেন। তারপর থেকে বিজয় ঘোষ থেকে দুর্ভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেই কি নতুন মধুলিটকে জরাজীর্ণ আর এক মধুলিট অনুসরণ করছিল? যখন ভাগ্য, বুঝলে, শ্রমণ বিজয়কে সে কোনো ভাবেই সার্থক আঘাত করতে পারবে না, তখনই এই চূড়ান্ত আঘাত তার চিরবৈরীকে।”^{১৫}

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তরঙ্গভঙ্গিলে পল্লব বংশের পঁচিশ বছর ধরে কুম্ভকোণমের মহাযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। চোল পাণ্ড্য ও পল্লবের মধ্যে যুদ্ধ। নৃপতুঙ্গের মৃত্যুর পরে অপরাজিত অপ্রতিহত শক্তি লাভ করে। কিন্তু আটশো ছাব্বিশে আদিত্যচোল অপরাজিতকে হত্যা করে চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নবম শতাব্দীর ইতিহাসকে বাস্তবায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। এই

কুন্তকোনমের যুদ্ধ সমতটকেও প্রভাবিত করতে পারে। তাই আদিবাসী গোষ্ঠীসহ বণিকদের মধ্যে বৈঠক হয়। আরক্ষবাহিনী শক্তি, মায়াবাহিনী শক্তি তৈরি করা এবং সাঁতালি পর্বতের উপরে দুর্গ নির্মাণ, শূরসেনের তত্ত্বাবধানে নারী-শিশুদের সাঁতালি পর্বতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধে ইন্দুধব ও শূরসেনের মৃত্যুতে সমতটে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সমতটের বসুণিক চন্দ্রবসুর জীবনের করুণতম পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। ভাগ্যের কাছে পরাজিত এই অর্ধদন্ধ বলিষ্ঠ পুরুষ চন্দ্রবসুর জীবনের পরিণতি দেখানো হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ নিঃস্ব হয়ে সমতটে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে পল্লবভরমের পথ অতিক্রম করে সমতটে ফিরে আসে। তবে নিজেকে অপরাধী মনে করে না সে। শুধু বন্ধু, অধ্যক্ষ, নাবিকদেরই সে বাণিজ্যে পাঠায় নি, প্রাণসম পুত্রকেও পাঠিয়েছে। সনকার কাছে তাই সে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে—

“তাছাড়া সনকা, আমার পরিকল্পনায় কি ভুল ছিল? তুমি এ সবে আমার সঙ্গে একমতই ছিলে। মন্মট, মহানাদ, পুরন্দর, সৌতি, সুযেণের মতো অধ্যক্ষ, আর দেহরক্ষী হিসাবে সাতশত তারা। আর তারা লোহিতসাগরে না গিয়ে সুমালি আর অবিসিরাজ্যে ভারতীয় কার্পাস ভারতীয় পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র করবে। বলো, তাই নয়? আর সাগর বলেছিল কাব্যই প্রমাণ অনেক সময়ে পুত্রদের নিজের যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করতে হয়, কে তার জনক। দেখো আমি ভেবেছিলাম সুমালিতে ভারতীয় পণ্যকেন্দ্র স্থাপিত হলে, বংকই প্রমাণ সেখানে আরবি ইশায়ী সব বণিকই আসত, সেখানে বন্ধু আরবিদের দেখা মিলত। তখনই ভূমধ্য সাগরের উপকূলে যাওয়া সহজ হত।”^{১৬}

ভাগ্য যে তার সাথ দেয় নি, কালের ঘোরাটোপে সে যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তা নিজে বুঝতে পেরেছিল। তাঁর ক্ষেত্রে ভাগ্য কাপুরুষ হয়ে, সমাপতনের চেহারায়ে এসেছে। ঐরাবতের মতো এই ভাগ্য আর আসে না। এই দুর্ভাগ্যের সময়ে এমন কুষ্ঠী হয়েছে বারবধুও তাকে ঘৃণা করে। সমতটে ফিরে এসে কুন্তকোনমের যুদ্ধে বন্ধু শূরসেনকে সহযোগিতা করে চাঁদ। বন্ধু শূরসেনের মৃত্যু এবং মনসাপূজক চারুদত্তের সঙ্গে কষায়বস্ত্রের সনকার আলাপ ও যোগাযোগ চাঁদের জীবনে হাহাকার নিয়ে আসে। চাঁদ ‘সনকা, সনকা’ বলে হাহাকার করে কাঁদতে লাগে। ডান হাতে বাঁ বুক এভাবে চেপে ধরে যে, যেখান থেকে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরোয়। কিন্তু এই চন্দ্রশেখরের যুক্তিতে মৃত্যু বলে কিছু নেই, মৃত্যুভয়ও তার ছিল না। তাই নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সে নিজেই সম্পন্ন করে। পরে মুংলাকে জাহাজের অধ্যক্ষ করে পূর্ব পশ্চিম, উত্তরদক্ষিণ, উত্তরপশ্চিম জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অনির্দিষ্ট পথে, অনির্দিষ্ট যাত্রায় পা বাড়ায় এই ‘চাঁদবেনে’। পক্ষধরের মুখে ঔপন্যাসিক চাঁদের এই পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে—

“সমতটের সেই চিতা তাহলে নিজের তত্ত্বাবধানে নিজের শেষ সংস্কার করে যাওয়া চন্দ্রশেখরের? জানিয়ে গেলেন, তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধ রইল না? মধুকর নিয়েই বা একা তিনি কোথায় যাবেন? সেই ভূমধ্যসাগরেই কি আবার? কিংবা তাকেও পার হয়ে? অথবা একি নিজের খ্যাতি-অখ্যাতি প্রতিষ্ঠা সব কিছুকে দক্ষ করে ভাগ্যের জন্য কিছু ছুড়ে দেওয়া।”^{১৭}

এইভাবে চাঁদের মৃত্যু হয়েও সে মৃত্যুকে জয় করেছে। জীবনের তরঙ্গে তাঁর পরাজয় ঘটলেও নিজেকে থামিয়ে রাখেনি। সমুদ্রে অনির্দিষ্ট দিকে সে আবার পাড়ি দিয়েছে। তারই নির্দেশে পক্ষধরের তত্ত্বাবধানে চাঁদপুত্র লখীন্দর ও শূরসেন পুত্র শাতনীক পুনরায় মধুলিট জাহাজে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। প্রায় দুশো হাত লম্বা মধুলিট। জলরেখা থেকে আঠারো-হাত উঁচু, পঞ্চাশ জোড়া দাঁড়ের তিন মাস্তুলে নায়-থাক পাল যুক্ত এই জাহাজের অধ্যক্ষ পক্ষধর। ময়ূরপঙ্ক্ষী নয়, ময়ূরের বড় বড় গোল চোখদুটি মাজাঘষায় ঝকঝকে। ফলে কখনো আকাশের, কখনো সমুদ্রের ছায়া ধরে সেই চোখদুটি কখনো চিন্তাশীল, কখনো উত্তেজিত, কখনো বা কুটিল। এই মধুলিট নিয়ে লখাই দক্ষিণে নেমে তাম্রপর্ণী হয়ে, পরে উত্তরপূর্বে এবং স্তম্ভ অঞ্চলে যাবে, মালয়ে শ্রীবিজয়রাজ্যে যাবে সমতটে ফিরবার আগে। তাঁর পূর্বাঞ্চলে যাত্রা চন্দ্রশেখরের নির্দেশে। শাতনীক সমুদ্রে পাড়ি দেয় তার পিতার জারজ সন্তানদের সন্ধানে। সময় কোনদিন থেমে থাকে না। কোন একটি বিরাট সাম্রাজ্যে ধ্বংস হয়ে গেলে আবার নতুন সাম্রাজ্যের অঙ্কুশান ঘটে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় কুন্তকোণভের যুদ্ধের শেষে পল্লব বংশের ধ্বংস ও চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ ও উত্থান পতনের কাহিনির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথ ও পুরাণকথা। ইতিহাস ও পুরাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে উপন্যাসে। মনসামঙ্গলের পুরাণের সরাসরি প্রয়োগ ঘটাতে পারেননি। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে লেখক বিশ শতকে দাঁড়িয়ে উপন্যাস লিখছেন। বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক জীবনযাত্রা অলৌকিক অন্ধকার ও মিথোলজিক্যাল রহস্য মিশিয়ে রূপদৃষ্ট কথাশিল্পীর মতো জীবনকে স্পর্শ করার চেষ্টা। এখানে অমিয়ভূষণ দেশীয় ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধানী। পৌরাণিক আবহ থাকায় বাস্তবতার প্রশ্নগুলি বড় হয়ে উঠে অনেকসময়। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মতো উপন্যাসে রয়েছে চাঁদ সদাগর, সপ্তডিঙা

মধুকর, চাঁদের পুত্রদের মৃত্যু, সমুদ্র বাড়, সপ্তডিঙাসহ চাঁদের হারিয়ে যাওয়া সনকা, লখীন্দর, সর্পপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঙ্গগুলি। ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, পৌরাণিক বা আঞ্চলিক উপন্যাসেই অমিয়ভূষণের ইতিহাস প্রয়োগ অধিক সুপ্রযুক্ত এবং জীবন্তও। আধুনিক মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যর্থতা, ট্রাজেডি এবং এমন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষ যে জীবনযুদ্ধে বা জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে, তা অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নবম-দশম শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এখানে বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য তুলে ধরেছেন, কারণ এমন একজন বণিকের জীবনকথা অঙ্কন করতে চেয়েছেন যে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিতে চেয়েছে, কালকে যিনি অতিক্রম করতে চোয়েছে। মনসামঙ্গলে আমাদের পরিচিত চাঁদবেনে চরিত্রের সঙ্গে দৈবীশক্তির লড়াই, সর্পদেবী মনসা ও সাপের অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিতি। মনসা চরিত্রের সরাসরি নামোল্লেখ না থাকলেও উপন্যাসে সর্পের উল্লেখ আছে অসংখ্যবার। আসলে বিশ শতকের যুগে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের মতো দৈবনির্ভর কাহিনীকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে লেখককে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তবে মনসার প্রসঙ্গটিকে নানা যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে দাঁড় করিয়েছেন।

উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ‘শিব ও সর্প’। চাঁদ ও সনকা নগর ছাড়িয়ে যে শিব-পার্বতীর মন্দিরে যায়, সেখানকার বিগ্রহের পরিকল্পনা দেখে চাঁদের কাছে প্রশংসার বদলে নিন্দনীয় বলে মনে হয়। অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলে ওঠে— “ওটা তো জটা নয়, সাপ। সাপ কেন?” তাঁর মতে, শিবের আকৃতি লিঙ্গরূপ হওয়াই ভালো এবং শিবের গলা পেঁচিয়ে বুকের উপর সাপ দেখে গৌরী সঙ্কুচিত। কিন্তু সনকার মতে, উর্বরাশক্তি সাপের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্টি, আমরা সৃষ্টি। এখানে চাঁদের সর্প-বিতৃষ্ণা দেখানো হয়েছে। কিন্তু সনকার কাছে সর্প ও শিব একাকার হয়েছে। দুইই যেন উর্বরা শক্তির প্রতীক। ‘অলৌকিক সর্প’ নামে উনিশ অধ্যায়ে কোল্লগরের নগরনায়িকা লীলালতিকার গৃহে সর্পপূজা দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছিল চাঁদ। তার মনে হয়েছিল সর্প আসলে ঘৃণা ও ভয়ের বস্তু। সে কখনোই সর্পকে সহ্য করতে পারে না। দপ্তরের বাতায়নের দেওয়ালের কাছে চৌকাঠ পর্যন্ত উঁচু এক ধূসর খয়েরি সাপের রাগে ফণা তুলে কাঁপা, ফোঁপানো এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে চাঁদ বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। তবে তৎক্ষণাৎ বিচলিত ভাব কাটিয়ে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে সাপকে ছায়া বলে উল্লেখ করে। আদিবাসীরা মানুষের মঙ্গলকামনায় এই মনসাপূজা করে থাকে। তবে চাঁদ এই মুহূর্তে মনসাকে কুটিলতা, ক্রুরতা, আর বিষের প্রতীক বলে। সনকার মতে কৃষ্ণবর্ণ মানুষের নষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা পদপিষ্ট অনুভূতির প্রতীক এই সর্প। দময়ন্তী সাপপূজাকে ঐশ্বর্য আদায়ের শক্তির

সঙ্গে সঙ্গে এক পুরাণের গল্প বলে— সর্প জন্মমাত্র গোপালের অহিছত্র, কিশোর গোপাল সাপের মাথায় নাচে। তক্ষশীলায় ঢোকার আগে এক গ্রাম্য-পূজকের কাছ থেকে যে পতঞ্জলির শ্বেতপাথরের মূর্তি পায় বিন চাচ, তার মাথার উপর সাপের পাঁচফণা। সেই সর্পপূজকের মতে সর্প মানুষের মধ্যেই অন্ধকাম রূপে থাকে। সেই অন্ধসর্পকাম থেকেই লোভ, লোভ থেকে ক্রোধ, সেজন্য বিষময় পাঁচফণা তার। আবার সেই অন্ধকাম না থাকলে মানুষের বুদ্ধিই হয় না, যৌবনের গুণপনা আসে না। এই অন্ধকাম জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই তার বিষক্ষয় হবে। এই ঔপন্যাসিক সর্পসংক্রান্ত বিভিন্ন অর্থ তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। তাঁর নিজস্ব ভাবনা চিন্তাগুলিই এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হল—

“Libido কিন্তু Unconscious তো, মনের অংশই যেন মনসা। সেজন্যই তিনি শিবের আত্মজা। পরমজ্ঞান আত্মজা। তার মানে Libido is part of mind, super ego is part of mind সে জন্যই আত্মজা। এই মনসার পূজা করে। আমাদের শরীরের ওই যে বিষ— কাম, ক্রোধ, হিংসা—এই সমস্ত যে মূল শক্তি— Libido, যেটা নষ্ট করলে মানুষ যুবক হয় না, গৌফ ওঠে না, একটা মেয়ে যুবতী হবে না, তাকে বলছি, মা তুমি এসো। তিনি এখন বিষহরিণী। এই পূজা হচ্ছে বাঙালির পূজো। এটা বাঙালির সমন্বয়ের পূজো। হিন্দু-মুসলমান-যোগী সব মিলে একটা সমন্বয় গঠিত হয়েছে। এই মনসার থেকেই পদ্মা। এই পদ্মা-পদ্মিনী নদী বাংলাদেশের প্রাণ। সেই পদ্মিনী, মনসা সব এক।”^{১৮}

এই দর্শনটি উপন্যাসে আরও স্পষ্ট হয়, যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চাঁদ ‘হেস্তাল’ বলে চিৎকার করে ওঠে। প্রাসাদের ঐশ্বর্যসুখ ও বিলাসের মধ্যেও চাঁদের মনকে এক বিপন্নতা ও অমোঘ আঘাতের ভয় গ্রাস করে থাকে। স্বপ্নে সে পত্রহীন প্রাচীন হিজল গাছের ভয়াবহ অন্ধকারময় কোটরে একটা কুৎসিত দর্শন সাপ পিচ্ছিল গতিতে ফণা লুকিয়ে ঢুকতে দেখে। আসলে এই স্বপ্নদর্শনের মধ্যে রয়েছে আধুনিক মানুষের বিপন্নতার যন্ত্রণা ও একাকিত্বের অসহায়তা। চাঁদের মনসাভীতি এখানে সাপ ও হেতালের মাধ্যমে প্রতীকী হয়ে যায়। মনো-বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতিতে এই স্বপ্নদর্শনের বিষয় অর্থবহ হয়ে ওঠে। এখানে চাঁদের গহন মনের অন্ধকারে জমে থাকা সর্পিলা মানসিকতা যেন তাকেই গ্রাস করতে আসে। আবার আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নিজেকে জয়ী করে তোলার প্রচেষ্টা হেতালের রূপকে ভাষারূপ লাভ করে। তাঁর ভয় ও আত্মচিৎকার আসলে মনসার

মতো নিয়ন্ত্রণী শক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করা। উপন্যাসে আবার চিত্রকর তথা শ্রমণ চারুদত্তকেও দেখানো হয়েছে মনসার পূজক রূপে। এই চারুদত্ত ও চন্দ্রশেখরের বাড়ির দাসী সারির মতে, যদি আরো সর্পপূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সমতটে আবার শান্তি ফিরে আসবে। ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসা কাম, কিছু থাকবে না। এইভাবে সেই শান্ত প্রজ্ঞাশীল সমতট আবার বিজয়ী হবে। ঔপন্যাসিক মনসাপুরাণের বিভিন্ন প্রচলিত এই ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। চাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে মনসার উপস্থিতি সর্বত্র থাকলেও তা আধুনিক মনস্ক ব্যক্তির কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য মিথটিকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এইভাবেই ঘটেছে মনসাপুরাণের নবরূপায়ণ।

‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে চাঁদের সুতীর যন্ত্রণা, ভাগ্যের প্রতিস্পর্শী হবার লড়াই, যুগসন্ধিক্ষণের তন্নিষ্ঠ বাস্তব ইন্দ্রজাল রচিত অধিবাস্তবতা, সময়ের মাত্রাবৃত্তে মানবের অসহায়তা, মৃত্যু থেকে নবজন্মের আভাস, সব নিয়ে এক কৌমসত্ত্বার ট্রাজেডি এই পৌরাণিকতার মাত্রাতে বয়ে এসেছে। বাঙালি জীবনের অতীত ও বর্তমান, স্বপ্নভঙ্গের ঐতিহ্য ও অবক্ষয় কেন্দ্রীয় ভাবনা হয়ে এসেছে উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত। চাঁদের ব্যক্তিক বিদ্রোহ ব্যক্তিগত থেকেও সামগ্রিক হয়ে উঠেছে। অতীতচারী থেকেও সমকালীন পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রস্ন ও পুনর্বিবেচনা’ গ্রন্থে এই সূত্রে যা মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

“ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখরকে মেলে ধরেছেন বাংলার বহুবিশ্রুত প্রাচীন সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে। এ বাণিজ্য সংঘটিত হত সেইসব নিভীক দুঃসাহসী ভাগ্য্যেষ্মী সওদাগরদের দ্বারা, যাদের সামনে ছিল বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, জলদস্যুভীতি এবং নানাবিধ প্রশাসনিক বাধা। তবুও এ উপন্যাসের চাঁদ স্বপ্ন দেখেছিল আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের, চেয়েছিল দেশের সকল বণিকদের সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে দিতে। কিন্তু চাঁদের জীবনে দৈব ও দুর্দৈব একত্র সমাপতিত হয়ে স্বপ্ন পুরো সফল হতে দেয়নি। বলা বাহুল্য যে, আমাদের চেনা কাহিনীর ছক ধরে ঔপন্যাসিক আদৌ এগোননি, কেবল চাঁদ ও সনকার নাম দু’টি অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন গল্প ফেঁদে বসেছেন এখানে।”^{১৯}

‘চাঁদবেনে’ মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্য লেখা হয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে, কিন্তু

উপন্যাসে মানবচরিত্রই প্রধান। মানবচরিত্র নিয়েই উপন্যাসের বিস্তৃতি উক্ত উপন্যাসে রয়েছে দু'জোড়া প্রেমের উল্লেখ— চন্দ্রশেখর-সনকা ও শূরসেন-দময়ন্তি। মনসামঙ্গলের পাতিব্রতময়ী, পতিপ্রাণা সতী বেংলার কোন উল্লেখ নেই উপন্যাসে। মনসামঙ্গলের কাহিনিকে আধুনিক যুক্তিবুদ্ধির বাস্তবতায় দাঁড় করাতে গিয়ে নির্মিত হয় নতুন রচনার। পুরাণের মনসামঙ্গল কাহিনী নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে।

অষ্টবসুদের একজন ছিল বলেই তার নামের শেষে বসু যোগ করা হয়, চাঁদবেনে বলে এমন জনশ্রুতি আছে। নইলে উপন্যাসের নায়ককে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর মনে করার কোন যুক্তি নেই। আসলে লেখকের 'চাঁদবেনে' উপন্যাস ভাগ্যের কাছে পরাজিত মানুষের ট্রাজেডির কথা, বাঙালির কৌম-জীবনের মনন কথা। জয়লাভের সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মনসাপুরাণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বজ্রজয়ী চাঁদকে আত্মসমর্পণ করতে হয় নিয়তির কাছে। এখানে তবুও দেখা যায় মৃত্যু হয়েও মৃত্যু হয়নি চাঁদের। সে উত্তীর্ণ হয় জীবনে সময়-দেশ-কালকে অতিক্রম করে। মৃত্যু হলেও জীবিত থাকবে সন্তানদের মধ্যে। উপন্যাসের শেষে চাঁদকে দেখি সমতট থেকে ফিরে আসার পর সনকার কাছে অনুশোচনা করতে—

“আমার, কিছু দিন থেকে ভুল হচ্ছে। অথবা তখনই কি ভুল করেছিলাম?

আচ্ছা সনকা, যে ভালোবাসা সন্তানদের প্রাপ্য। পরস্পরকে ভালোবাসতে

গিয়ে কি তা থেকে তাদের বঞ্চিত রেখেছিলাম? সে জন্যই কি তাদের

তেমন প্রমাণ করতে ইচ্ছা হয়েছিল, তারা আমারই? কিংবা বিরহে

ব্যাকুল হবে বলেই কি সমুদ্রে না গিয়ে তাদের যেতে দিয়েছিলাম?”^{২০}

তবে মৃত্যুকে জয় করার প্রত্যাশা এই চাঁদবেনের। তাই দু'শো হাত লম্বা, পঞ্চাশ জোড়া দাঁড়, তিনটি নয় থাক পালের মধুলিট জাহাজকে আবার চম্পার সমুদ্রে দেখা যায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। উপন্যাসে চাঁদবেনে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জটিলতা, চরিত্রের অন্তর্গত রহস্য ইত্যাদি তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রের নবনির্মাণ করেছেন লেখক। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী মানবিক মূল্যবোধের সংকট তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। আধুনিক জীবনের প্রেমহীনতা, অতীত ঐতিহ্যের বিচ্যুতি তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। অস্তিত্বের সংকটময় ডুবে থাকা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি তার অভিজ্ঞতার জগৎকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এমন এমন এক শিল্পজগৎ-এ, যেখানে সে নিজেই হয়ে উঠতে পারেন একটি ব্যক্তিসত্ত্বাময় মানুষ।

বিষয়বৈচিত্র্যে, স্থান-কালের উল্লেখ, চরিত্র-নির্মাণে, চরিত্রের নামোল্লেখ, ইতিহাসের

বিশ্লেষণে উপন্যাসটি একপ্রকার মহাকাব্যিক রূপ ধারণ করেছে। বাংলা উপন্যাসের পাঁচের দশকের বিভ্রান্তি, সংশয় ও নতুন অনুসন্ধানের পরিস্থিতিতে খুব নিস্তরঙ্গ আবির্ভাব অমিয়ভূষণ মজুমদারের। বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল লিপিকুশলতায় উপন্যাসে যুগের ইতিহাসকে তিনি বিবৃত করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই স্বতন্ত্র ও ধ্রুপদী। তিনি প্লটের মিথোলজিক্যাল বা সার্বজনীন উপাদানটিকে অতিক্রম করেছেন। কাহিনীর একমুখীন ছব্ব ক্রম তিনি আখ্যানে ব্যবহার করেননি। আখ্যানে তিনি বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার নানান ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন— যার সঙ্গে অনেক সময়ই কাহিনীর কালের ক্রমের মিল থাকে না। বাস্তবতাকে তুলে ধরতে গেলে কাহিনী ক্রম বজায় রাখলে ততটা জীবন্ত ভাবে ফুটে ওঠে না। উনত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে চাঁদ বণিকের চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি দিক স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে কালানুক্রমিককে ভেঙে আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে দেখিয়েছেন অনেকসময়। নির্দিষ্ট কোন প্লট নয়, বৃত্তাকার কাহিনীর বুনট নয়, সমতলিক এক কাহিনি পরম্পরা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে ঘটনার সূত্র ধরে অতীতের ঘটনার ‘পূর্বকথন’ (Flash back) দেখা যায়। নতুন কাহিনী রচনা করতে গিয়ে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ-এর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি আবিষ্কার করতে চান সময় স্বভাবের নতুন তাৎপর্য। এইসূত্রে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম—

“দূরত্ব ও নৈকট্যের দ্বিরালাপে গড়ে ওঠে ‘গড়শীখণ্ড’ বা ‘চাঁদবেনে’র মতো উপন্যাসের সময়। কল্পনা তাঁর কাছে ‘অন্তর্ভেদী রঞ্জন রশ্মি, যার সাহায্যে ইতিহাসের নির্মোক অর্থাৎ বহির্বৃত আখ্যান পেরিয়ে তিনি পৌঁছতে চান অন্তর্বৃত জীবনসত্যের মর্মে।”^{২১}

পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় লেখক ‘আমি’ এই পরিচয়ে কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন। গ্রন্থে অধ্যক্ষ পক্ষধর, চাঁদের বন্ধু শূরসেনের কথনে এবং কিছুটা হলেও লেখকের বয়ানে কাহিনী এগিয়ে গেছে। এছাড়া আরবসাগরে গিয়ে চাঁদের কি হয়েছিল তা এরাহিম ও দায়ুদ নামে দু’জন আরবী জাহাজী মাঝা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের কথকতা রীতি, যা মহাভারত থেকে নিয়েছেন। এইভাবে উপন্যাসের প্রকরণের ক্ষেত্রেও তিনি নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের উত্তর-আধুনিক কালপর্বে জীবন ও ঐতিহ্যকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রবণতা, অমিয়ভূষণ মজুমদার তাকেই পূর্ণতা দিয়ে অন্য কাহিনী নির্মাণ করেন। মনসামঙ্গলের নির্দিষ্ট সংকেত নিয়ে নির্মাণ করেন নতুন পাঠকৃতি। তাই উপন্যাসের চরিত্র ‘চাঁদ’ এর ‘মনসা’র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকে না। সে হয়ে ওঠে প্রাচীনকালের তথা দেশ

ও জাতির শ্রীবৃদ্ধির ধারক ও বাহক। ভারতীয় বাণিজ্যের উদগাতা ও ঐতিহ্যের সংগঠক। উপন্যাসের চাঁদ স্বপ্ন দেখেছিল আন্তর্জাতিক অবাধ-বাণিজ্যের, চেয়েছিল দেশের সফল বণিকদের জন্য সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে দিতে। কিন্তু চাঁদের জীবনে দৈব ও দুর্দৈব একত্র সমাপতিত হয়ে স্বপ্ন সফল হতে দেয়নি। লেখক নিজেই জানিয়েছেন যে, উপন্যাসে সরাসরি মনসার সাথে বিরোধ নেই। যদি বিরোধ থাকে তাহলে সেটা ভাগ্যের সঙ্গে, কালের সঙ্গে। ইতিহাসের তদ্বিষ্ঠ গবেষকের মতো তিনি লোকপুরাণের ভিতরকার ইতিহাস উন্মোচিত করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগের ভাষায়—

“‘চাঁদবেনে’, ‘মধু সাধুখাঁ’ প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যযুগের কাহিনীতে আধুনিক

মাত্রা যোগ করে অমিয়ভূষণ বাস্তুবতার মাত্রা সঞ্চার করেছেন।”^{২২}

লেখক সময়ে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে ভেঙে এক যুক্তিবাদী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দোষে-গুণে ভরা চাঁদ চরিত্র নির্মাণ করেন। এই চন্দ্রশেখরকে মনসামঙ্গলে কাব্যের চাঁদবেনে মনে হয় না, সে যেন নবম শতাব্দীর প্রত্ন ভারতবর্ষের এক ট্রাজিক নায়ক। ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত এক অসহায় মানুষের ক্রন্দন আমাদের হৃদয়কে বেদনাসিক্ত করে তোলে। মনসামঙ্গলের পাতায় যে চাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, অমিয়ভূষণের চাঁদ সেই মানুষটি হয়েও আবার অন্য মানুষ। উপন্যাসে চাঁদের চরিত্রস্বভাব, কর্মকাণ্ড, পরিণাম কিছুই মেলে না। তবুও কাহিনির বয়নগুণে চাঁদের আদল ফুটে ওঠে। তার ভিতরে কোথাও যেন রয়েছে মিথ-পুরাণের সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় মানুষটির সজীব উপস্থিতি। পদাতিক মানুষ পথ চলতে গিয়ে লড়াই করে। তাঁর জীবনে সফলতা কিংবা বিফলতা ছেয়ে ফেলে। মানুষের ভেতরেই কথা বলে ওঠে কাল ও সময়ের কণ্ঠস্বর। মানবযন্ত্রণা ও কান্নার কলতান বুকে নিয়ে এক বণিক কাহিনি জীবন ও সৃষ্টির নব যোগসূত্র রচনা করেছে। ইতিহাস পুরাণের মিশ্রিত এই উপন্যাসে জীবন ও জীবনের গভীরবোধ আমরা পাই। তাতে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নবরূপায়ণ। সেই সঙ্গে কতগুলি অনুষঙ্গ যেমন— চাঁদ বণিকের নাম চন্দ্রশেখর বসু, কন্সজ-চম্পা-মালয়-উপদ্বীপ-সিংহল-বঙ্গোপসাগর, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বন্দরের নাম, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চাঁদপুত্র-সাগরদত্ত, বিজয় ঘোষের ও লখাই-এর বাণিজ্যযাত্রা, নটী লীলালতিকা-নগরনায়িকা ক্ষিরোদসম্ভবা-চিত্রসেন-ভৈরবীর গল্প, শূরসেন-দময়ন্তীর গল্প, চন্দ্রশেখরের তাঁতী সংগ্রহের গল্প, চন্দ্রশেখরের যৌথ বাণিজ্য ও নতুন ধাতু আবিষ্কার উপন্যাসটিকে নতুনত্ব দান করেছে। আলোচনার পরিসমাপ্তিতে সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

“এখানে মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনি তথা পুরাণ ও মিথের অনুবর্তন নেই,

রয়েছে মঙ্গলকাব্যের সময়কার বিস্তৃত ইতিহাস। ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, তথা পূর্ব দ্বীপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্র। সেখানকার জনপদ ও সমাজ ইতিহাসের বৃহৎ প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করে লেখক সুগভীর ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।”^{২০}

পরিশেষে বলা যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রকে মূখ্য হিসেবে গ্রহণ করে তৎকালীন অস্থিরতাময় ও সংকটময় সময়ের মানুষের সত্যের পথে যাত্রাকে তুলে ধরেছেন। এই পথে চলতে গিয়ে অশুভ শক্তির নানা বাধা-বিপত্তি আসলেও থেমে থাকেনি উদ্দেশ্য থেকে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক ইতিহাস, যা উপন্যাসটিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অতীত ঐতিহ্যের ইতিহাসকে তুলে ধরে কল্যাণময় দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এইভাবে মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নতুনভাবে। এইদিক দিয়ে তাঁর ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসটি মনসা-কথার আধুনিক রূপায়ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন সাহিত্য তথা প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে যে নতুন আখ্যানবিশ্ব তৈরি হয় তা কথাসাহিত্যের জগৎকে করে তোলে সাংকেতিকময়, গভীর ও সর্বসঞ্চারী। স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে যে স্বপ্নরোপণ ও স্বপ্নভঙ্গের কালপর্বটি বাংলা সাহিত্যে বারে বারে গুরুত্ব পেয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদের আগ্রাসী মনোভাব যখন আমাদের আদর্শ, বিশ্বাস ও চিন্তার জগৎকে গ্রাস করে তখনই মনের মধ্যে তৈরি হয় নিরাপত্তাহীনতাবোধ অস্তিত্বের সংকটই শুধু নয়, ছিন্নমূল মানসিকতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ এই আমরা। এই সার্বিক সংকট থেকে মুক্তিকল্পে কেউ কেউ হয়তো এককভাবেই নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যান। অনেক সময় এই একক সংগ্রামে এগিয়ে চলা মানুষটা ভেতরে ভেতরে নিঃস্ব হয়ে পড়েন, নিজের কাছেই পরাজিত হয়ে আবার নতুন পথের অন্বেষণে যাত্রা। সত্যপ্রিয় ঘোষ (১৯২৪-২০০৩) ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ (১৯৯৯) উপন্যাসে এমনই এক মানুষের কথা বলেছেন অন্তরের তাগিদ থেকে।

উপন্যাসিক সত্যপ্রিয় ঘোষ প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের নির্মাণ না করে দেশভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়া মানুষের বেদনা নিয়ে কঠিনতম সময় অতিক্রম করতে চাওয়া এক মানুষের এগিয়ে চলার কাহিনি অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এক হতাশাগ্রস্ত মানুষের নতুন

স্বপ্ন গড়ার মধ্য দিয়ে। এখানে রমানাথ বাবু চাঁদ সদাগরের চরিত্রকে অবলম্বন করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চান। তাই তিনি নতুনভাবে থিয়েটার গড়ার কথা ভাবেন। উপন্যাসের শুরুতেই দেখি রমানাথের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। মশার কামড়, পিঁপড়ের কামড় ও ছারপোকাকার কামড়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় প্রাণপণে চেষ্টা করেন ঘুমানোর। কারণ দেবী মনসার মতো তিনিও পুজো পাচ্ছেন না, কিন্তু পেতে হবে। তাই দেবী মনসার মতো তিনিও ঘুমোতে চান। এই ঘুমের রাজ্যেই আছে কালীদহের তীর, আছে চম্পকনগর, আছে সাঁতালী পাহাড়, আছে ধনুন্তরী। আশা রাখেন নতুনভাবে স্বপ্ন দেখার মধ্যে তিনি আরো ফিরে পাবেন সেই স্বপ্নলোক, যেখানে আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে, হাসি আছে, বিশ্বাস আছে, আত্মীয়তা আছে এবং সবাই মিলে নবাবের উৎসব আছে। কিন্তু ঘুম না আসায় নিশুতি রাতের সেই পচা অন্ধকারের মধ্যে রমানাথ কাঁদতে থাকেন। অন্ধ রাগের জেরে বুক ফাটিয়ে তাঁর কাঁদতে ইচ্ছে করে। এই কান্নার জেরে গোটা জগৎসংসারের চোখে জল আসুক, এই দয়াহীন, মায়াহীন মানুষগুলি শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা বাদ দিয়ে জীবনভর স্বপ্নের ফেরিওয়ালা এই হতভাগা মানুষটা কী বলতে চায় তা সবাই একটু খেয়াল করুক।

উপন্যাসে দেশভাগ, তজ্জনিত অস্থিরতা, উদ্বাস্তু হয়ে বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে ছিন্নমূল মানসিকতা তৈরীর যন্ত্রণা, নতুন করে বেঁচে ওঠার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। একই সঙ্গে সন-তারিখ ধরে গত শতকের চারের দশকটি কাহিনীতে বিস্তৃত হয়েছে। সেই সময়ে বাস্তব সমস্যা ও সংকটের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়েছে রমানাথ। দশটি অধ্যায়যুক্ত এই উপন্যাসে রমানাথের জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সাধনাদের পরিবারের চিত্রও উঠে এসেছে। ছয় ভাই ও এক বোন নিয়ে বনেদী বংশের সন্তান রমানাথ কলেজে পড়তে এসে সাধনাদের পরিবারের একজন হয়ে ওঠেন। সাধনার পিতা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় এবং প্রায় ডুবে যাওয়া সংসারের হাল ধরেছেন। পরে আবার দেশভাগের সময় এপার বাংলা আসার মুহূর্তে রমানাথই সাধনাদের পরিবারের অভিভাবক হয়েছিলেন। সাধনার পরিবারে পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে বড় ছেলে নরেন্দ্রখোকা নিরুদ্দেশ হয়, মেজো বোন বিন্দা সাতদিনের জ্বরে মারা যায়। বর্তমানে বোন অর্চনা, ভাই বরেন, স্বামী কেশব ও অজিত-সুজিত দুই ছেলে নিয়ে সাধনার ভরা সংসার। দেশভাগ জনিত কারণে একটি পরিবার কীভাবে অন্য এক দেশে উদ্বাস্তু হয়ে স্টেশনে জীবনযাপন করে এবং করে সকলে মিলে দেড়খানা ঘরে বসবাসের যে বিচিত্র জীবন তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রমানাথকে মুখোমুখি হতে হয় ছেচল্লিশের দাঙ্গার। দেশ ভাগ হওয়ার সময় পঞ্চাশের দশকে বরিশালের ঘর-বাড়ি সর্বস্ব ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কলকাতায় আসেন। শিয়ালদহের স্টেশনের প্লাটফর্মে দেড় মাস কাটিয়ে মেছোবাজারের পাঁচতলা বাড়ির দেড়খানা ঘরে আশ্রয় নেয়। দাঙ্গা-দেশভাগের ক্লোদন্ত অন্ধকারের বিষক্রিয়ায় ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্ন বপন করে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি সমস্ত মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে লোকায়ত শেকড়ের সন্ধানে যাত্রা করেছেন, নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে। আর এই পথ অতিক্রম করতে করতে নিজেকে চাঁদ সদাগর বলে মনে করেন—

“আমার আয়ুরেখাটি চাঁদ সদাগরের মতোই দীর্ঘ। সপ্তডিঙা মধুকর বাড়বৃষ্টি

তুফানে মনসা ডুবিয়ে দিল দিক না, আবার সব হবে, বেহুলা কি সত্য নয়?

আমি যদি হই চাঁদ সদাগর, আমার জীবনে বেহুলা কি আসবে না?”^{২৪}

নিজের সংসার নেই, তাই চাঁদের পুত্রবধূর মতো বেহুলা তাঁর জীবনে আসবে না বলে হতাশায় জর্জরিত হয়। শুধুমাত্র সাধনাদের পরিবারে মাঝিগিরি করেননি। আরো অনেক পরিবারকে নিজের সঙ্গে একাত্ম করেছেন। বর্তমান জীবনে ভাঁটার টান থাকলেও জোয়ার আসবে। এই জীবনের নদী পার হতে গেলে একা চললে হবে না, স্বার্থপরতা তাঁর দু’চোখের বিষ। তাই সবাই মিলে কোমর বেঁধে উজানের দিকে যেতে হবে। সাধনাদের ঘাটে বিস্মৃতির ঝড় উঠলে সেখান থেকে নোঙর তুলে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবেন। শেষে ঘুম না আসায় নিজের দেখা স্বপ্নসুখ থেকে বঞ্চিত হলে বদ্ধ উন্মাদের মতো দুহাতের দশটা আঙুল দিয়ে দশটা ধারাল নীল নখ দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। তখন যেন তিনি মনসার কোপে কালীদেহের কালো জলে বজ্রপাত ও তুফানে বিধ্বস্ত সপ্তডিঙা মধুকরের সলিল সমাধির পর জলমগ্ন মুমূর্ষু চাঁদ সদাগর। কিন্তু আটচল্লিশ বছরের পৌঢ়, অকালে বুড়িয়ে যাওয়া অসহায় রমানাথ মনের মধ্যে আবার ফিরে পেলেন স্বর্গ। স্বপ্নের সেই প্রবাল দ্বীপ যেখানে তাঁর জন্য একটি সাতমহলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, যেখানে তিনি এক আশ্চর্য সুন্দর সংসার সাজাবেন সমস্ত আত্মীয়কে একান্নবর্তী করে নবান্ন উৎসব করবেন।

পরপর তিনবার বি.এস.সি ফেল করার কারণ হিসাবে তাঁর নাটক ও থিয়েটারের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণকে ধরেছেন উপন্যাসের নায়ক রমানাথবাবু। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় হঠাৎ করে বাংলার রাজধানী কলকাতায় বেড়াতে আসেন। সেখানে নিজ গ্রামের হারান ঠাকুর (প্রবোধচন্দ্র গুহ) আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারি, তাঁর কাছ থেকে ফ্রি-পাশ

নিয়ে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে মন্মথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’ নাটক দেখেন। চৌদ্দই সেপ্টেম্বর ‘চাঁদ সদাগর’-এর প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে চাঁদ সদাগরের তেজ, সর্বস্ব হারিয়ে তা ফিরে পাওয়ার লোভেও মনসারূপী অপদেবতাকে পূজা করবেন না প্রতিজ্ঞা করে তিনি পূজা দিয়েছেন শিবের, তাঁরই আগুনে পুড়েছেন। রমানাথও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পূজা দিয়ে চলেছেন। এমন থিয়েটারকে পূজা দিবেন যেখানে আদর্শ আছে, তেজ, আছে এবং তা দিতে হবে নতুন প্রজন্মকে। এই সূত্রে রমানাথবাবু তাঁর থিয়েটার জগতে পদার্পণের ইতিহাসকে তুলে ধরেন। ১৯৩০ সালে তিনি থিয়েটার জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু এর বীজ পোতা হয়েছে তার তিন বছর আগে। ১৯২৪ সালে সাইমন কমিশনের আগমনের প্রতিবাদে ফ্রেঞ্চয়ারি মাসে সারা বাংলায় যখন আন্দোলনের জোয়ার চলছিল, বরিশালের পথে পথে রমানাথ গান গেয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। ১৯২৯ সালে বানারি পাড়া গ্রামের থিয়েটারে কালীপূজোর অভিনয়ের দায়িত্ব নেন। পটুয়াখালি শহরের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রভাব এই বানারি পাড়াতেও পড়েছিল। তরুণ রমানাথ অভিনয়ের দায়িত্ব পালনে জীবন পণ করেছিলেন। বড়োদের নাটক প্রতাপাদিত্য, সেই সঙ্গে সেই ঘোষের বাড়ির স্টেজেই শুধু ছোটদের দিয়ে নাটক ‘চাঁদ সদাগর’। পরের বছর এই ‘চাঁদ সদাগর’ বরিশালে নামানোর জন্য উঠে পড়ে লাগেন রমানাথ। সেই সঙ্গে তাঁর বি.এস.সি. পরীক্ষাও কালীদেহের অতলে বার বার তিনবার তলিয়ে যায়।

নাটকের ভবিষ্যৎ ছোটদের হাতেই, একথা বিশ্বাস করেন রমানাথের পথ প্রদর্শক প্রবোধচন্দ্র গুহ। যিনি বানারিপাড়াতে ‘লিলি থিয়েটার’ নামে কিশোর নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বরিশাল জেলার এই বানারিপাড়ার গ্রামকে এক পীঠস্থানে পরিণত করেছিল। সেখানে এই কিশোর নাট্যদলের ভূমিকা ছিল অনিবার্য। নাটকের পর নাটকের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের বীজগুলি কিশোরদের মনের গভীরে রোপিত হয়েছিল। আর রমানাথ এই কাজ নিজের জীবনে তুলে নিয়েছেন, ব্রতী হয়েছেন যেন। কিন্তু এখনকার ব্যস্ততাময় যুগে কারো হাতে সেরকম সময় নেই। তাই তিনি ভোরবেলায় দেখা স্বপ্নটিকে অবলম্বন করতে চান। সমস্যা অনেক, কাজ অনেক কিন্তু পথ মাত্র একটাই। বিধাতা স্বয়ং তাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন স্থির বিশ্বাস নিয়ে আবার একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে। রমানাথের মতে—

“এই ভঙ্গ বঙ্গে, এই দেশজোড়া ধ্বংসের মধ্যে, বেঁচে উঠার উপায় যদি বার করতেই হয় তাহলে এই বাচ্চারাই ভরসা, নিউ জেনারেশন কী যেন বলে সাধু বাংলায়? নতুন প্রজন্ম, ঠিক, এদের দিয়েই গড়ে তোলা সম্ভব স্বপ্নের

প্রবাল দ্বীপ। একটা নাম চাই। তাঁর পছন্দ ‘শিশু নাট্যনিকেতন’, কিন্তু দাদা বলেছেন দে ‘শিশুরঙ্গ’।”^{২৫}

আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় রমানাথ ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্তাল— যেমন সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে আন্দোলনের জোয়ার, বরিশাল জেলার বানরিপাড়ার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, পটুয়াখালি শহরের দাঙ্গা প্রভৃতি বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হন যা তাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এই স্বদেশ প্রেমের আবেগই তাঁর থিয়েটার জগৎ ও নাটকের মূলমন্ত্র। দেশের টানই তার থিয়েটারের আদর্শ ও তেজ বানিয়ে ফেলেন। তাই তিনি ‘চাঁদ সদাগর’ নাটককে অবলম্বন করেন দেশের খুদে শিল্পীদের স্বদেশের কাজে নিয়োগ করতে। এই নাটকে চাঁদ সদাগরের বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা, সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস রমানাথকে কিশোর বয়স থেকেই মোহিত করে, যা তিনি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিস্তারিত করতে চান। তাই তাঁর স্বপ্নাদেশটিতে আবার চাঁদ সদাগর নিয়েই নামতে বলা হয়েছে। তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই। ‘চাঁদ সদাগর’-এর পর ‘বিসর্জন’ তার পরে ‘সীতার বনবাস’, তার পরে ‘কর্ণ’— এরকম আভাস আছে স্বপ্নে। তিনি অজ্ঞাত কুলশীল গুটিকতক ছেলেমেয়ে নিয়ে এমন নাটক জমাতে চান রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে, যা দেখে সারাদেশ অভিভূত হয়ে থাকবে বাণিজ্যিক থেকে তিনি ‘শিশুরঙ্গ’ গঠন করতে চান না, তবে এর থেকে যদি একটা আর্থিক বুনியাদ তৈরি হয়েও যায়, তাহলে সেটা বিপুলায়তন পরিকল্পনা করে সকলের জন্য সেটা কাজে লাগাবেন, শুধু একার জন্য নয়। তাই রমানাথ স্বপ্ন দেখে গড়ের মাঠে টি আর কলকাতায় মার্বেল প্যালেস করতে। তাই যৌবনের ‘চাঁদ সদাগর’ পরিচালনার বিন্দার মতো মনসা ও অশ্রুর মতো বেহুলা না পাওয়া গেলেও হাল ছাড়েননি। নতুনভাবে সে খুঁজে নিতে চায় যোগ্য মনসা, বেহুলা, চাঁদ সদাগর ও অন্যান্য চরিত্রগুলি।

তৎকালীন সময়ে বাংলা নাটকের যে দিকবদল দেখা গিয়েছিল তা উপন্যাসে উঠে এসেছে। তেতাল্লিশের মে মাসে কলকাতায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হলে ‘নবান্ন’র (চুয়াল্লিশ সালের অক্টোবর মাস থেকে) মতো নাটক কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলায় বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মানুষকে গণশক্তির উদ্বোধনের মন্ত্রে মাতিয়ে তুলল। বাংলা নাটকের এই নবযুগের সূচনায় অবসানের ঘন্টা বেজেছিল তার পূর্ববর্তী প্রায় সাত দশকব্যাপী গতানুগতিক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকগুলির, যা রমানাথবাবুর কাছে একেবারে পছন্দের বিষয় ছিল না। পশ্চিমা নাটকের ভাব অবলম্বনে যে আধুনিক নাটকের সৃষ্টি। সেখানে নায়ক-নায়িকার অভিনয় ছাড়িয়ে দলগত অভিনয় প্রাধান্য পায়। চরিত্র ও সংলাপের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। কতকগুলি লোক স্টেজে আসছে।

কথা বলছে। চাঁচামেচি করছে, স্ট্যাচু হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ফ্রিজ হয়ে যাওয়া যাকে বলে। আবার মুখ খুললে কি সব কথা বলে যায়, যার অর্থ বোঝা যায় না। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও জানে না তাদের অভিনয়ের অর্থ কি। সবই যেন হিং টিং ছট। রমানাথের মতে, স্টেজের জাত মারা যাচ্ছে। অথচ এই স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে কি না করা যায়। অদ্ভুত এই বর্তমানের সময় ও সমাজ। বর্তমান দুনিয়াটা অচল হয়ে যাচ্ছে, রক্তচলাচল যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকের শেষ দৃশ্য, হাহাকারের শেষে সবাই মিলে আবার নবান্ন উৎসব করছে। তাঁর কাছে এটি বেষ্ট সিন। শেষের যে ছড়াটি বা মন্তব্যটি তাঁর নাটকে ঢুকিয়ে দিবেন বলে স্থির করেন। তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ নাটক তাঁর কাছে প্রশংসনীয়। রহিমুদ্দী ও ফুলজান চরিত্রের অভিনয় তাকে মোহিত করে। গোবিন্দ ও হাকিমুদ্দী চরিত্রও। নাটকের গানগুলিও যেন হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। দুর্ভিক্ষতড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা চালানোর প্রয়োজনে রমানাথের মতো লোকেরা নাটক চালিয়ে পিপলস্ রিলিফ কমিটির তহবিলে অর্থদান করে। তবে বরেনের মতো প্রগতিশীল বস্তুবাদী বিচারবুদ্ধি মানুষ নতুনত্বের দিশারী, রমানাথের দেশের শিকড় ধরাতে বিশ্বাসী নয়। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলা নাটকের গতিপথের পরিবর্তনটি চিহ্নিত করেছেন লেখক—

“প্রায় সাত দশকব্যাপী গতানুগতিক যে সব পৌরাণিক, ঐতিহাসিক আর সামাজিক নাটকগুলির আবেগসর্বস্ব অলীক স্বপ্নচারিতা, তার মধ্যে বরেন রমাদার ঐ চাঁদসদাগরকে আস্তাকুঁড়ে নিষ্ক্ষেপযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিল।”^{২৬}

বনেদী পরিবারের সন্তান রমানাথ ছিল রসায়নের ছাত্র। গুরু ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অবশ্য তাকে দেখেননি কোনদিনও। বই পড়েই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এ.পি.সি. রায়ের ‘বাঙ্গালীর মস্তিস্ক ও তার অপব্যবহার’ বইটি পড়ে তিনি মস্তিস্কের ব্যবহার শিখলেন। ‘অন্নসমস্যায় বাঙ্গালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার’ পড়ার পর প্রথমেই তৈরী করলেন সাবান, কাপড় কাচা সাবান, তারপর একে একে দাঁতের মাজন, আলতা, মাথার তেল, ধূপকাঠি, স্নো, পাউডার, কুমকুম, লিপস্টিক, নেল পালিশ, জুতোর পালিশ ইত্যাদি তৈরির কাজে লাগেন। তারপর জে-বি-ডি কালি গোটা বঙ্গদেশ এবং তার বাইরের বিখ্যাত সেই কালি তৈরীর কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। এইভাবে আমরা দেখি রমানাথ দেশের স্বদেশীকতাকে গ্রহণ করার আন্দোলনে মেতে উঠেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখি রমানাথের সঙ্গে তাঁর শিষ্য অর্থাৎ সাধনার স্বামী কেশব চাঁদ সদাগর নাটকের অভিনয় নিয়ে যথেষ্ট তৎপর। সে নিজে রমানাথকে উৎসাহিত করে ‘চাঁদ সদাগর’কে

কেন্দ্র করে দেশের স্বপ্ন পূরণ করতে। কেশবের দুই ছেলে অজিত ও সুজিতও নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত। কিন্তু নাটক নিয়ে রমানাথকে মনমরা অবস্থায় দেখলে কেশব তার স্ত্রী সাধনাকে এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। রমানাথের লিখিত ‘চাঁদ সদাগর’-এর খাতা হারিয়ে গেলে কেশব সাধনাকেই দায়ী করেন। কেশব এই সময় সাধনাকে চেঙমুড়ি কানী বলে মনে করেন। কারণ রমানাথের থিয়েটারের পথে সাধনা যেন বাধাস্বরূপ। লেখকের ভাষায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে—

“ঐ সব করতে করতে কেশব তার বউকে মনে মনে চেঙমুড়ি কানী বলে
গাল পেড়েছে, কেননা চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর যেমন মনসা
কালীদহে তুফান তুলে ধ্বংস করেছে তেমনি কেশবের ধারণা রমাদাকে
তলিয়ে দেবার জন্যও দায়ী এই রমণী, সুতরাং সেও চেঙমুড়ি কানী
ছাড়া আর কি।”^{২৭}

রমানাথের থিয়েটারকেন্দ্রিক জীবনকে কেন্দ্র করে আবার উঠে আসে সাধনার নিজস্ব কথনে তার জীবন কথা। একসময় যে রমানাথ তাদের পরিবারের হাল ধরেছিলেন। এই মানুষটিকে সাধনা চেয়েছিল জীবনসঙ্গী করতে। কিন্তু থিয়েটার নিয়ে মাতুয়ারা এই উদ্ভট ব্যক্তিত্বের কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। সাধনার অনেক সময় মনে হত রমাদা তার বোন বিন্দাকেই পছন্দ করে না তো। শেষে রমানাথের শিষ্য কেশবের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে শুরু করল তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। এই কেশবই একসময় ক্যাবলার মতো ঘাঁড় গুজে তাকে বিয়ে করে। প্রায় তেরটি বছর হয়ে গেল তাদের বিবাহিত জীবনের। এখনও রমানাথকে আদর্শ হিসেবে দেখেন। তাই রমানাথ তাদের সংসারে থাকলেও তাকে নিয়ে কেশবের কোন বিকার নেই। কিন্তু সাধনার প্রায়ই মনে হয় রমাদা তাদের মধ্যে একটা দুর্গহের মতো। এখানে থাকলে রমানাথ কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না। তাঁর মেজদার জন্য যেখানে বাড়ি ভাড়া নিবেন সেখানে গিয়ে থাকুক না করুক জয়েন্ট ফ্যামিলি ও নবান্ন উৎসব। নিজের ছেলেদুটোকে মানুষ করার জন্যও চিন্তিত সাধনা। কেশবও তাঁর ভক্ত। রমাদাকে না সরাতে পারলে কেশবকে দিয়ে বেশি টাকা উপার্জন করানো যাবে না। তাছাড়া সবসময় মুখের কাছে থাকে লোকটা— সাধনাও তো মানুষ। যদি কিছু হয়ে যায়।

কিন্তু রিহাসালের আসর রমানাথ সাধনার ঘরেই বসায়। রমানাথ তার শিশুরঙ্গকে ‘কন্সিনেশন অফ অল’ বলে উল্লেখ করেছেন ‘আর্ট প্লাস, ফিলজফি প্লাস, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড বিজনেস। আর সবকিছুর ম্যানেজমেন্ট থাকবে বাচ্চাদেরই হাতে। ফ্রম জুতা সেলাই টু চণ্ডীপাঠ। প্রথম পর্যায়ের দিকে বড়োরা

উপদেশ দিলেও বেশিদিন তারা থাকতে পারবে না। কারণ তিনি এই শিশুরঙ্গকে একেবারে শুদ্ধ করতে চান। কোনোরকম ভেজাল তার মধ্যে থাকবে না। একেবারে পিওর পলিটিক্স আদর্শ স্টেটের ‘ফর দি পিপল, অব দি পিপল, বাই দি পিপল’-এর মতো ‘ফর দি চিলড্রেন, অব দি চিলড্রেন, বাই দি চিলড্রেন’।

রমানাথ নিজেকে মস্তুরজ্জু বাসুকি মনে করেন। সবাই মিলে তাকে পাক দিয়ে যাচ্ছে; যৌবন থেকে বাসুকির মতো তারও সহ্যশক্তি কমে গেছে যেন। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে যেন তাঁর ফাঁদে নিরুপায় মহাদেব। চাঁদ সদাগরের মতো নিজেকে অসহায় ব্যক্তি মনে করেন। রিহাসালের সময় হঠাৎ চাঁদ সদাগরের সংলাপ বলতে থাকেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে—

“এ আমাদের পরাজয় নয়। এ আমাদের পরাজয় নয়। ওরা কাপুরুষ। ওরা উপর্যুপরি বিপদপাতে দুর্বল। তুমি তো ভীষ্মের দেবতা নও, কাপুরুষের—”^{২৭}

আস্তে আস্তে শিশুরঙ্গের এই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা রমানাথ ঘোষ অনেক মাত্রায় বেসামাল হতে লাগলেন। হঠাৎ করে কেশবের অসুস্থতা, বাচ্চাদের পরীক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে তাঁর শিশুরঙ্গের ভীত আলগা হতে লাগল। তবুও দেখা যায় স্বপ্নের ফেরিওয়ালা রূপে সমস্ত আঘাত ও অপমান সহ্য করে তিনি নিজের তৈরি পথে চলতে থাকেন। সেখানে একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান। সমস্ত মানুষকে নিয়ে নবান্নের উৎসবে মেতে ওঠার স্বপ্ন গভীর হয়ে ওঠে। মঞ্চে ‘চাঁদ সদাগর’ নাটক মঞ্চস্থ করে তাই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ঔপনিবেশিক অপদেবতা চেঙমুড়ি কানীদের মুনাফার লোভের কাছে মানুষ হার মানবে কেন? কেনই বা তারা শুধু পূজা দিয়ে নিঃস্ব হবে, বা রাজ্যহারা, পুত্রহারা ও স্বপ্নহারা হবে। সপ্তডিঙা ডুবিয়ে দিয়েছেন যে মনসা, এ যুগের চাঁদ রমানাথ সেই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধেই একক সংগ্রাম করে সব ফিরিয়ে আনতে চান। এই ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে বিভোর রমানাথ যখন লক্ষ্যপথে যাত্রা করেন তখন এই কাহিনী আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে বিশ শতকের মানুষের সংগ্রামের প্রজ্জ্বলিত শলাকা।

সত্যপ্রিয় ঘোষ মনসামঙ্গল কাব্যের পুরোপুরি নির্মাণ করেননি। এখানে দেশভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়া মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে কঠিনতম সময় অতিক্রম করতে চাওয়া এক মানুষের এগিয়ে চলার কাহিনী। তবে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলিত মিথকে নতুন করে আনার প্রচেষ্টা দেখা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রমানাথ নিজেকে অনেক সময় চাঁদ সদাগর ভাবেন। তাই মন্থথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’ নাটক দেখে চাঁদ চরিত্রকে নিজের জীবনের আদর্শ বলে মনে করেন—

যা উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁকে দেখা যায় বেহুলার সন্ধানে প্রয়াসী, যে তাঁর জীবনে সমস্ত আনন্দ ফিরিয়ে দেবে। অনায়াসেই পাড়ি দেবে কালীদহের মধ্যে অর্থাৎ সমস্যাদীর্ঘ মানুষের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। এই বেহুলা এমন এক দেশের সন্ধান করবে যেখানে ঘুম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই। সেই অমৃতের দেশ খোঁজ করবে। একবার তিনি ‘চাঁদ সদাগর’ নাটকের নাম বদলে রাখেন বেহুলা। আবার কেশবের মতে, মনসামঙ্গলের মনসা যেমন চাঁদ সদাগরের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি সাধনাও যেন রমানাথের লক্ষ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলের মিথ অতি সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে। তৎকালীন সময়ের বিচিত্র, দুর্বোধ্য ও অর্থহীন গতিতে ক্লান্ত রমানাথ চাঁদ সদাগরের পৌরুষের মধ্যে খুঁজে পান অপ্রতিরোধ্য শক্তি। তাই শিশুরঙ্গ নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করে চাঁদ সদাগরের গল্পকে আবার নিজের মধ্যে আন্তীকরণ করতে চান। আসলে বিশ শতকের মানুষের সংকট ও তাকে অতিক্রম করতে চাওয়ার মধ্যে যে নিরন্তর সংগ্রাম, লেখক তাকেই বাস্তবায়িত করেছেন। সুদীর্ঘ এই উপন্যাসের বিস্তৃত অংশে সেকালের চাঁদের নবমূল্যায়ন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জহর সেনমজুমদার তাঁর ‘সত্যপ্রিয় ঘোষ স্বপ্ন ও শিকড়ের সন্ধান’ গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

“সেকালের চাঁদকে আন্তীকরণ করে, সেকালের চাঁদকে deconstruct করে, রমানাথ চেয়েছেন সত্যভ্রম থেকে নিজেকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও মুক্ত করতে। অপাবৃত্ত জীবনসন্ধানী রমানাথ তাই দাঙ্গার মধ্যে শেষ হয় না, দেশভাগের মধ্যে শেষ হয় না, মনসার সৃষ্টি করা চোরাবালিতে তলিয়ে যায় না।”^{২৯}

রমানাথ দাঙ্গা-দেশভাগের ক্লৈদান্ত অন্ধকারের বিষক্রিয়ায় ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্ন বপন করে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি সমস্ত মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে লোকায়ত শেকড়ের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। এই স্বপ্ন ফেরি করতে যাওয়ার শক্তি তিনি মনসাপুরাণের কাছ থেকেই পেয়ে যান। তাই তিনি আবার সব হবে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর এই ‘আবার সব হবে’ এই আশাবাদ সমগ্র উপন্যাসের আপ্তবাক্য হয়ে ওঠে। কলেজ ছাত্র রমানাথ সাধনাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠলেও নিজেকে সেখানে হারিয়ে দেননি। ইচ্ছে করলে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো স্থূল জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে সাধনাকে বিবাহ করে তার প্রত্যাশার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন। পরিবর্তে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নিতান্ত সাধারণ চাকরি জীবনের কাম্য নিশ্চয়তা থেকে সরে নাটকের মতো সৃজনশীল

জগতের দিকে যাত্রা করে নতুনতর বোধে উপনীত হতে চেয়েছেন। এই নতুনতর বোধের জগতে পৌঁছানোর জন্য রমানাথ মনসামঙ্গলের আইডিয়ার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েছেন। এবং চেতনার উত্তরণ ঘটিয়ে নতুন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সপ্তডিঙা মধুকর তলিয়ে গেলেও আবার তা উঠে আসবে, মনসার প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চাঁদ হয়ে উঠবে অপরাজেয়। রমানাথের জীবনদর্শন তাই স্বাভাবিক ভাবেই সাধনাদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। মূলত নাটক এবং নাট্যবিষয়কে দৃঢ়তার মধ্যে ধরেই পূর্ণ হয়েছে রমানাথের মনোভূমি। চাঁদসদাগর নাটকের স্বপ্নই তাকে অতীত ও বর্তমানের সীমারেখার মধ্যে দাঁড় করায়। এই স্বপ্নের আত্মীয়করণের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেই ‘চাঁদ’ হয়ে ওঠেন। উপন্যাসে একের পর এক পক্ষ বিস্তার করতে থাকে কালীদহের তীর, চম্পকনগর, সাঁতালী পাহাড়, ধনুত্তরি ওঝা, বেহুলা ও মনসার অভিব্যক্তি।

‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ রমানাথ বাবু একসময় নিতাইচরণের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তিকে উপেক্ষা করে তৈরি করতে চান ইতিহাস। তাই রবীন্দ্রনাথের যেমন বিশ্বভারতী, পি সি রায়ের যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল, শ্রীঅরবিন্দের যেমন পণ্ডিচেরী আশ্রম, তাঁরও তেমনি শিশুরঙ্গ। কিন্তু তার এই স্বপ্ন একসময় ভেঙে যায়। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় চাঁদ সদাগরের ভূমিকাপ্রাপ্ত ছেলেটি অনুপস্থিত থাকায় রমানাথ তাঁর ভূমিকায় সংলাপ বলতে গিয়ে নিজেই ভুলে যান। আসলে কিছু লোক রমানাথকে দোষারোপ করে কূটনৈতিক লোক ঠক, প্রবঞ্চক বলে। শিশুরঙ্গের পরিকল্পনা নাকি একটা ব্যবসাদারী, বাচ্চাদের নাচিয়ে তাদেরই নামে দু-পয়সা কমিয়ে নিতে চায়। অন্য সব ব্যবসায় বারে বারে ফেল মেরে, লোকসান দিয়ে হালে পানি না পেয়ে শেষে নাটক নিয়ে পড়েছে বলে অনেকের মন্তব্য। তাঁর পেছনে জমা হয়েছে অনেক লোক, এমনকি সাধনাও। হাতসর্বস্ব উন্মত্ত চাঁদ সদাগরের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ান নিঃস্ব মনে। রাস্তা ভুল করে কোনরকমে উঠে আসেন সেই মেছোবাজারের পাঁচতলা বাড়িতে। নিরুপায় রমানাথ নিঃসঙ্গ শূন্যে নিরস্ত্র দুই হাতে যুদ্ধ করতে লাগলেন শুধু ধারালো নখগুলো দিয়ে। নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। শত্রুকে হত্যা নয়, সবচেয়ে সোজা আত্মহত্যা। ভয়ঙ্কর এই লড়াই চালাতে চালাতে অবচেতন তন্দ্রার ঘোলা জলের মধ্যে পড়ল এই মানুষটি। অগভীর সেই জল থেকে চৈতন্যহীন ঘুমের গভীরতায় তলিয়ে যাবার জন্য এই মানুষটি আমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন। ঘুমের নদীর উপকূল ধরে মরিয়া হয়ে ছুটতে ছুটতে এই স্বপ্নশীল মানুষটা ক্রমে কালীদহের তীরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দূর থেকে জয়ধ্বনি শোনা যায়— ‘হর হর মহাদেও ! হর হর মহাদেও !’ অবচেতনে যেন চাঁদ সদাগর ও মনসাকে দেখতে পায় রমানাথ। উপন্যাসিকের ভাষায় দৃশ্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

“ও ছদ্মবেশিনী। ও আসলে মনসা। এক্ষনি সে হরণ করবে চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান মনি, চাঁদের রক্ষাকবচ। কপট মিথ্যাচারে সরল সাদাসিধা মানুষ চাঁদের করুণা ভিক্ষা করবে, কিছুই না বুঝে চাঁদ বোকার মতো দিয়ে দেবে তার মণি। এই ছলনার জালেই চাঁদ সর্বস্বান্ত হবে, হবে পুত্রহারা, হবে রাজ্যহারা, তলিয়ে যাবে তার সপ্তডিঙা মধুকর।”^{৩০}

এতবড়ো মিথ্যাচার রমানাথ আর সহ্য করবেন না। মোহের জাল ও ছলনায় জাল ছিঁড়ে ফেলবেন তিনি। উক্ত দৃশ্যের পরে এই কাহিনী আর শুধুমাত্র আধুনিক বিপন্ন মানুষ রমানাথের থাকেননি, তা হয়ে উঠেছে নতুন এক সংগ্রামের ভাষা। রমানাথ জগৎ সংসারের এই ক্রুর নিয়তির খেলা থেকে চাঁদকে বাঁচাবেন, রক্ষা করবেন স্বপ্নের কাজল-মাখানো রূপকথার ঐ সপ্তডিঙা মধুকর। কিন্তু সে রক্ষা করতে পারে না, বর্তমান যুগের ছলনায় আক্রান্ত সাধারণ মানুষকে। ছদ্মবেশধারী মনসার ছলনায় সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার যে অদম্য উচ্ছ্বাস তা অস্তমিত হয়ে যায়। অন্ধকার ছেয়ে ফেলে চারপাশ, কোথাও কোন আলোর দিশা নেই। কিন্তু মনসামঙ্গলের চাঁদের মতো অন্ধকারকে মেনে নেননি। আজকের এই চাঁদ অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করে হারানো মধুকরের খোঁজে কলকাতার কুন্ডীপাকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কাহিনীতে রমানাথ হয়তো অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেননি। তিনি প্রতীকীভাবে মেছোবাজারের পাঁচতলা বাড়ির তিনতলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই অভিযান ব্যর্থ হয়নি। অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি এক নতুন মূল্যবোধে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সমালোচক জহর সেনমজুমার সার্থকভাবেই বলেন—

“প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদী না হয়েও আসলে ভেতরে-ভেতরে একটা চলমান প্রতিবাদের সম্ভাবনা সমস্ত আখ্যান জুড়ে রমানাথের মাধ্যমে সবসময় প্রতিফলিত হয়েছে।... স্বপ্নে সংবেদনশীল রমানাথ দেখিয়েছেন আমাদের জীবন কীভাবে অতীত থেকে লোকায়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে দ্রুত সত্যচ্যুত হয়ে পড়ছে। যা আমাদের অতীত, যা আমাদের অর্ন্তবর্তী প্রবহমান ক্রিয়ার মূল শিকড়— তা কি কখনো শেষ হয়ে যায়? যেতে পারে? রমানাথ বুঝেছেন সেই প্রবহমানতা।”^{৩১}

এইভাবে সত্যপ্রিয় ঘোষ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের মানুষের অন্তর্জগৎটিকে প্রাগাধুনিক সাহিত্যের কণ্ঠিপাথরে যাচাই করে তৈরি করেন আর এক নতুন শিল্প। এইভাবেই মনসাকথার মিথকে নিয়ে তিনি এক নতুন উপন্যাস গড়ে তোলেন।

চাঁদসদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র মনসামঙ্গল কাব্যের লখিন্দর চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত অভিজিৎ সেনের ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’ (১৯৯৫ খ্রী:) উপন্যাসটি পেয়ে থাকি। অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে জন্ম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের (১৯৪৫ সালের ২৮ শে জানুয়ারি)। একসময় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই সাহিত্যিকই সমবায় ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের (প্রায় ৩৪ বছর) চাকরির সূত্রে উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলায় ব্যাপক ঘোরাফেরা করেন। এইভাবে গ্রাম বাংলার সমাজ অর্থনীতির সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়। এই সমস্ত এলাকার লোকের শুধু বাড়ি নয়, হাড়ির খবরও জানতেন তিনি। সেই সমস্ত মানুষের আচার, অর্থনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। সরেজমিনে থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেকটা জিনিসকে তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই উপলব্ধির পরিচয় পাই বিভিন্ন রচনায় ঘটনার মধ্য দিয়ে। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে বারে বারে উঠে এসেছে এই প্রত্যক্ষ দর্শন ও ঘটনাবলী। আলোচ্য ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’-উপন্যাসেও আমরা বাস্তব জীবনের পরিচয় পাই। অভিজিৎ সেনের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি হল—

১. ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’
২. ‘রহু চণ্ডালের হাড়’
৩. ‘অন্ধকারের নদী’
৪. ‘দেবাংশী’
৫. ‘আঁধার মহিষ’
৬. ‘ছায়ার পাখি’ ইত্যাদি।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাকথার মিথকে অতি সন্তুর্পণে উপন্যাসের মধ্যে ঢুকিয়ে আধুনিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাসে এক রোম্যান্টিক প্রেম কাহিনী রয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ঘটনাগুলি উঠে এসেছে সচেতনভাবে। উপন্যাসের নায়ক চব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক বালা লখিন্দর, মুসিধাপের নামকরা ব্যক্তি এবং দশখানা তাঁতের মালিক তার বাবা রাজকিশোর দাস এবং মা মায়নোমতী দাসী— তিনজনের সুখী সংসার। সেই সঙ্গে আসে বিদ্যাধরী পরিবারের করুণ চিত্র এবং ঘটনাচক্রে এলুয়ার গুণমান কবিরাজের বাড়িতে বিদ্যাধরীর বসবাসের কাহিনী। উপন্যাসের শুরু হয়েছে মায়নোমতি ও রাজকিশোরের নালিশকে কেন্দ্র করে মুসিধাপের পঞ্চায়েতে বিচার সভা নিয়ে। ... মোট ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি পঞ্চায়েতের

মধ্য দিয়ে শুরু এবং শেষও হয়েছে পঞ্চায়েতের সভা শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে ঔপন্যাসিক নিজে এবং বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পূর্ব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। রাজকিশোর ঘোষের একমাত্র পুত্রসন্তান চব্বিশ বছরের জোয়ান বুঝনদার ছেলে বালা লখিন্দর। সমুদ্রগড় মহাজনের বাড়ি থেকে সুতো ও সিল্কের দাদন এবং অনেক সময় টাকাও নিয়ে আসে সে। হিসেব রাখার মতো, সুতো গুন্যার মতো, চৌকস নকশার হিসেব করার মতো স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে সে। কারখানার দেখাশুনা, তাঁতের কঠিন নকশা নিজের হাতেই করে এবং মাসে দু'বার করে সমুদ্রগড়ে যায় বালা। পনেরো দিন হল দাদনের মাল, প্রায় বিশ হাজার টাকার সিল্কের শাড়ি নিয়ে মহাজনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু সেই শাড়ি সদরে মাড়োয়ারির দোকানে বিক্রি করে, বিদ্যাধরী নামে এক মেয়েকে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে উঠেছে। রাজকিশোর পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় তার ব্যবসার লোকসান পূরণের জন্য, সমাজের কাছে তার মান-সম্মান গিয়েছে সেটা তো আর ফিরে পাবার নয়। কিন্তু মায়নোর আক্ষেপ অন্য জায়গায়। সে তার অস্তিত্বের বিপন্নতাকে মেনে নিতে পারছিল না। চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয় মায়নোর। ছ'বছর ধরে সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় বাঁজী বলে দুর্নাম রটে যায়। ভায়োর কালীর কাছে ধরনা দিয়েও সন্তান পায়নি সে। কিন্তু ছেলে খেতে না দিলেও, মুখে লাথি মারলেও তার পুত্র সন্তান চাই। তাই সে পরের বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে জলে-কাদায় ডোবায় দুক্ৰোশ রাস্তা দণ্ডী করে মঙ্গলার বিষহরির থানে মানত রক্ষা করে। রক্তাক্ত শরীরে বুক ছুরি দিয়ে চিরে মায়ের থানে রক্ত দেয় সে। বালা লখিন্দর সেই মানতের ছেলে। সেই ছেলে এখন কুলকিনারাহীন, সমাজ ভ্রষ্টা এক ডাইনী মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে, সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এই মেয়েকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করার আর্জি জানায় পঞ্চজনের কাছে। এই ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়াতে যতবার মায়নো ঘুমায়, দুঃস্বপ্ন দেখে সে। কখনো চীৎকার করে, কখনো বোবা কান্না কাঁদে, কখনো আবার অনর্গল কথা বলতে থাকে। রাজকিশোরের দুঃশ্চিন্তায় ঘুম আসে না। এই সময়ে এক বিপদ ঘটে। সম্পর্কে রাজকিশোরের ভাগনে মহেন্দ্র বালার তাঁতের পারডোবায় সাপ দেখে কোঁচের শলা বিদ্ধ করে তা মেরে ফেলে। এটা রাজকিশোরের বাড়িতে নিষিদ্ধ তা সে জানত না। মহেন্দ্র এই সাপকে মেরে ফেলায় বাড়িতে কি বিপর্যয় আসতে পারে তা কেউ জানে না। তাই আতঙ্ক, বিস্ময় ও হতাশা জড়ানো সুরে 'মারিস না, মারিস না' এবং 'মারনি' বলে মায়নো সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফেরার পর দু'হাত কপালে তুলে সে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—

“জয় মাও বিষহরি, জয় মা, বালাক রক্ষা করিস মা। তোর দেওয়া বালাক
তুইই দেখিস মাও।”^{৩২}

পঞ্চায়েতে আসার দে'ড় বছর আগে, লখিন্দর স্বপ্ন দেখে ভাদ্রের নদীর উপর ভেসে যাচ্ছে সে। ভাদ্রের নদী, কিন্তু নদীর সেই টান নেই। এই নৌকা ভাসিয়ে যেতে নদীর ঢেউ যেন পেঁজা তুলোর মতো আরামদায়ক মনে হয়। নদীর স্বপ্নের কথা শুনে মায়নো আতঙ্কিত হয়। তার সেই শৈলী ছেলের বিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। মনসার বরপ্রাপ্ত এবং বালা লখিন্দর নাম হওয়ায় শিশু বয়স থেকে কোনদিন বন্ধুদের সঙ্গে কলার ভেলায় চাপতে দেয়নি তাকে। কিছু দিন পরে ভাদ্র মাসের ভরা নদীতে করে বাঁশ নিয়ে আসে যোগেনের সঙ্গে, উজানে মাইল দশেক দূরে এক গ্রাম থেকে। সেখানে এলুয়ার ঘাটে মাশনা কালীর কবলে পড়ে যোগেন ও বালা লখিন্দর। কবিরাজ গুণমান মুঠি মুঠি ধুলা নদীতে ছুড়ে তুকতাক করে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছে বলে মায়নো চাল, ডাল, তেল, সিঁদুর এবং নগদ দশ টাকা দিয়ে কবিরাজের বাড়িতে পাঠায়। আর এখানেই দেখা হয় বিদ্যাধরীর সাথে লখিন্দরের। বুড়ো কবিরাজের বাড়িতে বাইশ তেইশ বছরের সুন্দরী বউ দেখে বালার কৌতূহল হয়। ঘটনাসূত্রে জানা যায়— গুণমান কবিরাজের দুই স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। নিঃসন্তান কবিরাজের সন্তান লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। পরপর দুই স্ত্রী মারা গেলে নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে বউ তার কপালে নেই ভেবে বন্ধু কুলকাণ্ডের কথায় 'গাও গছ' নেওয়ার কথা ভাবে। এ ব্যবস্থা সমাজে ছিল। কোন কুমারী কিংবা বিধবা গোপনে বা অন্য কোনভাবে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে প্রথম প্রচেষ্টা হত দায়ী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তাদের বিয়ে দেওয়া। দায়ীকে খুঁজে না পাওয়া গেলে অথবা বাধ্য করা না গেলে অন্য উপায় খোঁজা হত। কেউ গাছ হতে রাজি হলে স্ত্রীলোকটিকে সেই গাছে লতিয়ে ওঠার ব্যবস্থার নাম 'গাও গছ' বিয়ে। কবিরাজ গুণমানকে এরকম একটি বৃক্ষ হতে বলেছিল তার বন্ধু। এই গাও গছের পত্নী ক্রমে ধর্মপত্নীর মতোই হয়, সন্তানটি নিজ সন্তানের সমতুল্যই হয়ে পড়ে। কারণ এতে ধর্ম থাকে, সমাজ সাক্ষী থাকে। বিদ্যাধরী এরকমই গাও গছ হল কবিরাজ। এই বিদ্যাধরীর পূর্ব জীবনের কথা ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন সুন্দরভাবে। পিতা বিদেশী মালাকর, মাতা বকুলবালা এবং তাকে নিয়ে ছিল তাদের তিনজনের সংসার। বিদেশী হাটে হাটে গামছা, জামা, গেঞ্জি, কমদামী শাড়ি বিক্রি করত। সুদর্শন চেহারার এই পুরুষটি স্ত্রী-সন্তানের প্রতি অমনোযোগী হওয়ায়, এবং সহজেই অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় সংসারে চরম বিপদ ঘনিয়ে আসে। আকর্ষণীয় চেহারার জন্য নিজের পেশা, দৈনন্দিন জীবন এবং দারিদ্র্য কোন কিছুই ছাপ ফেলতে পারত না। তার মতে যেখানেই সে যায়, মেয়েমানুষের ঝামেলা তার কপালে এসে জুটে। যদিও সে মদ খেত, জুয়া খেলত তবুও তার দীর্ঘ পল্লবযুক্ত চোখ জোড়া পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবার অঙ্গীকার রাখত স্ত্রীলোকের কাছে। সে মোটেই সংসারী লোক ছিল না। তাই হাতে টাকা না থাকলে, স্ত্রী বা

কন্যার মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে ঝামেলার মধ্যে না থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে যেত। বকুলবালা সারাজীবন স্বামীকে গৃহে রাখার জন্য তার মনতুষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করত। কিন্তু বিদেশী চাইত সেই বাঁধনের বাইরে থাকতে— খেয়ে না-খেয়ে, পরে না-পরে হা ঘরে মানুষের যেমন চলে। বকুলবালা পঁয়ত্রিশ, কি ছত্রিশ বয়স হতে না হতেই বিদেশীর কাছে তার উপযোগিতা কমে যেতে লাগল। তার সঙ্গে আবার বকুলবালার ছিল শরীরের অসুখ। দু মাস, তিনমাস সুস্থ থাকার পর আবার শরীর ফুলে উঠত, রক্তের বাঁধ ভেঙে যেত। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে বিদেশী একদিন তার শেষ নিয়তির কবলে পড়ল। হাট থেকে ফেরার সময় দুই নারী-সরস্বতী ও সনেকার সঙ্গে দেখা হয়। সম্পর্কে তারা মাসী শাশুড়ি-ভাগ্নেবউ। এই সনেকার প্রেমে পড়ে বিদেশী। আবার সরস্বতীর সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়, তা চাপা রাখার জন্য সরস্বতীর সঙ্গে ‘ধর্মবোন’ সম্পর্ক পাতায় বিদেশী। তারপর ছ’মাসের মধ্যে বিদেশী, সরস্বতী এবং সনেকার মধ্যে এক বিচিত্র খেলা শুরু হয়ে গেল। কে যে কাকে ঠকাচ্ছে, কে যে জিতছে, কে যে হারছে, তার কোন হিসেব কেউ রাখতে পারল না। ধর্মবোন পাতানোর ফলে বিদেশীর বাড়িতে সরস্বতীর অবাধ যাতায়াত শুরু হয়। বিদেশীও সরস্বতীর বাড়িতে প্রায়ই যেতে থাকে। আবার মামাশ্বশুরের বাড়ি হওয়ায় সনেকাও সেখানে আসত বিদেশীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। এক সময় এই সনেকাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় বিদেশী এবং গর্ভবতী সনেকাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে। ভাগ্যের পরিহাসে শেষে সনেকার স্বামী কৈদার ঘোষ ও তার ভাইদের হাতে খুন হয় বিদেশী, মুন্ডরামপুরে হাজার মানুষের সামনে। একা বকুলবালা ষোলো সতেরো বছরের ভরা যুবতী মেয়ে বিদ্যাধরীকে নিয়ে রাস্তার ধারে সরকারী জমিতে বসবাস করতে থাকে, সঙ্গে সনেকাও। যদিও পরে পেটের সন্তান সহ সনেকার মৃত্যু হয় বাজপড়ার শব্দে। প্রতিবছর আষাঢ় শ্রাবণ এই দুই মাসে বকুলবালা আড়াইশো করে পট আঁকত। হাটের পাইকার তার বাড়িতে এসে মাল কিনে নিয়ে যেত। খুব সুন্দর বিষহরির চিত্র নকশা আঁকত বকুলবালা। ঝলমল করে উঠত সেই নকসা। ঔপন্যাসিকের ভাষায় সন্দুরভাবে ফুটে উঠেছে—

“বিছলা পতি নিয়ে সাগরে ভাসবে। নবসান মালাকার তার জন্য মঞ্জুস নির্মাণ করেছিল। সেই আদলে মঞ্জুসের পট। বকুলবালার মঞ্জুস পটের একেবারে মাথায় অষ্টনাগ ভূষিতা বিষহরি। সাপের বসন, সাপের ভূষণ, সাপের উপরে দেবীর আসন। মাথা ছত্র সাপের ফণা। আসনের দুই পাশে দুই হংস।”^{৩৩}

কিন্তু তবুও বিদ্যা ও তার মায়ের জীবনে এই সুখটুকুও থাকল না। ধান শুকানোর জন্য ভোরবেলায়

রাস্তা দখল করতে গেলে ট্রাকের দুইজন লোক তাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে দশ-বারোদিন হলে মাঝরাতে গাড়ি আবার নামিয়ে দিয়ে যায় তাকে। তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা হলে— মা তাকে কবিরাজ গুণমানের বাড়ি নিয়ে যায় তা খালাস করার জন্য। কিন্তু কবিরাজ বিদ্যাধরী ও সন্তানের দায়িত্ব নেয়। এই কবিরাজের বাড়িতে বিদ্যাধরীর সঙ্গে দেখা লখিন্দরের। প্রথম দেখার তিন চারদিন পরে লখিন্দর পুনরায় কবিরাজের বাড়িতে আসে। ভরদুপুরে নিষিদ্ধ এক উত্তেজনা নিয়ে সন্তপর্ণে চোরের মতো আসে। ছিল ভয় ও সংকোচও। অথচ পরে মনে হয়েছিল বিদ্যা যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সবুজ পাড় ও সবুজ ডুরের নতুন কোরা শাড়ি পড়ে সেজেগুজে ছিল সে। সঙ্গে পানের রসে ঠোঁট লাল করা। আর এখান থেকেই প্রেমের সূত্রপাত হয় দু'জনের মধ্যে। এই প্রেমকে আরো গাঢ় করে তোলে বাঁশোর এর পলিয়া রাজবংশীদের 'সনেকাশোরী-বিদেশী বাউদিয়া' খণের গান এবং মুর্শিদাবাদের জামাল বারবেশিয়া পঞ্চরস আলকাপ পালা 'সনেকা-বিদেশী ডবল মার্ভার'। 'সনেকাশোরী বিদেশী বাউদিয়া' খনে সরস্বতী মনে অসং উদ্দেশ্যে নিয়ে ধর্মসম্পর্ক পাতাল বিদেশীর সঙ্গে। আবার বিদেশীও সেই একই উদ্দেশ্যে সম্পর্ক করল সরস্বতীর সঙ্গে। সরস্বতীর কোনও রাখঢাক নেই। সে চড়াগলায় গান গেয়ে দুঃখের কথা জানায় তার ধর্মভাইকে। এমন গাবুর বয়সে সে স্বামী পরিত্যক্ত। গাছের ডালে বসে কোকিল কেঁদে যায়, জানালায় পানের পুঁটলি ছুঁড়ে দেয় অনভিপ্রেত প্রেমিক। আমি তো ফুলে ফুলে সর্ব অঙ্গ ভরিয়ে রেখেছি, প্রাণের ভাই। তুমি ভ্রমর হয়ে বস। লোকে কি বলবে, এসব কথা ভুলে যাও বিদেশী। এস আনন্দে মধু পান কর। বিদেশী বাউদিয়া বলে, মন পাগল করলে, সরস্বতী। এমন ভরা নদীতে খেলা করতে আমার ভয় লাগে। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদেশী সনেকাকে দেখল, সে সরস্বতীর কাছে কলঙ্কভয়ের কথা তুলল। পাপ পুণ্যের কথা তুলল। সরস্বতী পাপপুণ্য, কলঙ্ককে দূরে সরিয়ে চুপি চুপি লীলার কথা বলে। বিদেশী ততদিনে সনকার প্রেমে পাগল। সে সরস্বতীকেই তার দুঃখের কথা জানাল। আগুনের দহনকালে সামনে যা পায়, পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সনেকা পরস্ত্রী তো কী হয়েছে। সরস্বতী প্রেমিকের মন রাখতে কুটনী হয়ে সনেকাকে বিদেশীর হাতে তুলে দেয়। বিদেশীর রূপে পাগল হয়ে সনেকা শেষে ঘর ছাড়ল। গানে সনেকাশোরী ঘরছাড়া বিবাগী স্ত্রীলোক। সে বিদ্রোহীও। সে স্বামী-সংসার মানে না, সমাজের তোয়াক্কা করে না।

এইভাবে মহেন্দ্রের শোনানো সরল গল্প, বিদ্যার বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন স্মৃতির কথা এবং গানের আসরের চরিত্ররা মিলে বালা লখিন্দরের মস্তিষ্কে একটা জটিল আখ্যানের জন্ম নেয়। সে তখনও পরিস্কার বুঝতে পারেনি যে সে নিজেই এই আখ্যানের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু মহেন্দ্র

তা জেনেছিল তাই লখিন্দরের ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে তাকে সজাগ করতে লাগল। আবার জামাল রায়বেঁশিয়ার পঞ্চরসের যাত্রাপালার ভিখু, মধুমতী, কদার ও বিদেশীর অভিনয়, তাকে মুহ্যমান করে তুলেছিল। ঔপন্যাসিকের বর্ণনার তাই পায়—

“তার খরদৃষ্টি আর কিছুই দেখছিল না, দেখছিল শুধু শূন্য মঞ্চটুকু। সেই শূন্যমঞ্চ কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে মায়ামঞ্চ হয়ে উঠেছিল। সেই মায়ামঞ্চে সে বিদ্যাধরীকে দেখল। মহেন্দ্র এসে হাত ধরে তাকে হ্যাঁচকা টান দিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল বালা লখিন্দর। সে ততক্ষণে জেনে ফেলেছে যে এই পালার কাহিনীর ভিতরে বালা লখিন্দরও ঢুকে পড়েছে। তার আর বেরিয়ে আসার উপায় নেই।”^{৩৪}

এই সময় জ্বরে বিকারগ্রস্ত অবস্থায় পাঁচ-ছ’দিন কাটে তার। লখিন্দর ও বিদ্যাধরীর ভেতরে দুজনের আড়াল করার একটা নিঃশব্দ ইঙ্গিতের ভাষা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের তখন আর অন্তরের কথা খোঁজা সমস্যা ছিল না। বিদ্যা তবুও বিবেকের কাছে ছোট হয়ে যায়, বিবেকের কাছে ঠকাচ্ছে বলে। পাখির ছানার মতো আগলে রেখেছিল যে গুণমান তার কাছে সমস্ত গোপন করতে বিবেকে বাঁধছিল। তবে এই গুণমান মারা গেলে বিদ্যা নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে লখিন্দরের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করে। এখানে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি উঠে এসেছে। বালা নিজে বৈঠা হাতে নিয়ে এলুয়ার স্বশ্রমের পাশ দিয়ে গিয়ে ওঠে চম্পাবতীপুর। পিতা-মাতার থেকে বহুদূরে বিদ্যাধরীকে নিয়ে সংসার বাঁধে এই বিবাগী লখিন্দর।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং হাইস্কুলের মাস্টার বিষ্ণুপদ বাবু কবিরাজ গুণমানের দানপত্র বের করে সবাইকে জানান যে কবিরাজ তার ভিটে মাটি, ঘর-বাড়ি, যাবতীয় সম্পত্তি বিদ্যাধরীকে দিয়ে গিয়েছে। তবে বালা লখিন্দর ও বিদ্যাধরী দুজনেই গুণমানের সম্পত্তি নিতে অস্বীকার করে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই বিদ্যাধরীকে তার বাবা মা মেনে নিলে লখিন্দর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছুক। মায়ের দুঃখ যন্ত্রণা ও হাহাকারে লখিন্দরের বুকের পাঁজরা ভেঙে গেলেও সে পা বাড়ায় প্রেমের দুঃসাধ্য যাত্রাপথে, যেখানে স্বপ্ন ও কুহক বাস্তবের থেকে অনেক বেশি বাস্তবিক। মায়নো ছেলেকে না দেখতে পেয়ে উন্মাদের মতো সামনের শূন্যতাকে হাতড়াতে হাতড়াতে আত্ননাদ করতে থাকলে বালা থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু কোন দিকে পা বাড়াবে সে বুঝতে পারে না। উপন্যাসে উক্ত দৃশ্য উঠে এসেছে খুব সুন্দরভাবে—

“দরজার ফ্রেম ছাড়িয়ে লখাইয়ের দেহ। মায়ের আত্ননাদ শুনে থমকে

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কোন রমণীর দিকে পা বাড়াবে সে? এই নির্বোধ
আহম্মক পুরুষ এই মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারছে না। চৌকাঠের
কোন দিকে পা বাড়াবে সে।”^{৩৫}

তারপর দৃষ্টি মায়ের দিকে থাকলেও পা তার দরজার বাইরে। একটু সময় কষ্ট করে দাঁড়িয়ে মাকে
বাস্তবটা মেনে নেওয়ার কথা বলেন। তার মতে—

“ম’য় তোক দুঃখ দিয়া নিজে সুখী হবা চাঁও না। কিন্তু তোর মোর সুখ
দুঃখের বাইরে আরো কিছু থাকে।”^{৩৬}

এইভাবে বালা লখিন্দর ঘর ছাড়া হলেও ঘরে ফেরার আশ্বাসের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির সমাপ্তি
ঘটেছে।

উপন্যাসটিতে পঞ্চায়েতের মীমাংসার কথা, বিদ্যাধরী ও বালা লখিন্দরের প্রেম পর্বের কাহিনী,
গুণমান কবিরাজের কথা, বিদ্যাধরীর পূর্বজীবনের কথা, বালা লখিন্দরের পূর্বজীবনের কথা— সব
ঘটনাগুলিই উপন্যাসে সমান্তরালভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে মনসা কথার মিথগুলি অতি
সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে।

উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখি বালা লখিন্দরের মা মনসার মানত করে তাকে পেয়েছিল।
তারপর যুবক হলে এই লখিন্দর নদীর স্বপ্ন দেখে। মনসামঙ্গলের লখিন্দর যেমন কলার ভেলায়
গাঙ্গুরের জলে ভেসে যায়। লখিন্দর নদীতে ভেসে যাওয়ার স্বপ্ন দেখলে আতঙ্কিত হয় মা
মায়নোমতি। ছোটবেলা থেকে তাই বন্ধুদের সঙ্গে কলার ভেলায় উঠতে দেয়নি মায়নো। মার
ধারণা— বালার কোন বিপদ হলে বিষহরি মাতাই তাকে রক্ষা করবে। যদিও মনসার মানত করা
সন্তান, তবুও একটা কোথাও যেন মিল রয়েছে। মানুষের স্মৃতিতে, সন্তায়, অস্তিত্বের গোপন
অভ্যন্তরে, বিশ্বাসে, কিংবদন্তীতে ওতপ্রোত ভাবে যেন নিয়তি স্থির হয়ে আছে। লখিন্দরের
বাসররাতে মৃত্যু হয় বলে মা সনকা ছেলের বিয়ে দিতে বিলম্ব করে। উপন্যাসের মায়নো ছেলের
বিয়ে সহজে দিতে চায় না। যার ফলশ্রুতি হয়েছে ভয়ানক। মঙ্গলকাব্যের মনসার চক্রান্তে পাঠানো
স্বর্গের অঙ্গুরা কামসোনা লখিন্দরের মামী কৌশল্যা রূপে দীঘির পাড়ে জ্ঞান করতে আসে। মদনবাণে
জর্জরিত লখিন্দর কৌশল্যাকে দেখে মোহিত হয় এবং আলিঙ্গন প্রার্থনা করে। কৌশল্যা স্বামী
মহাবীরের প্রসঙ্গ তুলে তাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে লখিন্দর জোর করে তার সঙ্গে মৈথুন
লীলায় আবদ্ধ হয়। উপন্যাসে বালা লখিন্দরও রূপবতী বিদ্যাধরীর প্রেমে পড়ে এবং পরিশেষে
তাকে নিয়ে দেশান্তরী হয়। মনসাকথার লখিন্দর ও বালা লখিন্দর যেন একাকার হয়ে উঠেছে।

মায়নোমতি ছেলে পাওয়ার জন্য শরীর নির্যাতনের মানত করে। দাঁত ওঠার সময় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে লখিন্দর। নিয়ম কানূনের মধ্যে কোন কিছুই বাকি রাখেনি মায়নো। শেষে তার একসময় মনে হয়েছিল, এই নামকরণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর কিছু লুকিয়ে আছে। তার তখন মনে হয়েছিল বালা লখিন্দর কোন মানুষের সন্তানের নাম হওয়া উচিত নয়। তার মতে, বালা লখিন্দররা মা বাবাকে শুধু দুঃখ দিতেই আসে। দুঃখ দেয়, যন্ত্রণা দেয়, তারপর মারা যায়। তবুও তো মঙ্গলবার বিষহরির থানে মানুষ পুত্র মানত করে। সেখানে অন্ধজনে চক্ষু পায়, মায়নোমতির মত হা-পুত্রীরা পুত্র পায়। কিন্তু তার কোন শর্ত ছিল না। দেবতার সঙ্গে রেষারেষি নেই। তবে এই লখাই নাম নিয়ে বাধা-বিপত্তির কোন কারণ দেখেনি। এই বালাকে তিনি ‘দুর্লভ লখাই’ বলে উল্লেখ করেছেন।

বকুলবালার পটের মধ্যে বিষহরির চিত্র আঁকার মধ্যে বেহুলা বৃত্তান্ত জানা যায়। বেহুলা স্বামীকে নিয়ে সাগরে ভেসে যাচ্ছে, প্রাণ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। সেই সঙ্গে রয়েছে মাথায় অষ্টনাগ ভূষিতা বিষহরি।

গুণমান কবিরাজ মারা যাওয়ার পর বিদ্যাধরী যে মুহূর্তে লখিন্দরের হাত ধরে নৌকায় ভেসেছিল—এই পুরুষটিকে তখন তার দৈবপুরুষ মনে হয়েছিল। বিদ্যাধরীর তাই মনে হয়েছে—

“চারদিকের স্তব্ধ গভীর রাতের নদী-মধ্যকার অপরিচিত নিসর্গ বিদ্যাধরীকে
কেমন বিহ্বল করে দিল। কতকাল আগে সে যেন ভেসেছিল আরেকবার?
সে কত জন্ম আগে? সে কি এই মানুষের সঙ্গে? মাছ, মকর, ঘড়িয়াল,
কুমির, পালে পালে শিশুমার ধেয়ে এসেছিল যে পচনধারা দেহটির
লোভে, সে কি ঐ দিব্য পুরুষটির, যার মাথায় এই মুহূর্তে গাছপালা
ছাড়িয়ে নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে ঠেকছে? ভয়, হতাশা, হাজার প্রলোভন
জয় করেছিল কি বিদ্যা এই পুরুষের পথ চেয়েই? জয় মা বিষহরি। আমার
চাঁদের সান্নানের কাণ্ডারী তোরই সন্তান, মা। তাকে তুই দেখিস, মা।”^{৩৭}

মা বিষহরির জয়গান করতে থাকে সে। তারা গ্রামে গিয়ে ওঠে। তার নাম চম্পাবতীপুর। বালা লখিন্দরও বলে—এ যাত্রায় সে কাণ্ডারী এবং বিদ্যা তার সওয়ারি। আগের জন্মের দেনা শোধ করছে সে।

রাজকিশোর ছেলেকে দেখে মুগ্ধ হয়। ঋজু শালবল্লার মত দেহকাণ্ড তার লখাইয়ের। তার এই ছেলের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে বিদ্যাধরীকে। দুজনে যেন বেহুলা ও লখিন্দর। তার ছেলে লখিন্দর যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত, আক্ষেপে বিপর্যস্ত। মনসামঙ্গলের লখিন্দরের মতো আত্মসংকটে জর্জরিত এই

লখিন্দর। তবে সে নিজের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজের জীবন সঙ্গিনী সে নিজেই খুঁজে নেয়। সমাজের বিধি নিষেধ আচার-আচরণ সব কিছুই উর্দ্ধে বসবাস করে সে।

মনসামঙ্গল কাব্যের অনুসঙ্গকে নিয়ে এক সামাজিক সমস্যা নির্ভর গল্প তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। রাজকিশোর ও মায়নোর সংসারের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত সভার আহ্বান এবং তার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রেমকাহিনী কানাই দাস ও শৈলী, বিদেশী ও সনেকা প্রভৃতি উঠে এসেছে। অপ্রধান চরিত্রগুলির মাধ্যমে, যেমন— গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভয় ঘোষ, গুণমান কবিরাজের শিষ্য শংকর ও বৈকুণ্ঠ, গুণমানের প্রথম পক্ষের শালা নিকুঞ্জ, কুলকান্ত বাবু, রাজকিশোরের ভাগ্নে মাহেন্দ্র ইত্যাদি চরিত্রগুলি নাটকে গভীর তাৎপর্য বহন করে। সব মিলিয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে মনসামঙ্গল কাব্যের অনুসঙ্গগুলির নতুন ব্যাখ্যা উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মনসাকথার নবরূপায়ণ।

মনসামঙ্গলের অনুসঙ্গকে ব্যবহার করে রচিত আরো কয়েকটি আধুনিক উপন্যাসের কথা জানা যায়। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

‘কালকূট’ ছদ্মনাম ধারী লেখক সমরেশ বসু তাঁর ‘উত্তরঙ্গ’ (১৯৫১) উপন্যাসে নতুন আঙ্গিকে মনসামঙ্গলের কাহিনী পরিবেশন করেছেন। বেরিলির যুদ্ধে পরাজিত সিপাহী হীরালালের পুনর্জন্ম হয়, লখাই বাগদী নামে। মনসামঙ্গলের মনসার বিষকে লেখক যেন এখানে পরাধীনতার যন্ত্রণার সঙ্গে উপমিত করেছেন। উপন্যাসে অশুভশক্তির কাছে জগদলের মানুষের হার স্বীকার হলেও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখরিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক অস্থিরতাময়, জ্বালাযন্ত্রণাময় পরিস্থিতিতে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে নীরবে সংগ্রামের যে দানা বেধেছিল তার চিত্রও উঠে এসেছে। এইভাবেই ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু মনসামঙ্গলের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন। তাঁর ‘সওদাগর’ (১৯৫৬-৪৭) উপন্যাসটি দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত হলেও পুরাণ কাহিনীর উপর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করে এখানে মঙ্গলকাব্যের বিষয়ভাবনার পুনর্নির্মাণ করিয়েছেন। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের মতো উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেঘনাদও একজন ব্যবসায়ী এবং স্ত্রী লীলা যেন মনসার মতোই আগ্রাসিনী রূপের প্রতিচ্ছবি। মনসামঙ্গলের আখ্যান ব্যবহার করে নায়কের আশা ও আশাভঙ্গের চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং শেষে নতুন জীবন উত্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানেই যেন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু উপন্যাসটির সার্থক আধুনিকরণ ঘটিয়েছেন।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) উপন্যাসে অদ্বৈতমল্ল বর্মণ অতি সচেতনভাবে চাঁদ

সদাগরের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন, চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেসে যাওয়া ও স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ নিয়ে এনেছেন। মনসামঙ্গলের আবহ সৃষ্টি করেছেন মালোপাড়ার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে। এখানেই ঔপন্যাসিক মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর প্রসঙ্গ এনে উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন।

দেশ বিভাগের পটভূমিতে রচিত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসটি। তবে এই উপন্যাসে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করি। উপন্যাসে ঠাকুরবাড়ির মহেন্দ্রনাথ যেন মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর এবং পুত্র মনীন্দ্রনাথের স্ত্রী সোনা হয়ে উঠেছে বেহুলা।

একইভাবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘মুকুন্দপুরের মনসা’ উপন্যাসে মনসার স্নেহময়ী লক্ষ্মীরূপ দেখানো হয়েছে।

আবার গুণময় মাল্লার ‘লখীন্দর দিগার’ উপন্যাসে লখীন্দর এক প্রতীকি চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মনসাপুরাণের লখীন্দর যেন মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। কৃষকদের উপর যে সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। এইভাবে মনসাপুরাণের প্রসঙ্গ এনে উপন্যাসটিকে অভিনব করে তুলেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, পুরাণের চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র মারা গেলেও, সপ্তডিঙা মধুকর সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেও সে পুনরায় পুত্র লখীন্দরের মধ্য দিয়ে নিজের সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শকে বলীয়ান রাখতে চেয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার গ্লানি তাকে ছেয়ে ফেলে। কড়ে আঙুলে হোক, তবুও মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয় সে। সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসেও রয়েছে সকিনার গর্ভে লখীন্দরের জন্মের কথা। কিন্তু মনসামঙ্গলের মিথকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা। চাঁদের মতে, তাদের ভবিষ্যৎ-এর লখীন্দরকে লোহার দেয়াল দিয়ে আড়াল করতে হবে না। এই লখীন্দরের জন্ম হবে খোলা আকাশের নীচে। এই লখীন্দর অত্যাচারী ক্রুর শক্তির প্রতীক আজু মুখার বেড়ে ওঠাকে রুখবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চম্পাইগঞ্জের মাটির আমু মুখা ও তার বংশধর। তাই বিলের জমিতে আমু মুখা চাঁদকে শাসালে, চাঁদ প্রতিবাদ স্বরূপ মুণ্ডকে ধড় থেকে আলাদা করে দেয়। এভাবেই সুদিন ফিরিয়ে আনতে চায় সে। সব মানুষ নিয়ে চম্পাই গঞ্জের একটাই গেরস্থানি দেখতে চায়। এখানে অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসের সমতটের চন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে মিল খুঁজে পাই। চন্দ্রশেখরও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, অভিনব ধাতু আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সমতটকে উন্নত নগরীতে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। অমিয়ভূষণের চন্দ্রশেখর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার সমতট কুন্তকোনমের

মহাযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। শেষ পর্যন্ত মাথানত না করলেও জয় ঘোষিত হয়নি চন্দ্রশেখর বসুর। পুত্রদের হারিয়ে, বাণিজ্যে বিফল হয়ে সে অন্তর্দ্বন্দ্ব জর্জরিত। এই ভাবে উপন্যাস দুটিতে রচয়িতার নিজস্ব ভাবনায়, প্রকরণের দিক দিয়ে মনসাকথার আধুনিক রূপায়ণ ঘটেছে। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি সত্যপ্রিয় ঘোষের ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ উপন্যাসের রমানাথ। চাঁদ সদাগরের মতো প্রতিপত্তিশালী হয়ে এগিয়ে যেতে চায় সে। তবে ঘটনাচক্রে সময়ের পরিবর্তনে নিয়তি তার জীবনে কঠোর আঘাত হানে। নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করতে চাইলে শত চেষ্টাতে নিস্তার পায় না। জীবনে হাহাকার ছাড়া আর কিছুই থাকে না। মনসার অনুষঙ্গ নিয়ে, লখীন্দরকে কেন্দ্র করে রচিত অভিজিৎ সেনের ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর’ মনসামঙ্গলের লখীন্দরের থেকে অনেকটা অভিনব রূপ পেয়েছে তাঁর উপন্যাসের লখীন্দর। এইভাবে আলোচ্য উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে মনসাকথার নবনির্মাণ।

তথ্যসূত্র:

১. ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ২০০৬-০৭, পৃ. ১২।
২. সাক্ষাৎকার : 9th May 2013, T oronto Festival of Litereture and the Arts 2013.
৩. চাঁদবেনে, সেলিনা হোসেন, আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, পৃ. ১৪
৪. তদেব, পৃ. ২৬
৫. তদেব, পৃ. ৪০
৬. তদেব, পৃ. ১০৮
৭. তদেব, পৃ. ১২০
৮. তদেব, পৃ. ১২৬
৯. তদেব, পৃ. ২৪
১০. তদেব, পৃ. ২৫
১১. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর’, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, বাকপ্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ২৯৮

১২. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৬৯
১৩. তদেব, পৃ. ২১৯
১৪. তদেব, পৃ. ৩১৫
১৫. তদেব, পৃ. ৩৫০
১৬. তদেব, পৃ. ৩৮৪
১৭. তদেব, পৃ. ৪৪৩
১৮. তদেব, পৃ. ৫৮২
১৯. প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রঙ্গ ও পুনর্বিবেচনা, সনৎকুমার নস্কর, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৮-০৮-২০১২, পৃ. ২১১
২০. অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৯৫
২১. 'আখ্যানের সাতকাহন', তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ' ১৪ রমানাথ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি-২০০৫, পৃ. ৩৩
২২. রমাপ্রসাদ নাগ : স্বতন্ত্র নির্মিত অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেপ, কলকাতা-৯, জানুয়ারি-২০০২, পৃ. ১৯৯
২৩. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, বাক্‌প্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-জুলাই ২০১২, পৃ. ২৭০-২৭৪
২৪. 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' সত্যপ্রিয় ঘোষ, প্রত্যয়, ২৪/১ বি. ক্রিকরো, কলকাতা-১৪, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: ৭ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৮
২৫. তদেব, পৃ. ১৪
২৬. তদেব, পৃ. ২৭
২৭. তদেব, পৃ. ৪১
২৮. তদেব, পৃ. ৫৫
২৯. সত্যপ্রিয় ঘোষ : স্বপ্ন ও শিকড়ের সন্ধান', পরিকথা, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৩৮
৩০. তদেব, পৃ. ৬৪
৩১. তদেব, পৃ. ৩৭

৩২. ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’-অভিজিৎ সেন, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ

কলিকাতা পুস্তক মালা, পৃ. ৬

৩৩. তদেব, পৃ. ৪৪-৪৫

৩৪. তদেব, পৃ. ৪৩

৩৫. তদেব, পৃ. ৯৬

৩৬. তদেব, পৃ. ৯৬

৩৭. তদেব, পৃ. ৮৮

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা কথার নবনির্মাণ

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে আধুনিকতম সাহিত্য-সংরূপ হল ছোটগল্প। আর এই ছোটগল্পের সার্থক সূত্রপাত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছোটগল্পেরও উৎসকাল। এরপর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় পাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম বা রাজশেখর বসু, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি ছোটগল্পকারদের। এই সময় বাংলা ছোটগল্পের দিক পরিবর্তন ঘটে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কল্লোল গোষ্ঠীর হাতে। তবে জগৎ, জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ বিষয়ে তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সব কিছু যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতা, জীবন সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক তির্যক দৃষ্টিকোণ, অন্তর্নিহিত জটিলতার উন্মোচন, সব মিলিয়ে নতুন জিজ্ঞাসা, নতুন মূল্যবোধ নির্মাণের আধুনিকতা— এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কল্লোল গোষ্ঠীর বাইরে তথা কল্লোল পরবর্তী লেখকগোষ্ঠী। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও সুবোধ ঘোষের। এছাড়া নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের নাম করা যায়, যাঁরা ছোটগল্পের বড় শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিকায় মানুষের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন তা যাট, সত্তর ও আশির দশকের গল্পগুলিতে পাই আমরা। এক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক বিমল কর ও মহাশ্বেতা দেবীর। এছাড়া সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, কিম্বর রায়, আবুল বাশার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই, রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বের হাতে সমাজগত বিপর্যয় ও ব্যক্তির পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগুলি উঠে এসেছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন দিকবদল ঘটে। যান্ত্রিক সভ্যতার আমূল অগ্রগতি, বিশ্বায়ন ও উত্তর-আধুনিকতার ফলে বিশ শতকের শেষার্ধ ও একুশ শতকের প্রথমার্ধের ছোটগল্পেও নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটেছে। এরকমই একটি নতুন দিক হল পুরাতনের দিকে হাতা বাড়ানো। বর্তমান সময়ের মানুষের মনের অন্তর্গূঢ় রহস্য, সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানুষের সংশয়-হতাশা ইত্যাদি তুলে ধরতে গিয়ে অনেকসময় জাতীয় ঐতিহ্যকে নিয়েছেন নিজের লেখনীতে। আমাদের

মধ্যযুগের মনসাকথাকে নিয়ে লেখা আধুনিক কালে কয়েকটি ছোটগল্পের পরিচয় আমরা পাই।
সেগুলি হল—

১. মহাশ্বেতা দেবীর ‘বেহুলা’ (১৯৭৮খ্রীঃ)
২. বিমল করের ‘বেহুলা’ (১৯৮৫ খ্রীঃ)
৩. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘সতত বেহুলা’ (২০০৫ খ্রীঃ)

বর্তমান অধ্যায়ে গল্পগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী হলেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)। তাঁর লেখা ‘বেহুলার-বারমাস্যা’ গ্রন্থটির অন্তর্গত ‘বেহুলা’ (১৯৭৮খ্রীঃ) নামক গল্পটিতে ‘মনসামঙ্গলের বেহুলার কথা’ ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণে পাই আমরা। গল্পের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধরার আগে কবি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলে নেওয়া উচিত। ১৯৬৫ সালে তাঁর প্রথম রচনা ‘বাসির রাণী’র প্রকাশ। এরপর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চলে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে যে কত কী করতে হয়, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে তার আশ্চর্য হৃদিস পাওয়া যায়। তিনি দিনের পর দিন গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মাটির কাছাকাছি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেছেন। অন্তর্বাসী সমাজ বা সম্প্রদায়ের জীবনতথ্য ও ইতিহাসের সন্ধানে এই মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছেন— এবং এই অভিজ্ঞতাগুলিই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। তাঁর অন্যতম গল্পগুলি— বান, বায়েন, পাখমারা, ‘শিকার’, ‘বিছন’, ‘মৌল অধিকার’ ও ‘ভিখারী দুসাদ’, ‘বেহুলা’, ‘দ্রোপদী’ প্রভৃতিতে ‘সমাজের বাগদি’, ‘ডোম’, ‘ওঁরাও’, ‘গঞ্জু’, মাল বা ওঝা, সাঁওতাল শ্রেণীর জীবন সংগ্রাম উঠে এসেছে। ‘বেহুলার বারমাস্যা’ গ্রন্থের অন্তর্গত কাহিনীগুলোও জীবন থেকে উঠে আসা কিছু মুহূর্ত, কিছু ঘটনা। কল্পনার জগতে বিচরণ করে লেখার আগ্রহ তার খুব কম। সমকাল তার গল্পে অত্যন্ত প্রবলভাবে উঠে এসেছে। লেখিকার আশপাশ, মানুষজন, প্রবহমান জীবন সব কিছুই তাঁর মনকে দোলা দেয়। আর সেই অভিজ্ঞতার দলিল হল এই গল্পগুলি। এই গ্রন্থে মোট দশটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল—

১. ‘জগন্নাথের রথ’
২. ‘বেহুলা’
৩. ‘ময়না সতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনী’

৪. ‘ভাত’
৫. ‘এইচ.এফ. ৩৭ রিপোর্টার্স’
৬. ‘গঙ্গার স্বর্গ’
৭. ‘জাহ্নবীর মুক্তি’
৮. ‘জরৎকুমারী’
৯. ‘শিব ঠাকুরের বিয়ে’
১০. ‘হাপ্-মাস’

এই ‘বেহুলা’ বারমাস্যা’ গ্রন্থে দক্ষিণবঙ্গের বাদা অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের জীবন-সংগ্রাম ও কষ্টকে জয় করার প্রচেষ্টার কাহিনি-অত্যন্ত জীবন্ত রূপে চিত্রিত হয়েছে, যা মহাশ্বেতা দেবীর হাতেই একমাত্র সম্ভব।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘বেহুলা’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘প্রমা’ পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে। পরে বিভিন্ন সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখিকার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিবাদী মনোভাব, যুক্তিবাদী মানসিকতা ও পুরাকল্পকে প্রত্নপ্রতিমা হিসেবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টায় রচিত এই গল্প আধুনিক মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমাজ সমস্যার ভাষারূপ হয়ে উঠেছে। গল্পের পটভূমি চব্বিশ পরগণার ইরফানপুর ব্লকের বেহুলা নামক একটি গণ্ডগ্রাম। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আড়াই ঘণ্টা ট্রেনে গেলে ইরফানপুর স্টেশন। পরে ধানক্ষেতের আলের জল-কাদার পথে হেঁটে এই গ্রাম। গ্রামের নাম বেহুলা, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নামও বেহুলা। গ্রামটি কালাজ সাপের আবাদে খুবই উর্বরা। সেই সঙ্গে সমগ্র অঞ্চলটিতে শীর্ণ ও বুভুক্ষ মানুষের ফলনও প্রচুর। এই দুই উর্বরতা বৃষ্টি বন্যা-খরা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। এই অপুষ্টিজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানব শরীরে কালাজ বা সাধারণ করাইত সাপের বিষক্রিয়ার রিসার্চের বিষয় নিয়ে এই অঞ্চলে আসেন কলকাতা শহরের ছেলে বসন্তকুমার। এই বসন্তকুমার বেহুলা গ্রামে এসে জোতদার হৃদয় বা হেদো নস্করের বাড়ি ভাড়া নেন। এই হেদো নস্করের বাড়িতেই কালাজ বা শিয়ড়চাঁদা সাপের চাষ। ইটের পাঁজা করার জন্য সে লক্ষাধিক ইট পোড়ান। দামে না পোষাতে সেগুলি থেকে যায়। যার ফলে কালাজ চাষের উপযুক্ত জায়গা হয় এই ইটের পাঁজা। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় গ্রামের বহু লোকের। গ্রামের মানুষদের একমাত্র ভরসা শ্রীপদ মাল। এই শ্রীপদ হল এ অঞ্চলের সাপের ওঝা, উইচ ডক্টর এবং ছেলেদের ভোলাবার কাঠের কুমঝুমি বানানোর তার শখ। হেদো নস্কর নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভুলে যায়

গ্রামের মানুষের সর্পদংশনে মৃত্যুর কথা। ইরফানপুর হেল্থ সেন্টারে সাপের বিষ প্রতিরোধক কোন ইঞ্জেকশন নেই। বরং সালফাডায়াজিন, এন্টারোকুইনল ও কাশির মিক্সচার পাওয়া যায়। ডাক্তার স্নেক আন্টিসিরাম চেয়ে পাঠালে আরো বেশি করে গর্ভনিরোধক বড়ি ও সালফাডায়াজিন পান। গ্রামের কাউকে সাপে কামড়ালে শ্রীপদ বাঁধন দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করে হেল্থ সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে মারা গেলে মৃতদেহ গ্রামের নদী বেহুলার জলে ভাসিয়ে দেয়।

লেখিকার ভাষায় সাধারণ মানুষের সংস্কার উঠে এসেছে। বেহুলা নদীকে অভিশপ্ত মনে করে অঞ্চলের লোকজন। সর্প দংশিত লাশ বইতে হয় এই নদীকে। মজে যাওয়া নদী যেন অতি কষ্টে লাশ বয়ে নিয়ে চলে। মনসা পূজার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। মনসা এখানে বাস্ত্বরূপে ঘট ও মনসাসিজের ডালে পূজিতা। পূজোর দিন নানা রকমের রান্না হয়, পরদিন অরন্ধন। অনেকের কাছে এটি ‘রান্না পূজা’ নামে পরিচিত। এখানে মনসামঙ্গল কাব্যের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পে বসন্ত কুমারকে ঘিরেও হেদো নস্করের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। বসন্ত রায় ঘটনাসূত্রে জানতে পারে কীভাবে কালাজ সাপের দংশনে বেহুলা গ্রামের মানুষের মৃত্যু হয়। শ্রীপদ মাল আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারে না। ইউটের পাঁজার কথা বসন্ত কুমার হেদো নস্করকে বললেও সে কোন কর্ণপাত করে না। তাই বসন্ত কুমার নিজে এর প্রতিরোধের কাজে নেমে পড়েন। তিনি দরিদ্র লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, ইঞ্জেকশনের কথা বলেন। সাপের ওঝা শ্রীপদকে ইঞ্জেকশন দিতে শেখান। এমনকি হেল্থ সেন্টারের ডাক্তারকে বিষ প্রতিরোধের ঔষুধ আনতে বলেন। নিজে কলকাতা থেকে ঔষুধ আনেন গ্রামের মানুষদের বাঁচানোর জন্যে। শ্রীপদের সঙ্গে গিয়ে চরণ বেরায় যুবতী ও সধবা এবং গর্ভবতী মেয়ে মালতীকে বাঁচিয়ে তুলেন। হেদো নস্কর ছোটলোক শ্রীপদের সঙ্গে বসন্ত কুমারের মেলামেশা ভালো চোখে দেখেননি। আবার বসন্ত রায় একরকম কাজের কথা বলে অন্য কোন কাজে নিযুক্ত আছেন নাকি বলে সন্দেহ করেন। কিন্তু হাকিমের শালা বলে মুখে কিছু বলতে না পারলেও শ্রীপদের বাড়িতে নেমস্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে বসন্তের সেখানে যাওয়া ঠিক হয়নি বলে উল্লেখ করেন। গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় বসন্ত শ্রীপদের সঙ্গে চরণ বেরার বাড়িতে মনসামঙ্গল শুনতে যায়। মনসার গান বলতে গল্পে বেহুলার উপাখ্যানকে পাই আমরা। মনসামঙ্গলের গল্পটির আঞ্চলিক রূপ দিয়েছেন সাধারণ মানুষ এখানে। এই অঞ্চলের মানুষের গানে বেহুলা-লখিন্দর সংসার করতে থাকে, শেষে লখিন্দর স্বর্গে গেলেও অভিশাপের কারণে বেহুলা মর্ত্যভূমিতে থাকতে

বাধ্য হয়। দেবসভায় যে লাস্য দেখিয়েছিলেন বেহুলা, দেবতাদের মতে এর ফলে পাপ হয় বেহুলার। তাই এই পাপ খণ্ডাতে কলিকালে বেহুলাকে নদী হয়ে বয়ে যেতে হবে। সর্পদংশনে মৃতদেহ বেহুলার জলে ভেসে গেলে তার মুক্তি হবে। তবে কবে মুক্তি পাবে, এর কোন উত্তর দেবতারা দেননি। সেই সময় থেকেই বেহুলা নদী হয়ে বইছে। এখানে গানের শেষে মনসার বন্দনা হয় এবং উঠোনে ধ্বজা পোঁতা হয়। দেখা যায় এই অঞ্চলের মানুষ পুরাণের মনসামঙ্গলের কাহিনীকে নিজেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন। মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন নিজের জীবন উৎসর্গ করে স্বামী ও ছয় ভাসুরকে ফিরিয়ে আনেন। এই বেহুলা নদীও বিধে জর্জরিত মানুষের দেহ বয়ে নিয়ে চলে। নদীতে জল না থাকলে অতি কষ্টে বয়ে নিয়ে যায় এই মৃতদেহ। গল্পের মধ্যে মনসাদেবীর প্রসঙ্গ দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়। একদিকে মনসাকে শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে দেখানো হয়েছে। সর্পের দেবী হলেও মানুষ বাঁচলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না। এমনকি সাপের ওঝা শ্রীপদও হেদো নস্করের বালক মাহিন্দার শশীকে সাপে কাপড়ালে তাকে বাঁচাতে ইঞ্জেকশন দেয় মা মনসাকে স্মরণ করে—

“মা মনসা দয়া করে বিষের পেরি ধরি।

ভুজঙ্গ জননী ভুজঙ্গের বিষ নিলেন হরি।।

বিষ গেলেন সপ্ত স্বর্গের উপর দিকে।

মা মনসা দোহাই দিলেন শঙ্কর পিতার।।

বিষ গিয়ে শঙ্করের হল কণ্ঠহার।

জয় জয় শুভঙ্কর শঙ্করের দোহাই।।”^৪

এই গান আসলে ইরফানপুর এবং তার সংলগ্ন মানুষের দ্বারা সৃষ্টি। গানের মধ্য দিয়ে মনসার স্তুতি করে মানুষ। যার ফলে মনসা তার হিংস্রতা ছেড়ে দিয়ে কল্যাণময়ী রূপ নেয়।

অন্যদিকে শ্রীপদরা সংকল্প করেন সামনের অগ্রহায়ণে ধান কেটে সবাই চাঁদা তুলে কেরোসিন কিনে হেদো নস্করের ইঁটের পাজায় আগুন লাগিয়ে সাপের বংশ নিঃশেষ করার। এই সাপের আড়ত, যা গ্রামের মানুষের প্রাণনাশ করে, তাকে মনসাপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন গ্রামের মানুষজন। এখানে মনসাদেবীকে অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে দেখানো হয়েছে।

গল্পের শেষের দিকে দেখতে পাই গবেষক বসন্তকুমার সাপের বংশ নাশ করার জন্য ভগ্নীপতির কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি। আধিকারিকরা গ্রামের প্রধানকে অসন্তুষ্ট করতে চান না।

অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত, শক্তিশালী, পুঁজিবাদী ব্যক্তির দরিদ্র মানুষদের বোকা বানিয়ে, শোষণ করে, ভয় দেখিয়ে শান্তি বজায় রাখে। তাতে আধিকারিকরা সমর্থনই করেন। উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দরিদ্র মানুষের জীবনও তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। একসময় ওঝা শ্রীপদ মালকেও সাপে কামড়ায়। মনসার পূজারী এই শ্রীপদকে বাঁচাতে পারে না বসন্ত শত চেষ্টা করেও। বেহুলা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। ফলস্বরূপ বসন্ত কুমারের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষ ইঁটের পাঁজায় আগুন লাগিয়ে দেয় সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এই আগুন লাগানোর মাধ্যমে অত্যাচারিত শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অন্তর্বাসী মাল জনগোষ্ঠী। গল্পের শেষ কয়েকটি লাইনে দৃশ্যটি আরো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

“আগুনের তাপে ছিটকে পড়ে কালাজ। সবাই চৈঁচিয়ে ওঠে, নতুন উদ্দীপনা পায়। খড়ের পাঁচিলে কাঠ পড়ে, কেরোসিনের পিচকিরি। সাপ বেরোতে থাকে। মরতে থাকে। গ্রামের লোকগুলির শোক, কালাজ বিষয়ে ভয়, হেদো নস্করের ওপর রাগ, সব উত্তরিত হয় এক্ষণিক প্রজ্জ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে।”^৫

এইভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ দরিদ্র মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। বিশ শতকের এই মানুষরা আজকের বেহুলাকে আর কষ্ট পেতে দেয় না। মুক্তি পায় বেহুলা নদী, তাকে আর বইতে হয় না সাপের কামড়ের মৃতদেহ। সমালোচক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন—

“বসন্তের আগ্রাণ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে শ্রীপদ মৃত্যুবরণ করলে সমস্ত গ্রাম স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তার দেহ বেহুলা নদীর ঘূর্ণীর কাছে এসে পাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে সমস্ত গ্রাম পুনরায় মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জিত হতে থাকে। কিন্তু লেখিকা শ্রীপদের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কাহিনির গতিপথকে রুদ্ধ করেন না। বরং প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়ে প্রাচীন গ্রামকে বর্তমান কালের সমস্যা দীর্ঘ অধ্যায়ের মুখোমুখি দাঁড় করান। শ্রীপদের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নাটকীয়ভাবে কাহিনিকে প্রতিবাদের কেন্দ্রে স্থাপন করেন।”^৬

কথাকার মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ একটি অঞ্চলের মানুষের সমস্যা তথা অর্থনৈতিক শোষণ

ও সামাজিক নির্যাতন এবং বর্ণবৈষম্যে ও সমস্ত প্রকারের শোষণের শিকার এই মানুষদের জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। তবে গল্পটিতে আধুনিক সময়ের বিশেষ একটি অঞ্চলের মানুষের জীবনসমস্যা তুলে ধরলেও লেখিকা নিপুণ কৌশলে মনসামঙ্গলের পুরানো গল্প ও অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবে। অঞ্চলের মানুষের লোকজবিশ্বাস, লোকরীতির সঙ্গে কোলকাতা শহরের সংস্পর্শে আসার ফলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি এসেছে গল্পে। তাই শ্রীপদর মতো সাপের ওঝাও সাপের কামড়ে জর্জরিত মানুষের চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। বিভিন্ন রকম সাপের কামড়ের বিভিন্ন লক্ষণ, বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিখুঁতভাবে জানে, যা গবেষক বসন্ত কুমারকে আশ্চর্যিত করে তোলে। আবার সেই শ্রীপদর মুখে শোনা যায়, এই বেহুলা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলেই চম্পকনগর ছিল। চাঁদ সদাগরের কাহিনী যেন তাদের আত্মার সঙ্গে জড়িত। অন্যদিক দিয়ে গল্পটি হয়ে উঠেছে অসহায় মানুষের প্রতিবাদের গল্প। বছরের পর বছর সাপের কামড় খেতে খেতে শেষে হেদো নস্করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। তাই বলা যায় মনসাপুরাণের মিথকে সাধারণত মানুষের লোকবিশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে, সেই সঙ্গে প্রতিবাদের ভাষা যুক্ত করে এক নতুন গল্পের সৃষ্টি করেন। সেই দিক দিয়ে গল্পটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের আধুনিক নির্মাণ।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কারিগর হলেন শ্রদ্ধেয় **বিমল কর** (১৯২১-২০০৩)। যুগান্তকারী উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় পারদর্শী এই লেখক মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র বেহুলার অনুষঙ্গ নিয়ে রচনা করেন ‘বেহুলা’ নামক ছোটগল্পটি। কবিতাটি আলোচনা করার পূর্বে কবি সম্পর্কে দু’চার কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করছি। লেখকের বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছিল বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে। এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন। এবং তার অভিজ্ঞতাগুলি লিখিত রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘উত্তরসূরী’ পত্রিকায় (১৯৫২) তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ‘ইঁদুর’ গল্পটি প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং তার অধিকাংশ রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার অন্যতম রচনাগুলির মধ্যে ‘দেয়াল’ (৩খণ্ড যথাক্রমে ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে), ‘অসময়’ (১৯৭২), ‘যদুবংশ’ (১৯৬৮), ‘খড়কুটো’ (১৯৬৪) ও ‘বালিকা বধূ’ উপন্যাস এবং ‘আঙুরলতা’, ‘আত্মজা’, ‘গ্যাস বার্ণার’, ‘হুদ’, ‘মানবপুত্র’, ‘যযাতি’, ‘সুধাময়’, ‘নিষাদ’ প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের দশক থেকে প্রবলভাবে ছায়া বিস্তার করে তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস।

তবে সত্তরের দশকে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে গল্পভারহীন এক নতুন ধরনের কাহিনী রচনার আন্দোলন। তাঁর রচনায় সমকাল প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পূজারী বিমল করের ‘বেহুলা’ গল্পটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি কোন সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। লেখক এই গল্পটিতে অত্যন্ত সাধারণভাবে বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতীর কথা তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে তাদের কয়েকদিনের কাজের মেয়ে বেহুলা। ‘বেহুলা’তে গল্পের কথক কলকাতার অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। শ্বাসকষ্টের অসুখের জন্য ডাক্তার হাওয়া বদল করতে বললে বাড়িতে পূজো কাটানোর পর লক্ষ্মীপূজোর আগে আগে কলকাতার বাইরে একটি নির্জন শান্ত পাহাড়ি এলাকায় আসেন। সেখানে তাদের দেখাশোনার ভার এসে পড়ে বেহুলা নামক একটি মেয়ের হাতে। গল্পটির শুরুতেই দেখা যায় বেহুলা ঠাকুরদার সাথে গল্প করতে ব্যস্ত। এখানে মনসামঙ্গলকাব্যের প্রভাব সেরকম ভাবে না থাকলেও বেহুলার মিথ ছায়া ফেলেছে। গল্পের কথক ও তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতীর কাজকর্ম করার জন্য পাশের জজ বাড়ি থেকে বেহুলাকে পাঠায়। এই বেহুলা বাবা-মাকে কোনদিন দেখেনি, বাড়িগ্রামে বোষ্টম দিদির সঙ্গে ভিক্ষে করত। এই বোষ্টম দিদি রেলের কাটা পড়লে বেলবাবুর বাসায় কাজ করেন কিছু দিন। রেলের কুলি কাবারি, পানঅলারা ওকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করলে জজগিন্নি নিজের কাছে নিয়ে এসে কাজকর্ম শিখিয়েছেন। তিন-চার বছর হল বেহুলা এখানে রয়েছে। ঠাকুরদা বেহুলার নামের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বেহুলার মতো সেবাপরায়ণতা। তাঁর ছেলেমেয়েরা যতটুকু না দেখাশুনা, আদর-যত্ন করতে পেয়েছে, ছোট এই মেয়েটি যেন তার চেয়ে ঢের বেশি। তাকে পুরাণের চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে নিরঙ্কর হলেও বেহুলার গল্প সম্পর্কে অবগত। বেহুলা যে অতিসাহসী ও সহনশীলা নারী সেটিও তার জানা। তাই সে উত্তরে অনায়াসেই বলে—

“মড়া নিয়ে স্বপ্নে গিয়েছিল, না গো ঠাকুরদা।

মড়া নিয়ে কেমন করে যায় ঠাকুরদা? ভয়

করে না? ঘেন্নাপিন্ডি নাই?”

তবে ঠাকুরদার মতে, তখন প্রাচীন যুগে গিয়েছিল এখন আর কেউ যায় না। এইভাবে বর্তমান যুগের প্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে বেহুলা চরিত্রের অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছেন।

গল্পের বৃদ্ধ কথকের দুই পুত্র রাজু ও অজু এবং এক কন্যা। কলকাতায় থাকাকালীন ঠাকুরদার

ক্রমিক ব্রংকাইটিস হয়, বর্ষাকালে একমাস ধরে শয্যাশায়ী থাকেন। সেই সময় ছোট ছেলে অজু মাত্র দুই হাজার টাকা পাঠিয়ে এবং কয়েকটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মা-বাবার প্রতি কর্তব্যবোধ সেরেছে। মেয়ে-জামাইও ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসার সময় পায়নি অথচ তারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে জামাই-এর কর্তার বাড়ি ‘নেমন্তন্ন’ রক্ষা করতে যায়। বড় ছেলে রাজুও মা বাবাকে কম অবহেলার চোখে দেখে না। অসুস্থ বাবাকে ডাক্তার শীতকালে হাওয়া বদলের উপদেশ দেয়। কিন্তু বড় ছেলে রাজু ও তার স্ত্রী জোর করে বাবা-মাকে লক্ষ্মীপূজার আগে আগেই পাঠিয়ে দেয় বায়ু পরিবর্তনের জন্য এক নির্জন পাহাড়ি জায়গায়। এর পেছনে এক বড় স্বার্থ চরিতার্থ করেছে সে। ইন্দুমতী বউমার বাপের বাড়ির পাড়ার এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারেন বউমার দাদা-বউদি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে দিল্লী থেকে এসে কলিকাতায় তাদের বাড়ি মাস-খানেক থাকবে। তাই ডিসেম্বর মাসে চুনারে যাওয়ার কথা থাকলেও ছেলে-বউমা তড়িঘড়ি করে তার আগেই পাঠিয়ে দেয়। লেখক তৎকালীন সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙাগড়া, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং মূল্যবোধহীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে সহানুভূতি নেই, সহমর্মিতা নেই, বাবা-মায়ের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা ও আন্তরিকতা নেই। আবার বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের অভ্যস্ত জীবনের বদল। তাই ছোটনাগপুরে মোটর স্পোর্টস-এ কাজ করলেও অসুস্থ বাবাকে দেখতে আসতে পারেনি। দুঃখে তাদের পিতা অনায়াসেই বলে উঠতে পারে স্ত্রীকে—

“সংসারে দাবি নিয়ে ঝগড়া করতে নেই; যতক্ষণ তুমি সক্ষম, তোমার
হাতে দড়িরথের— ততক্ষণ তোমার দাবি টেকে— তারপর আর থাকে
না। এ-সব মেনে নাও।”^২

তবে স্ত্রী ইন্দুমতি এই অন্যায় কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সংসারে ধরে রাখার অধিকার মানুষকে একদিন হারাতে হয়, সবকিছু ফেলে যাওয়ার দিন এখন— তা মেনে নিতে নারাজ সে। বাবা-মা তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্তানদের প্রতিপালন করে। কিন্তু নিজের সন্তানরাই পরিণত হয় স্বার্থপরে। মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার জন্য এই সন্তানরা বাবা-মাকে দুঃখ-যন্ত্রণা, অবহেলা, আঘাত ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। ‘বেহুলা’ গল্পে ঠিক একই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে বিশ শতকের ভালোবাসাহীন, সহানুভূতিহীন ও আন্তরিকতাহীন পৃথিবীতে পুরোপুরি একা ও অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অন্তরের হাহাকার ফুটে উঠেছে।

বর্তমানের জটিল এই পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখক প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে

মুখ ফিরিয়েছেন। মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন বাসররাতে বিধবা হয়েও সমস্ত চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করে স্বামীকে জীবিত করার জন্য গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যায়। তার সেবাপরায়ণতা, পাতিব্রাত্যতা, একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয় দেবকুল। তিনটি পরিচ্ছেদে রচিত রচিত গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদে দেখি হঠাৎ করে বেহুলাকে বিষাক্ত এক বিছে কামড়েছে। এখানে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেবা যত্নে সে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। এমনকি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ছোট মেয়ে বেহুলা হয়ে উঠেছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার একমাত্র ভরসা। তাই মনসামঙ্গলের বেহুলার মতো মৃতদেহ নিয়ে ভেসে যেতে না পারলেও বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও তার স্ত্রী ইন্দুমতীকে মানসিক আশ্রয় দান করে। তাদের বেদনার ভাগিদারী হতে চায় সে। তাই বেহুলার মেরামত করা চেয়ারে অনায়াসেই বসতে পারে ঠাকুরদা। তার মতে— “এখনও বসার মতন জায়গা আমার রয়েছে।” তাই বলা যায় আধুনিক সংকটময় যুগে আজও মানুষকে হাত বাড়াতে হয় প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে। মনসামঙ্গলের বেহুলার আদলে তৈরি এই গল্পের বেহুলা। চাঁদ সদাগর যেমন সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বেহুলাকে কেন্দ্র করে নতুন দিনের আলো দেখিয়েছেন। এখানেও বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও স্ত্রী ইন্দুমতীর আশার আলো হল এই বেহুলা। এই দিক দিয়ে গল্পটি হল মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা কথার নবনির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি ছোটগল্পের সন্ধান পাই, সেটি হল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগান্তকারী কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮ই জানুয়ারি ১৯৪৪) ‘সতত বেহুলা’ ছোটগল্পটি। বিশ শতকের ৭০-এর দশকের এক ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভাব প্রসিদ্ধ লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর লিখিত পাঁচশোর বেশি ছোটগল্প এবং দুইশটির বেশি প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়া রয়েছে তাঁর কতকগুলি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তৎকালীন সমাজের মানুষের আত্মসংকট, মূল্যবোধহীনতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপন্যাস ছোটগল্পে দেশভাগজনিত পরিস্থিতি, নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী আন্দোলন সবই উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে পাই— ‘জল তিমির’, ‘মাটির অ্যান্টিনা’, ‘ধরিত্রী’, ‘সাতপুরুষের ডটকম’, ‘বিন্দু থেকে বৃত্তে’ প্রভৃতি এবং ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, ‘গল্প সংগ্রহ’ ১, ২, ৩ এবং ‘পঞ্চাশটি গল্প’ প্রভৃতি গল্পের বই আমরা পেয়ে থাকি। তাঁর অন্যতম গল্পগুলি হল— ‘মেহগাণি’, ‘ছাব্বিশ ফুট’, ‘সিটলের চঞ্চু’, ‘অদিতির জন্য চারটি মিডি বাস’ প্রভৃতি।

গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘সতত বেহুলা’ ছোটগল্পটি ‘পরিকথা’ (ডিসেম্বর ২০০৫)

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে ‘গল্প ৫০’ গ্রন্থে সংকলিত (১৮ জানুয়ারী ২০০৯) হয়। একুশ শতকের সূচনাপর্বে রচিত এই গল্পটি আকারে ছোট হলেও এর মধ্যে রয়েছে গভীর ব্যঞ্জনা। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের আত্মসংকট ও মনোবিশ্লেষণের দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের অনুষ্ণ ব্যবহার করেছেন।

পোস্ট অফিসে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পনেরোটি বছর কেটে গেছে শান্তিনাথের। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরাট সংসার থাকলেও তিনি যেন একা। পঁচাত্তর বছরের শান্তিনাথ টাকা-পয়সা হিসেবের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়েও অত্যন্ত চিন্তিত। তিনি সারাদিন ও সারারাত নিজের মতো করে সাজিয়ে, নিজের মধ্যেই বিলীন থাকেন। দিনের বেলায় তিনি পিঁপড়ের মতো ব্যস্ত থাকেন। চাঁদা, কমিটি, পেনশন হোল্ডারদের সংঘ, এলাকার উপদেষ্টা, উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন দিনের বেলায়। রাত্রি বেলায় তিনি নিজের কুঠুরিতে অনেকক্ষণ জেগে থাকেন। দরজা জানলা সেন্টে মাঝরাত অবধি নিঃশব্দ একটি টিভি চালিয়ে রাখেন। তাঁর একক ও বিচ্ছিন্ন জগতে চেতনার গভীরে জ্বলে ওঠা বাসনাগুলি সরাতে পারেন না বলেই স্ত্রী-পুত্রবধূকে লুকিয়ে নিজেকে নিজের কাছে উৎসর্গ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

পঁচাত্তর বছরের শান্তিনাথ একঘেয়ে জীবনের মধ্যে বাঁচার জন্য নিজেই বিভিন্ন পস্থা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কখনো পুরনো সহকর্মী পরিমল বাড়িতে এলে বিকেলের আড্ডা জমে ওঠবে বলে খুশি হয়। সমবায় গড়া নিয়ে জগদীশ পাল্টা যে গোষ্ঠীবাজি শুরু করছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর পাওয়া যায়। বিরাজ কান্তির খবর, সর্বানীর খবর, পাওয়া যায়। বিরাজকান্তির খবর সর্বানীর খবর, কয়েকজনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কথা, কয়েকজনের মৃত্যুর খবর সবই দিবে সে। আবার কখনো পাড়ার ছেলে পবিত্র এসে দু’টো কথা বলবে বলে পথ চেয়ে থাকেন তিনি। খেয়ালবশে আবার পুরনো মহিলা সহকর্মীকে ফোন করেন দুপুরবেলা।

পরিস্থিতি বদলে যায়, তবুও মানুষ যুগের এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না। শান্তিনাথও রাস্তার যানবাহনের যে আইনী চলা, রাস্তার ধারের সাইনবোর্ডের ৫৩টির মধ্যে ৪১টি ইংরেজিতে লেখা। এই সমস্ত অনিয়ম বিশৃঙ্খলতা দেখলে তাঁর মনে বিদ্রোহী মনোভাব জেগে ওঠে। নিজের মধ্যে পুরনো শান্তিনাথকে খুঁজে বের করতে চাইলে এখন আর সম্ভব হয় না। শরীরের কোথাও ব্যথার মেঘ থমকতে থাকে। বয়সের ভার তাঁকে যে চারপাশ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন করতে চায়, এবং রোজই সে সবার আয়োজন যে বাড়ছে আজকাল বুঝতে বেশি-মাথাব্যয় করতে হয় না

শান্তিনাথের। তবুও তিনি নিজের সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন। লেখকের ভাষায় উঠে এসেছে—

“পরিবারের আড়ালে, ছোটস্পেসে, বিছানায় একাকী তিনি নিজের কাছে একান্ত আপন। ‘নিজ’ এবং তিনি তো একাকার নন। যখন স্বাধীনতায় ভাবেন, একাকার হয়েছেন, কেবলমাত্র রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর থেকে, বাড়িটা যখন গভীর ঘুমে, স্বাধীনতায় উদ্ভূত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে থাকেন।”^৭

গল্পটি আরো তাৎপর্য হয়ে ওঠে যখন শান্তিনাথ তাঁর পোস্ট অফিসের সহকর্মী অর্ধেন্দু দত্ত রায়ের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে, তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন— “জী-ব-ন থেমে থা-কে-না।” অর্থাৎ মানুষ যেন শুধু অসংখ্য জীবনে পরিণত হয়েছে। শান্তিনাথের স্বাধীনচেতা ভাবুক মন কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেন না। আবার শীতের মফঃস্বল-সন্ধ্যা একেবারে চিত্রহীন হয়ে পড়ে, তাদের রক্তচাপ বাড়তে থাকে নীরবে। আবার পরিবারে ঘরের অভাব বা ভাগের টি.ভি. হলে বৃদ্ধরা আরো অসহায় হয়ে পড়েন। বসবাসের সংস্থানটুকুও তাদের হারাতে হয়। আর এই অবস্থায় প্রতিটি জনের ব্যবহার শান্তিনাথের মনে সংকট তৈরি করে, সংঘর্ষ বাঁধায়। তবুও শান্তিনাথ আশা হারায়নি, মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন কলার ভেলায় ভেসে অমরার দেশে যান। সেখানে লাস্যনৃত্যের মাধ্যমে প্রার্থনা করেন মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। উক্ত স্থানে সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের কথাটি তুলে ধরা হল—

“আসলে শান্তিনাথের জীবনে রাত্রির জগতে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষাই যেন ‘অমরা’। সতত বেহুলার মতো বাসনাগুলিকে বয়ে নিয়ে তিনি চলেছেন সেই অমরার দিকে। একসময় ‘একান্ত স্বাধীনতা’ নামক দেবতার কাছে উপনীত হয়ে বাসনায় নৃত্যলাস্য শুরু করতে চান।”^৮

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে লেখক এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের জীবনের নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেটি আর ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং বিশেষ সময়ে মধ্যে থেমে থাকে নি। ব্যক্তি ও দেশকালের উর্দে সার্বজনীন সমস্যা হয়ে উঠেছে। আর এই সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন মনসা-কথার বেহুলাকে। সাহসিনী, একনিষ্ঠ, কল্যাণময়ী, প্রতিব্রতা, প্রতিবাদী বেহুলাই যেন একমাত্র ভরসা। তাই বলা যায় লোকপুরাণকে নিয়ে বর্তমানের সমস্যাকে চিত্রিত করে এক নতুন শিল্পের নির্মাণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় উপরিউক্ত ছোটগল্পগুলিতে মনসা-পুরাণের কথার বিভিন্ন লোকবিশ্বাসগুলি অতি সন্তুপর্ণে উঠে এসেছে। প্রধানত মনসামঙ্গলের অন্যতম নারী চরিত্র বেহুলা প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হয়েছে ছোটগল্পগুলিতে। মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে বেহুলা যেমন চাঁদ সদাগরের হাত সর্বস্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তার কাছে নিজের থেকে বড় হয়ে ওঠে পতিভক্তি। সেই সঙ্গে অন্যায়কে বেহুলা মেনে নেয়নি। তাই সে হার মানিয়েছে অকাল বৈধব্যকে। আধুনিক কালেও লেখকগণ এই বেহুলাকে কল্যাণময়ী নারী রূপে দেখিয়েছেন। কখনো নদীরূপে, কখনো কাজের মেয়ে রূপে, কখনো মানুষের অবচেতনে নারীর ধৈর্যশক্তি রূপে এই বেহুলা রূপে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসামঙ্গলের বেহুলার নবরূপায়ণ ঘটেছে। আর এইভাবে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা কথার নবনির্মাণ ঘটেছে।

তথ্যসূত্র:

১. বিমল কর, বেহুলা, শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৯২, পৃ. ৮১
২. তদেব, পৃ. ৮৩
৩. তদেব, পৃ. ৮৪
৪. মহাশ্বেতা দেবী : বেহুলার বারমাস্যা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পাব:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৬৭
৫. তদেব, পৃ. ৬৪
৬. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ২৩২
৭. সাধন চট্টোপাধ্যায় : ৫০টি গল্প, প্রকাশভবন, ২০০৯, পৃ. ২৩৭
৮. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ২৩৭

উপসংহার

‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে’ শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সর্পদেবী মনসা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা আবশ্যিক। আদিকালে মানুষের জ্ঞান হওয়ার আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, মনের মধ্যে ভক্তিভাব নিয়ে তাদের সম্ভব করার চেষ্টা করে। আর এই সূত্রেই উৎপত্তি হয় দেবতা-ভক্ত ইত্যাদি শব্দগুলি। দেববাদের সৃষ্টি এইভাবেই ঘটেছে অনুমান করা যায়। লোকসমাজে সর্পকে কেন্দ্র করে সর্পদেবীর ভাবনাও এভাবে এসেছে। সেই সঙ্গে সর্পদেবীকে কেন্দ্র করে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কাল্পনিক গল্প প্রচলিত হতে থাকে। বিশেষ করে নারী সমাজে এই পাঁচালী, ব্রতকথা আধিপত্য বিস্তার করে। আমাদের বাংলাতে সর্পদেবী মনসার পূজার প্রচলন হয় একই ভাবে। বাংলার মানুষের ঘরের দেবীতে পরিণত হয়। তুর্কী আক্রমণের পরে আনুমানিক পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলার এই লৌকিক দেবীকে কেন্দ্র করে কাব্যের আকারে আখ্যান রচিত হতে থাকে, যাকে মনসামঙ্গল বলা হয়ে থাকে। দেবী মনসার মঙ্গলগান গেয়ে পূজো দিলে সর্পদংশন থেকে নিস্তার পাবে মানুষ। যার ফলে এই মনসামঙ্গল সাধারণ সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আবার লৌকিক দেবী মনসাকে শিবের কন্যারূপে দেখানো হয়েছে। দেবসমাজে এই দেবী স্থান না পেলেও তিনি যে দেবতারই অংশ তা মনসামঙ্গলে দেখানো হয়েছে। আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে।

মনসাদেবীকে কেন্দ্র করে সুবৃহৎ এই আখ্যানকাব্যের পরিচয় ও চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীকে তুলে ধরার জন্য বিপ্রদাস পিপলাই-এর ‘মনসাবিজয়’, বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’, নারায়ণদেবের ‘পদ্মাপুরাণ’ ও জগজ্জীবন ঘোষালের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গের কবি বিপ্রদাস পিপলাই-এর ‘মনসাবিজয়ে’ মনসা পূজা দিতে চাঁদ সদাগর আপত্তি করলেও মনসা যে শিবেরই আত্মজা, সেকথা শুনে চাঁদ নিজেকে অপরাধী মনে করে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং শেষে মহাসমারোহে পূজা দেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যেও মনসার জয় ঘোষণা করতে গিয়ে চাঁদকে অনেক বেশি হেনস্থা হতে দেখা যায়। মনসাদেবীর দেবমহাত্ম্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে চম্পকনগরের অধিপতি চাঁদ সদাগর দেবীর পূজো দেয়। দেবতাদের প্রাধান্যের কারণেই মনসা ও চণ্ডী একাকার হয়ে উঠেছেন অনেক সময়। তবে সপ্তদশ শতকে দেবতার থেকে মানবতার প্রাধান্য শুরু হওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের ‘মনসামঙ্গলে’ চাঁদের পূজা পাওয়ার জন্য মনসার দৈবিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখা

যায় না। শেষ পর্যন্ত মনসা পূজা দিলেও অনেক দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে চাঁদ। গতানুগতিক কাহিনীকে নিয়ে জগজ্জীবন মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করলেও যুগভাবনাকে অস্বীকার করতে পারেননি। সরাসরি নরনারীর প্রেম নিয়ে আরাকান রাজসভার কবিগণ — দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল যেখানে কাব্য রচনা করেছেন, সমসাময়িক জগজ্জীবনের কাব্যেও তার প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে মনসাকথার প্রভাবের ফলে এক নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টি হয়। লোকসাধারণের দেবীকে নিয়ে কবিগণ মধ্যযুগে আখ্যান কাব্য রচনা করেছিলেন, আধুনিক ও উত্তরআধুনিক যুগে এই মনসাকথা নতুন ভাবে উঠে এসেছে আমাদের কাছে। চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর ও সনকা চরিত্রগুলিরও ঘটেছে বিনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও নবনির্মাণ। আধুনিক যুগের কঠিনতম সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মনুষ্যত্বের ক্ষয়ের ফলে অবলুপ্তি ঘটেছে মানবতার, মানুষের চিন্তা-চেতনার, বুদ্ধির, আনন্দের। এই সংকটময় প্রেক্ষাপটে মানুষের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য উজ্জ্বল অতীতকে আশ্রয় করেছেন কবি-সাহিত্যিকগণ। এভাবেই দেবী মনসার মাহাত্ম্য, চাঁদ সদাগরের ঔদার্য, বেহুলার কল্যাণময়ী রূপ আমাদের সামনে উঠে এসেছে বিশ শতক থেকে আজকের একুশ শতকেও।

মনসামঙ্গলের বেহুলার সতীত্ব, পাতিব্রাত্য, আদর্শের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে ও লৌকিক দেবীর এই কাব্যকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আচার্যদীনেশচন্দ্র সেন লেখেন ‘বেহুলা’ রচনাটি। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে তৎকালীন বাংলার নারীদের মধ্যে যে পরিবর্তন, তার ফলে সাত শত বছর ধরে বাংলার নারী সমাজের আরাধ্যের পূজারী বেহুলার প্রতি অবহেলার ভাব না আসে, তাই আশা করেছেন লেখক। রচনাটির শেষে, বেহুলার সতীত্ব সম্পর্কে সমাজ থেকে প্রশ্ন উঠলে সে নিজেই সতীত্বের পরীক্ষা দেয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নারীর সম্মান রক্ষায় প্রয়াসী হয়।

প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী মন্মথ রায় মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এই নাট্যসংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব মুখরিত হয়েছে মনসা ও চাঁদ সদাগরের মধ্যে। মনসা কখনো ভ্রাতৃসম্বোধন করেছেন চাঁদকে, আবার কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। শেষে দেবী মনসা ও দেবাদিদেব মহাদেব একে অপরের পরিপূরক বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’তে বৃদ্ধ প্রসন্ন শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখতে পারেনি। পরিবার ও সমাজের যুপকাঠে বলী হয়ে ধুলোয় মিশেছে তার পূর্ব জীবনের ঐশ্বর্য। তাই নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য বিদূষক চরিত্রের অভিনয়ের দিকে পা বাড়ায়। অন্যদিকে শম্ভু মিত্র ‘চাঁদ বণিকের পালা’তে মনসাকে বিশ শতকের শেষার্ধের কুটিল সমাজ, স্বার্থান্বেষী, অসৎ সময়ের

প্রতিভূ রূপে দাঁড় করিয়েছেন। চাঁদ সদাগর হয়ে উঠেছেন সত্যের পূজারী, আলোর পূজারী। বরাক উপত্যকার অন্যতম নাট্যকার খানিকটা মন্থরায়ের ‘চাঁদ সদাগরে’র মতো মনসাদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যান কাব্যের নট্যরূপ উপস্থাপন করেছেন একুশ শতকের প্রারম্ভে ‘মনসা কথা’ নাটকে। পঞ্চদশ শতকের তুর, সংগ্রামী মনসাদেবী একুশ শতকে এসে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বাহুবলের দ্বারা যে কোন শুভ কাজ হয় না, তাঁর মানসিকতায় সেটি ধরা পড়েছে। ধৈর্য্যশক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তাচেতনার দ্বারা যে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, মনসা তাই দরিদ্র মাঝিমাল্লাদের চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগে উত্তেজিত না হয়ে তাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তবে অন্যায়কে কোনভাবেই প্রশয় দিতে নারাজ তিনি। এইভাবে শেখর দেবরায় উত্তর আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। মনসা ও চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্ব, তৎসঙ্গে বেহুলা-লখীন্দরের আধুনিকীকরণ তা আলোচিত নাটকগুলির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। চরিত্রগুলি মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের হলেও নাট্যকারের হাতে তারা হয়ে উঠেছে একেবারে আধুনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের চাঁদ চরিত্র যেমন সত্যের পথে পাড়ি দিয়ে বিফল হয়েও সত্যকে জীবনের চলার পাথেয় করে রাখে, তেমনি লখীন্দর চরিত্র তাঁর নিজস্ব আইডেনটিটি খোঁজার ব্যাকুলতায় কোথায় যেন বিপন্নতা বোধ করে। মধ্যযুগের বেহুলা যেমন সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েও স্বামীকে ফিরিয়ে এনে স্বামী বা সমাজের কাছে নিজের সতীত্বের পরিচয় রাখতে পারে না, তেমনি এই বেহুলা আধুনিক যুগেও শিকার হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জালে। মধ্যযুগের বাতাবরণকে বজায় রেখে আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে চরিত্রগুলো বর্তমানকালের জীবন জটিলতার চূড়ান্ত মাত্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সমকালীন বাস্তবতা ও চাহিদার নিরিখে আধুনিক কবিদের হাতেও মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাহিনী ও চরিত্রগুলি যুগাতিক্রমী হয়ে উঠেছে। কবিদের অকৃত্রিম সহৃদয়তায়, পর্যবেক্ষণ শক্তি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিতে উঠে এসেছে আধুনিক যুগের মূল সত্য, মানুষের চরিত্র, ও মানব রস। কবিদের হাতে উঠে এসেছে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনামাখা বাস্তব মানুষ। কবি কালিদাস রায় তাই একদিকে যেমন মানবতাবাদের পূজারী করে তুলেছেন চাঁদসদাগরকে, তেমনি ‘বেহুলা’ কবিতায় বেহুলাকে ক্রমশ এক সময়জয়ী নারীতে সম্প্রসারিত করেছেন। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য বঙ্গদেশের জনজীবনে প্রায় মিথ হয়ে ওঠা বেহুলাকে রূপান্তরিত করেছেন এক বিপ্লবী নারীতে। তাঁর কবিতায় মৃত প্রাণ প্রেমিকটি সাময়িক ও শাস্ত্রের দ্বন্দ্ব আদৌ বাঁচবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে এই বেহুলারূপী নারীর উপরেই। এইভাবে মধ্যযুগের বেহুলাকে কাব্যভূমির বাস্তবে স্থাপন করেছেন কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দীপঙ্কর মাহমুদের কবিতায় বেংলার ভেলাও হয়ে উঠেছে সংগ্রামের হাতিয়ার। আধুনিক সংগ্রাম মুখর, রাজনৈতিক অস্থিরতাময় যুগে কবি শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী, কৃষ্ণ বসুর কবিতায় মধ্যযুগের চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি ও চৌদ্দডিঙা মধুকর মানবিক রূপ লাভ করেছে। আবার আসাম প্রদেশের বরাক উপত্যকার কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর ‘মনসা-মঙ্গল’ কবিতায় উঠে এসেছে নদী কেন্দ্রীক গ্রামবাংলার ঘরের ছবি। সেই সঙ্গে কবি উত্তম দাশের ‘এ কালের মঙ্গলকাব্য’ কাব্যগ্রন্থের মনসামঙ্গলকে প্রেক্ষাপট করে রচিত কবিতাগুলিতে উঠে এসেছে জীবনানন্দ দাশের ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতার মতো বাংলার নদী-মাঠ-ঘাট, ভাটফুল ও ঘুঙুরের শব্দ। অন্য দিকে নারীর অধিকারবোধ, আত্মচেতনা উঠে এসেছে জিয়া হায়দারের কবিতায়।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় চাঁদ সদাগরকে কেন্দ্র করে রচিত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ রচনাটিতে নায়ক চাঁদ শোষক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি আজু মৃধার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সে নিজ অধিকার। সে বাম হাতে পূজা বা আপোষের পক্ষপাতী নয়, তাই ধড় থেকে আলাদা করে দেয় আজু মৃধার মুণ্ড।

লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা ও অশুভ শক্তির প্রকোপে পড়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার চিত্র বর্ণিত। তবে প্রাচীন পল্লব-চোল রাজত্বকালের আবহ রয়েছে উপন্যাস জুড়ে। শেষে চাঁদের মৃত্যুকে জয় করে নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে আশার আলো পাওয়া গেলেও সেলিনা হোসেনের নির্মিত চাঁদের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি এই চাঁদ। অন্যদিকে ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ উপন্যাসের রমানাথ বাবুকে অনেকটা অসহায় করে ফেলেছেন লেখক সত্যপ্রিয় ঘোষ। ভাগ্যের পরিহাসে সে একজন পরাজিত ব্যক্তি, নিজেকে সে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছেন। বিশ শতকের শেষের দশকেই কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন মনসামঙ্গলের লখীন্দরকে নিয়ে রচিত করেছেন ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর’ উপন্যাস। তবে লখীন্দর বিদ্যাধরীর সঙ্গে প্রেমে মত্ত হয়ে, নিজেকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হলে শেষপর্যন্ত এক সার্থক পুরুষ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে সে সমাজ-পরিবার ছাড়তেও পিছুপা হয়নি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত আধুনিক এই উপন্যাসগুলিতে মনসা-কথার নবনির্মাণ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ের আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নবনির্মাণে প্রত্যেকটি ছোটগল্পই বেংলাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘বেংলা’ রচনাটি যে গ্রামকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে সেটির নাম বেংলা, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নামও বেংলা। প্রত্যন্ত গ্রামের লোকদের

মধ্যে এই বেহুলার মিথ এমনভাবে মিশে রয়েছে যে তারা নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে কাল্পনিক গল্পও নির্মাণ করেছে। চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ দেবসভায় নির্লজ্জ লাস্যনৃত্যের জন্য অভিশাপগ্রস্ত হয়ে সর্পদংশিত মৃতদেহ হয়ে নিয়ে যায় সারাজীবন। এর সমাপ্তি কবে কেউ জানে না। তবে সাপের আড়তে আগুন লাগিয়ে অভিশাপ নিবারণের চেষ্টা করে গ্রামের দারিদ্র মানুষেরা। এখানেই গল্পটির সার্থকতা ও অভিনবত্ব। বিমল করের ‘বেহুলা’তে আবার দেখা যায় বেহুলা নামের ছোট একটি মেয়েকে। পিতা-মাতা হীন এই মেয়েটি লোকের বাড়িতে কাজ করে বেঁচে থাকে। অসহায় এই মেয়েটি মনসাপুরাণের বেহুলার মতো সাহসী না হলেও একসময় নিজের সন্তানদের দ্বারা প্রতারিত বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও স্ত্রী ইন্দুমতীর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তাই বৃদ্ধ ঠাকুরদা ভাবেন এখনো তাদের বসার জায়গা আছে। ‘সতত বেহুলা’তেও লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় বেহুলাকে নির্মাণ করেছেন আরেক দৃষ্টিভঙ্গিতে। রিটারারের পরে পনেরোটি বছর কেটে গেছে, তবুও শান্তিনাথ একাকিত্বের জীবন কাটায়। স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের নিয়ে ভরাট সংসারেও সে বিচ্ছিন্ন। টুকটাকি কাজ নিয়ে এলোমেলোভাবে সারাদিন কাটিয়ে রাত্রের অন্ধকারে তার একমাত্র আশ্রয় হয় পুরনো টিভি চ্যানেল। বেহুলার ভেলাতেই সে ভেসে যেতে চায় আনন্দময় জীবনের আশায়। মনসাপুরাণের বেহুলা যেমন লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে এনেছিল নিজের সততার উপর নির্ভর করে, শ্বশুরের চৌদ্দডিঙা ফিরিয়ে এনে শেষে মনসার সঙ্গে হৃন্দের অবসান ঘটিয়েছিলেন। শান্তিনাথের তাই বেহুলা ও তার ভেলাতেই ভরসা। এইভাবে বেহুলা চরিত্রের অভিনব ব্যঞ্জনা উঠে এসেছে ছোটগল্পগুলিতে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত আটটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণের আলোচনায় আমরা যে আধুনিক রচনাগুলি পেয়ে থাকি, সেগুলির প্রায় সবগুলিতেই দেবী মনসার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর ও সনকা চরিত্রগুলি। আসলে যুগের পরিবর্তনের ফলে দেবী মনসাও আধুনিক নারীতে পরিণত হয়ে দেবী মহিমার বদলে মানবতাবাদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর ও সনকাকে নিয়ে গদ্য আখ্যান, নাটক, কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার প্রবণতা বেশি দেখা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কবি-সাহিত্যিকগণ আহ্বান করেছেন অতীতের এই ঐতিহ্যশালী চরিত্রগুলি। যারা তৎকালীন দোলাচলতার যুগে আদর্শ চরিত্র রূপে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করবে। এইভাবে কবি সাহিত্যিকের নিজস্ব ভাবনায়, আলাদা আলাদা প্রকরণে চরিত্রগুলি নতুন রূপে উঠে এসেছে। তাই বলা যায় মধ্যযুগের মনসামঙ্গলগুলিতে চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখীন্দর, সনকা ইত্যাদি চরিত্রগুলি নিয়ে যে মনসার কাহিনী, তা আধুনিক সাহিত্য সংরূপে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ নবনির্মাণ

ঘটেছে। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান গঠিত হয় না, আবার বর্তমানের উপরেই নির্ভর করে ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বলতা, বর্ণময়তা ও সার্থকতা। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপে যেমন মনসা-কথার নবনির্মাণ ঘটেছে, তেমনি লিখিত এই সাহিত্যগুলির পথ ধরেই পরবর্তী কবি-সাহিত্যিক আরো অভিনব শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিবেন, এই শুভাকাঙ্ক্ষা আমরা নিঃসন্দেহে মনের গোচরে পোষণ করতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

আকর গ্রন্থ

১. কর, বিমল : 'বাছাই গল্প', মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন-১৩৮৭, দশম মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২০।
২. খান, রফিকউল্লাহ (সম্পা.) : বাংলাদেশের তিনদশকের কবিতা, একুশে পাবলিকেশন, ২/২ ই, ইডেন কমপ্লেক্স, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, ২০০৫।
৪. গোস্বামী, জয় : শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৮এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলিকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০০৮।
৫. ঘোষ, শঙ্খা : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭০।
৬. ঘোষ, সত্যপ্রিয় : স্বপ্নের ফেরিওয়ালা, প্রত্যয়, প্রথম প্রকাশ-কালপ্রতিমা সাহিত্যপত্রে শারদীয় ১৪০৬ গ্রন্থাকারে ৭ নভেম্বর ১৯৯৯, ২০ কার্তিক ১৪০৬।
৭. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: বইমেলা মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪।
৮. দাশ, উত্তম : একালের মঙ্গলকাব্য, মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা-১৪৪, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৩।
৯. দাশ, জীবনানন্দ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৩/১, বক্সিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪।

১০. দাশগুপ্ত, শ্রী জয়ন্তকুমার (সম্পা.): কবি বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ
১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯।
১১. দাশগুপ্ত, শ্রী তমোনাশচন্দ্র (সম্পা.): সুকবি নারায়ণদেবের ‘পদ্মাপুরাণ’, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম
মুদ্রণ: ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ-২০০৯।
১২. দাস, ড. আশুতোষ;
ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র (সম্পা.) : কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬০।
১৩. দে, বিষ্ণু : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম
প্রকাশ: জ্যেষ্ঠ ১৩৫২, জুন ১৯৯৫।
: স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত ও আরো কিছু কবিতা, দে’জ
পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ
১৩৮০।
১৪. দে, সুধাংশুশেখর (সম্পা.) : অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র (৯ম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং
হাউস, ১৩ বঙ্কিমচাঁটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম
প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০।
১৫. দেবী, মহাশ্বেতা : বেহুলার বারোমাস্যা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:,
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ:
বৈশাখ ১৪১৪।
: ছোটগল্প সংকলন (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত), ন্যাশনাল
বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩ (শক ১৪১৪)।
১৬. নাগ, রমাপ্রসাদ : অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র-৯, গ্রন্থনা অপূর্বজ্যোতি
মজুমদার, এনাক্ষী মজুমদার, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,
প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৭।
১৭. বসু, সুশান্ত (সম্পা.) : সঞ্চয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠকবিতা, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম
চাঁটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন
১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০২।

১৮. বসু, কৃষ্ণা : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০০, মাঘ ১৪০৯।
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ ও
দে, ড. সন্ধ্যা (সম্পাদনা) : নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১।
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা কবিতার কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: ১৪০৭, আশ্বিন, অক্টোবর ২০০০।
২১. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ (সম্পা.): 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-০৭, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ: ২০১১।
২২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ: ১৯৫৪।
২৩. ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সম্পা.): কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমী, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন স্ট্রিট-০১, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬১, ষষ্ঠ মুদ্রণ: ২০০৫।
২৪. মিত্র, তন্ময়; করিম, মীর রেজাউল
ও যশ, সুবোধ কুমার (সম্পা.): মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ২১ জুলাই, ২০১০।
২৫. মিত্র, অরুণ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: নববর্ষ ১৪০৬, এপ্রিল ১৯৯৯।
২৬. মিত্র, শম্ভু : চাঁদ বণিকের পালা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৪।

২৭. রায়, মন্মথ : গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড), বসুমতী সাহিত্য মন্দির (বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড), কলকাতা, বিপিনবিহারী, প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭৯।
২৮. সেন, অভিজিৎ : ‘বিদ্যার্থী ও বিবাগী লখিন্দর’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১।
২৯. সেন, সুকুমার (সম্পা.) : বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসাবিজয়’ দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৫৩।
৩০. হায়দার, জিয়া : শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮৭।
৩১. হোসেন, সেলিনা : ‘চাঁদবেনে’ আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, সন্ধানী পত্রিকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৫।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আলি আকতার, অনিরুদ্ধ : চাঁদ বণিকের পালা-প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা, গ্রন্থ বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯।
২. আহমদ, শরীফ : বাংলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব, অনন্যা, ৩৮/২ বাংলা বাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ-আগস্ট ২০০৭।
৩. আহমদ, শরীফ : মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, সময় প্রকাশন, ৩৮/২ ক বাংলা বাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০০।
৪. ইসলাম, রেজওয়ানুল : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য, পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন, বুকস স্পেস, সংকলন ও সম্পাদনা ২২এ, কলেজ রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১২।

৫. ইরফান, হাবিব : অনুবাদ : শৌভিক মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতা পাঠ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ‘নেহেরু ভবন’, ৫ ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, বসন্ত কুঞ্জ, ফেস-II, নয়াদিল্লী-১১০০৭০।
৬. কর, বিমল : সময় অসময়ের উপাখ্যানমালা, সম্পাদনা-উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, উর্মি রায়চৌধুরী, শচীন দাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা ২০১৪।
৭. কুণ্ডু, শম্ভুনাথ : প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ডাকসূচকসংখ্যা-৭১৩১০৪, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬।
৮. খালেৎ, মুহম্মদ আবদুল : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫।
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ : ‘বাংলা সাহিত্য : একাল ও সেকাল’ (উনবিংশ/বিশ শতকের রচনার মধ্যযুগের কাব্যের প্রভাব) পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, ১৫ এপ্রিল ২০১২।
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ : সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম ‘মিত্র ও ঘোষ’ সংস্করণ শ্রাবণ-১৪০৫।
১১. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পুস্তক বিপণি সংস্করণ: জুলাই ২০১২।
১২. গুপ্ত, ক্ষেত্র : প্রাচীনকাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০৮।

১৩. গুঁই, ড. মৃত্যুঞ্জয় : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস,
সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬,
প্রথম প্রকাশ: মহালয়া ১৩৯৯, সেপ্টেম্বর ১৯৯২,
পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর ২০০৮, কার্তিক ১৪১৫।
১৪. ঘোষ, কবিতা : সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য, পুস্তক
বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম
প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৯৪।
১৫. ঘোষ, ড. জয়ন্তী : মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন, পুস্তক বিপণি, ২৭
বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারি ২০০০।
১৬. ঘোষ, ড. অজিতকুমার : বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,
প্রথম দে'জ সংস্করণ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি
২০০৫, মাঘ ২৪১১।
১৭. ঘোষ হাজরা, আনন্দ : সাহিত্যবিচারে অবয়ববাদ, উত্তরাধুনিকতা ও
উপনিবেশবাদ, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ, দে স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৩।
১৮. চক্রবর্তী, গোপিকারঞ্জন : বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ, বাংলা একাডেমী,
বর্ধমান হাউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯।
১৯. চক্রবর্তী, ড. পঞ্চানন : 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', সাহিত্যলোক,
৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ
১৪০২।
২০. চক্রবর্তী, বিপ্লব : তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য স্বরূপ ও বৈচিত্র্য, রূপসী
বাংলা, ২০এ রাধানাথ বোস লেন, কোলকাতা-০৬, প্রথম
সংস্করণ: ২০১৩।
২১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন;
রায় কৃষ্ণগোপাল (সম্পা.) : সাহিত্য-প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/
২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ :
বসন্তৎসব, ২০০৪।

২২. চৌধুরী কামিল্যা, মিহির : আঞ্চলিক দেবতা: লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ডাকসূচক সংখ্যা-৭১৩১০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০০।
২৩. চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র ১৩৯১, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০১৬, আষাঢ় ১৪১২।
২৪. চৌধুরী, শামসুদ্দিন : ধ্রুপদী মিথলজি, বর্ণায়ন, ৬৯, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৩।
২৫. ত্রিপাঠী, দীপ্তি : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বক্ষিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৫৬, আগস্ট ১৯৫৮।
২৬. দাশ, শিশিরকুমার (সম্পা.) : সংসদ 'বাংলা সাহিত্য সঙ্গী' সংকলন, সাহিত্য সংসদ, প্রা: লি:, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৩।
২৭. দাসগুপ্ত, তমোনাশ চন্দ্র : প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮।
২৮. দাসগুপ্ত, কৌশিক : ইতিহাসের সন্ধানে মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যজীবনী কাব্য, শ্রীভারতী প্রেস, ৮১/৩ এ রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা-৪৭, প্রথম প্রকাশ: মহালয়া ২০১১।
২৯. দে, অপূর্ব (সম্পা.) : চাঁদ বণিকের পালা— আধুনিক উপাখ্যান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: বড় দিন, ২০০৩।
৩০. দেবী, মহাশ্বেতা : 'অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ', নির্মল ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৮।

৩১. নস্কর, সনৎকুমার : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিয়া পাবলিকেশন, ১৪৪/১ এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৫/০৮/২০১২।
৩২. নস্কর, সনৎকুমার : সাহিত্য-প্রবন্ধ সেকাল-একাল, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৪১১/ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।
৩৩. নস্কর, সনৎকুমার : আধুনিক বাংলা সাহিত্য নানা কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২০, এপ্রিল ২০১৩।
৩৪. নস্কর, সনৎকুমার : সাহিত্য-বীক্ষণ : উৎস থেকে মোহনায়, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৯।
৩৫. নস্কর, সনৎকুমার : মনসামঙ্গল-কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১লা জানুয়ারী, ২০১১।
৩৬. নাগ, রমাপ্রসাদ : স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০২।
৩৭. নাগ, রমাপ্রসাদ : 'অমিয়ভূষণ : ট্রমাচিহ্নিত এপিক', ভাষা প্রকাশনী, ৩/৫২ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২, প্রথম প্রকাশ: ২০০৮।
৩৮. প্রামাণিক, বর্ণালী : লোকঐতিহ্যের দর্পণে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, বড়দিন, ২০১২।
৩৯. পোদ্দার, অরবিন্দ : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: কার্তিক, ১৩৫৯, অক্টোবর ১৯৫২, পঞ্চম মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৯।
৪০. বসু, গোপেন্দকৃষ্ণ : বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: ১৯৭৮, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৯৮।

৪১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ : দেশভাগ দেশত্যাগ, অনুষ্ঠাপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০০৭, অনুষ্ঠাপ সংস্করণ: ২০১০।
৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : ‘বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা’, উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট ১৯৮৩।
৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন ও চৌধুরী, কমল, (সম্পাদনা) : মধ্যযুগের বাঙ্গালা, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২।
৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ : মধ্যযুগের সাহিত্যে গতানুগতিকতা-বনাম মৌলিকতা’ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৮, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১২।
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রবীন্দ্রনাথ (সম্পা.): মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নির্বাচিত প্রবন্ধ, সাহিত্য সঙ্গী, ৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, ২০১১।
৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পরিবর্ধিত পঞ্চম দে’জ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩।
৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত : ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’ মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ-২০০৬।
৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : ‘বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা’ (প্রথম খণ্ড), আদি ও মধ্যযুগ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ-১৯৯৯।
৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা:লি:, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩,

পুনর্মুদ্রণ: ২০০৬-২০০৭।

৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬২।
৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (প্রথম খণ্ড), মডার্ন বুক
এজেন্সী প্রা:লি:, ১০ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৯, সপ্তম সংস্করণ: ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ
২০১৬-১৭।
৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ন বুক
এজেন্সী প্রা:লি:, ১০ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৮৩, পুনর্মুদ্রণ
২০১৫-১৬।
৫৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক
এজেন্সী প্রা:লি:, ১০ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৯-১০,
পুনর্মুদ্রণ ২০১৫-১৬।
৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পা.): বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, বক্সিমচ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ:
১৯৮৬, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০২।
৫৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পা.): বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, বক্সিমচ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ:
১৯৮৬/এ, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০২/বি।
৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : মঙ্গলকাব্যে নিন্দবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম
প্রকাশ: শারদোৎসব, ২০০৯।

৫৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : মঙ্গলকাব্যের নিম্নবর্গের অবস্থা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।
৫৮. বাগচী, অমিয় কুমার : সংস্কৃতি সমাজ অর্থনীতি, অনুষ্ঠাপ প্রকাশনী, ২ ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৫, অনুষ্ঠাপ সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১০।
৫৯. বিশ্বাস, অচিন্ত্যকুমার (সম্পা.): বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০০২।
- : মনসামঙ্গল-বিপ্রদাস পিপলাই, রত্নাবলী, ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল, ২০০২।
৬০. বেরা, মঞ্জুলা : দৌলত কাজীর সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ-রথযাত্রা, ২০১৬।
৬১. বেরা, মঞ্জুলা : বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন, ১৪০৬, দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিবর্তিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৯।
৬২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা:লি., ২, বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রিট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা, পরিবর্তিত একাদশ সংস্করণ- ২০০৬।
৬৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর : ‘আখ্যানের সাতকাহন’, অমৃতলোক সাহিত্যপরিষদ, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৬।
- : সময় : সমাজ : সাহিত্য, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: অঘ্রাণ ১৪১৭, ডিসেম্বর ২০১০।

৬৫. ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার : ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর’, বাকপ্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ২০১২।
৬৬. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ : হিন্দুদের দেব-দেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব ও তৃতীয় পর্ব), ফার্মা কে. এল.এম. প্রা:লি:, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪।
৬৭. ভট্টাচার্য, শ্রীপরেশ চন্দ্র : সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (আদি ও মধ্যযুগ), জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ৮এ কলেজ রোড, কলিকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ: ফাল্গুন, ১৪১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২।
৬৮. মুখোপাধ্যায়, ড. সুশোভন : শঙ্কুমিত্রের চাঁদ বণিকের পালা পুনর্মূল্যায়ন, সাহিত্য সঙ্গী, ৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪১৮/১৫ এপ্রিল, ২০১১।
৬৯. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : ‘কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ২২ মার্চ ২০১১।
৭০. মুখোপাধ্যায়, ড. বাস্তীকুমার : আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, প্রকাশভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ, ১৩৭৬, এপ্রিল ১৯৬৯।
৭১. মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ড-প্রাচীন যুগ), মাওলা ব্রাদার্স ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৫৩, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০১১।
৭২. মিশ্র, ড. অশোককুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস (আধুনিক পর্ব: ১৮০০-২০১২), সাহিত্য সঙ্গী, ৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট (দ্বিতল), কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

৭৩. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার : সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের অন্তরমহলে, এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৪১৮/আগস্ট ২০১১।
৭৪. মোশেল, বাসুদেব (সম্পা.) : বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, বুকস্ ওয়ে, কলকাতা, পাবলিশার্স, অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৮৬এ, কলেজ স্ট্রিট, (ওয়াই.এম. সি.এ. বিন্ডিং), কলকাতা-৭৩।
৭৫. মিত্র, শাঁওলি (সম্পা.) : রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, আনন্দ পাবলিকেশন, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪।
৭৬. মিত্র, শাঁওলি (সম্পা.) : শম্ভু মিত্র : ধ্যানে ও অন্তর্ধানে, নান্দনিক-১০/২এ টেমার লেন, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।
৭৭. মৈত্র, অলোক : বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধান, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি-২০০০, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৮।
৭৮. মণ্ডল, ড. ইন্দুভূষণ : বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান, সাহিত্যলোক, ৩২/ ৭ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৯।
৭৯. মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড- মধ্যযুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা:লি:, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪।
৮০. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : বাংলায় ধর্ম সাহিত্য (লৌকিক), ডি.এম. লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৮৮।
৮১. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন : প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্ত্যজ জীবন, করুণা প্রকাশনী, ৮/১ টেমার লেন কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩৩।
৮২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত : মনসামঙ্গলের ইতিবৃত্ত, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ২৫ ফাল্গুন, ১৪০৭।

৮৩. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথ্য ও কালক্রম’, ভারতী বুক স্টল, ৯৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭।
৮৪. মল্লিক, দীপঙ্কর : ‘মধ্যযুগ ফিরে দেখা’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
৮৫. রায়, অলোক (সম্পা.) : শতাব্দী সাহিত্য পরিক্রমা অব্যয় লিটারারি সোসাইটি, জি সি ৬৬, সেক্টর তিন, সল্টলেক, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ: ১৫ ই আগস্ট ২০১৩।
৮৬. রায়, মন্মথ : প্রসঙ্গ, নাট্যকার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০।
৮৭. রায়, ড. বাসুদেব : মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ)।
৮৮. রায়চৌধুরী, উর্মি ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা (সম্পা.): ‘অনুদিত ও অনুসারী বাংলা সাহিত্য’, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৬.০২.২০০৫, ৯২ এ.পি. সি রোড, কলকাতা।
৮৯. রায়, নীহাররঞ্জন : ‘বঙ্গালীর ইতিহাস’ (আদিপর্ব), দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬।
৯০. লাল, ড. আদিত্যকুমার : মনসামঙ্গল কাব্য: জীবনদৃষ্টির বিচিত্র দর্পণে, কল্যাণী পাবলিকেশন, দপ্তর (অস্থায়ী): একুশ শতক, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোল-৯, প্রথম প্রকাশ: ১ ডিসেম্বর, ২০১০।

৯১. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ : বাংলা সাহিত্যের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০, প্রথম সংস্করণ : মার্চ-১৯৬৫, তৃতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০০৭।
৯২. সরদার, আবদুস সাভার : কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে, সুচয়নী পাবলিশার্স, ৩৮/২ ক বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম সুচয়নী সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১০।
৯৩. সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল; ভট্টাচার্য শিবপ্রসাদ; ঘোষ, ড. প্রদ্যোৎ (সম্পা.): কবিশেখর কালিদাস রায় সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৮০।
৯৪. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী : ‘মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, এপ্রিল ২০০১।
৯৫. সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পা.) : ‘লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৫।
৯৬. সেন, মজুমদার জহর : মধ্যযুগের কাব্য-স্বর ও সংকট’ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৯।
৯৭. সেনগুপ্তা, জয়া : মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, ক্যাম্প, ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০১।
৯৮. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯১, ষষ্ঠ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১১।
৯৯. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৩৯৮, ষষ্ঠ মুদ্রণ-আষাঢ় ১৪১০।

১০০. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৫০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ-আষাঢ় ১৪১০।
১০১. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬, তৃতীয় মুদ্রণ: অক্টোবর ২০০২।
১০২. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মে ২০১২।
১০৩. সেন, সুকুমার : প্রবন্ধাবলী (বিচিত্র দেবতা—প্রথম খণ্ড), এ.কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, জন্মাষ্টমী, ১৯৯১।
১০৪. সেন, সুকুমার : প্রাচীনযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৫০।
১০৫. সেন, সুকুমার : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫২।
১০৬. সেন, সুকুমার : বঙ্গভূমিকা (খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রীষ্ট পর), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-২০, আকাদেমি সংস্করণ-মে ১৯৯৯।
১০৭. সেনগুপ্ত, পল্লব : পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৮৪।
১০৮. সেন, ক্ষিতিমোহন : বাঙলায় মনসাপূজা, প্রবাসী, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩২৯।
১০৯. Prodyot Kumar Maity : Historical Studies In The Cult of Goddess Manasa (A Socio-Cultural Study), Punthi Pustak, First published April, 1966.

১১০. Das Gupta, T.C. : Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature, University of Calcutta, A.D. 1935.
১১১. Sen, Sukumar : The Great Goddess in Indic Tradition, Papyrus, August, 1983.
১১২. O' Flaherty W.D. (1981): Sexual Metaphors and Animal Symbols in Indian Mythology, Delhi Motilal Banarasidass (1st ed. women Androynes and other Mythical Beasts, University of Chicago , 1980)
১১৩. Delno Ames : Greak Mythology, Paul Hamlyn Limited, West Book House, London, 1963.
১১৪. হাইত, তাপস : 'চাঁদ বণিকের পালা', পালাকার শম্ভু মিত্র, ভারতী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১১।
১১৫. হালদার গোপাল : 'বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা' (প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ), অরুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ-১৪০০, ষষ্ঠ মুদ্রণ-মাঘ ১৪১৯।
১১৬. হালদার, গোপাল : সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৪৮, প্রথম প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ: শ্রাবণ, ১৪১৯।

পত্র-পত্রিকা

১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, যুগ্ম সম্পাদক সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর, পত্রিকা দপ্তর - ৭৮ এ, বিবেকানন্দ সরণী, কলকাতা-৭৮, ১ম বর্ষ ১ সংখ্যা, ফাল্গুন-শ্রাবণ ১৪০৯।
২. নাট্যচিন্তা, শম্ভু মিত্র জন্মশতবর্ষ, সম্পাদক রথীন চক্রবর্তী, থিয়েটার ও পারফরমিং আর্ট বিষয়ক গবেষণাপত্র, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন পত্রিকা-বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১-৬, নভেম্বর ২০১৪, এপ্রিল ২০১৬।
৩. 'ঐকিক', মনসামঙ্গল কাব্যসংখ্যা, সম্পাদক মিঠুন দত্ত, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক পত্রিকা,

প্রথম বর্ষ ২০১৫।

৪. ‘কোরক’, মঙ্গলকাব্য ও কাব্যচর্চা, কোরক, পো: দেশবন্ধুপাড়া, ইএ ১/৮ বাগুইহাটি,
কলকাতা-০৫, শারদ ২০১৬।

৫. ‘হিজল’, সম্পাদক, সৌরভ রায়, বর্ষ-২১, সংখ্যা ২য়, প্রকাশ: ২৫শে ডিসেম্বর ২০১৪।

৬. ‘সংসপ্তক’, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পত্রিকা অধিকর্তা উৎপল মণ্ডল, সম্পাদক উত্তম দাস,
(ডিসেম্বর ২০১৭)

৭. ‘সাহিত্য চিন্তা’ গবেষণাধর্মী বার্ষিক পত্রিকা, সেবাপল্লী শান্তিনিকেতন, বীরভূম ১ম বর্ষ, ২
সংখ্যা, বইমেলা-২০১৪।

নির্ঘণ্ট

অ

অধ্যাত্ম চিন্তা- ৪

অতিপ্রাকৃতিক -৪৫

অষ্টিক- ৬

অনাথ- ৬,১০

অশ্বলায়ন - ৬

অঙ্গরা -৬

অশ্ব বৃক্ষ - ৯

অধিষ্ঠাত্রী দেবী -১৩

অন্নদামঙ্গল - ১৪,১৭০

অনুপম ঘাট -২১

অষ্ট মঙ্গলা- ২৪

অথ মনসাকথা - ১০৮

আ

আদিমকালে - ৪

আদিপুরুষ - ৫

আর্য - ৬,১৪

আদিবাসী- ৬, ৮

আস্তিক -১১

আসাম - ১১, ১৬, ৩৮, ২৪৪

আকতার, অনিরুদ্ধ - ১১৯

ই

ইলিয়াড -৫

ইন্দ্র - ৫

ইউফ্রোটিস - ৭

ইন্দ্রিয়- ৯

ইচ্ছাপুর - ২১

ইসলাম, কাজী নজরুল-১২০

ইসলাম, রেজাউল -২৪৭

উ

উপ-পুরাণ - ৮

উত্তর ভারত - ৬

উপাত্য - ৯

উত্তরবঙ্গ - ১১, ৩৮, ৪৭, ২১৫

উজান - ১০৮

উ

উষা, অনিরুদ্ধ - ২৪, ৩১, ৪৫

ঋ

ঋকবেদ - ৬

ঋষি কশ্যপ - ৬

ঋতুমঙ্গল - ১২১

ও

ওডিসি- ৫

ওঁরাও - ৬,২৩৬

ওঝা- ৭৮

ওঝাপালি - ১১

ক

কর, বিমল - ৫৮, ২২৮

কুলিণ-কুল-সর্বস্ব - ৬৮

কুন্দ -১২১

কিশলয় - ১২১

কবিগুরু - ৫

কালু রায় - ৫

কালিমঙ্গল - ১৪

কানাহরিদত্ত - ১৬

কুমার হট্ট - ২১

কাঁকদহ - ২১

কালনাগিনী - ২৩

খ

খান, রফিকউল্লাহ - ১৬৯

খড়দেহ - ২১

গ

গোস্বামী, জয় - ৫৬, ১২১, ১৬৯, ২৪৪

গড়াই, মাধব - ৮৪

গঙ্গাস্নান - ৯২

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল - ১৭১

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ - ১৭১, ২২৮

গুহ, প্রবোধচন্দ্র - ২০৯

গ্রীক - ৪

গৌরী - ৬

গাছবেড়া - ৮

কাকিনাড় - ২১

ঘ

ঘোষ, শঙ্খ - ৫৬,

ঘোষ, সত্যপ্রিয় - ৫৭, ১৭১

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র - ৬৮

ঘোষ, ড. জয়ন্তী - ১১৭

ঘোষাল, জগজ্জীবন - ২৪১

ঘুমুড়ি - ২১

চ

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র - ৫৪, ১২০, ১৬৭, ২৪৪

চট্টোপাধ্যায়, সাধন - ৫৮২২৮, ২৩৭

চাঁদবণিকের পালা - ৮৮, ২৪২

চম্পক নগর - ২৩, ২৫ ৯৮

চক্রবর্তী, বিভাস - ১০৮

চক্রবর্তী, বিহারীলাল - ১২০

চক্রবর্তী, অমিয় - ১২০

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ - ১২০

চট্টোপাধ্যায় শক্তি - ১২০

চর্যাপদ - ১২১

চৈতন্য জীবনী - ১২১

চাঁদ সদাগর - ১১, ১৫, ২০, ২১, ২৩, ৪৪, ৫২, ৫৫,

৬১, ১০২, ১২৭, ১৩৫, ১৮২, ২০৭, ২১৫,

২৩২, ২৪১, ২৪২, ২৪৪

চক্রবর্তী, বিপ্লব - ১৬৭

চর্যাপদ - ১৭০

চন্দ্র, দীপক - ১৭১

চম্পাইগঞ্জ - ১৭৪, ১৮১

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র - ২২৮

চিত্তা - ৫

চণ্ডী - ৫, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ১৯

চ্যাংমুড়ি কানী - ১১, ১১৪

চণ্ডীমঙ্গল - ১৪, ১৭০

চিতপুর - ২১

চুড়াঘাট - ২১

জ

জসীমুদ্দিন - ১২০

জলদেবী - ৬

জাঙ্গুলী - ৬, ১০

জরৎকার - ৬, ১৫, ১৯, ২৮

ঝ

ঝরাপালক - ১২৫

ট

টোটম - ১০

ঠ

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ - ৫, ২২৮

ত

তর্করত্ন, রামনারায়ণ - ৬৮

তুরাগী - ৭

দ

দাসগুপ্ত, তমোনাশ

দাস, মহেন্দ্রনাথ - ৩৮

দেবরায়, শেখর - ৫৩, ৬৯, ১০৮

দে, বিষ্ণু - ৫৫

দাস, উত্তম - ৫৬, ১২১, ১৫২, ১৬৮, ২৪৪

দেবী, মহাশ্বেতা - ৫৮, ১৭১, ২২৮, ২৩২, ২৩৬

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন - ৬৮, ১২০

দে, ড. সন্ধ্যা - ১১৮

দেবী, স্বর্ণকুমারী - ১২০

দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ - ১২০

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ - ১২০

দে, বিষ্ণু - ১২০-১৬৭

দাসগুপ্ত, তমোনাশচন্দ্র - ৮, ১২, ৩৮

দাস, শচীন - ১৭১

দে, ড. অপূর্ব - ২৪৬

দক্ষিণ রায় - ৫

দ্রাবিড় - ৬, ৭

দাক্ষিণাত্য - ৯

দুর্গামঙ্গল - ১৪

দেবখণ্ড - ১৫, ২৫, ৪১

দিখাপাইত - ১৬

দেবলোক - ২৪

ধ

ধূসর পাণ্ডুলিপি - ১২৫

ধর্মমঙ্গল - ১৪

ধন্বন্তরী - ১৫

ন

নারায়ণদেব - ৩৮

নস্কর, সনৎকুমার - ৬৭, ১১৮, ১২৪, ১৬৬

নাসরিন, তসলিম ১২১

নাগমাতা - ৪

নাগজাতি - ৬

নাগপঞ্চমী - ৬, ১১

নারায়ণদেব - ৮, ১২, ১৪, ২৪১

নৈসর্গিক - ৮

নাগমূর্তি - ৯

নাগরাজ বাসুকি - ১০

নেতো - ১৫, ১৭, ১৯

নাদুড্যা বটগ্রাম - ১৭	ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ - ৫৬, ১৫০, ১৬৮, ২৪৪
পোর্তুগীজ - ৬০	বসু, কৃষ্ণ - ৫৬, ১২১, ১৬২, ১৬৯, ২৪৪
পৌরাণিকী - ৬০	বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র - ৬০
পর্ণপট - ১২১	বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ - ৬৮
পোদার, অরবিন্দ - ১৬৬	বল্লভ, আচার্য - ৯০
পূর্ববঙ্গ - ২৪১	বাল্মীকি - ১২০
প্রাগাধুনিক - ১, ২০৪	বৈষ্ণব সাহিত্য - ১২০
পাশ্চাত্য - ১	বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল - ১২০
পুরাকাহিনী - ৪	বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র - ১২০
প্রাগৈতিহাসিক - ৫	বসু, মানকুমারী - ১২০
প্রত্নতত্ত্ব - ৬	বাগচী, যতীন্দ্রমোহন - ১২০
পূর্ব-পাঞ্জাব - ৬	বসু, বুদ্ধদেব - ১২০, ২২৮
পরমেশ্বরী - ৬	বল্লরী - ১২১
পদ্মাবতী - ৬১১, ২৭, ২৮	বৈকালী - ১২১
পদ্মপুরাণ - ৮, ১২, ২৬, ৩৮, ৪০	বেলা অবেলা কালবেলা - ১২৬
পুরাণ - ১১	বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ১৭০
পদ্মামঙ্গল - ১৭	বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার - ১৩, ২৫, ৪৮
পিপলাই, বিপ্রদাস - ১৭, ২৪, ২৫, ২৪১	বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ - ১৭১
ব	বসু, সমরেশ - ২২৩
বিজয়গুপ্ত ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫	বঙ্গভূমি - ১
বেংলা - ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৪,	বাংলা - ৪
৩৪, ৩৫, ৪৫, ৫৫, ৬০, ৭২, ৯৮, ১৩৫, ২০১,	বিবর্তিত - ৪
২২৯, ২৪২, ২৪৪	বিশ্লেষণ - ৫
ব্রহ্মপুত্র - ৩৮	বিষহরি - ৬, ১১, ২৭
বোরগ্রাম - ৩৮	বৌদ্ধ সাধনামঙ্গলা - ৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ - ৫৩, ৬৯, ৭৯, ৮০,	বাংলাদেশ - ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ২৬, ১৭২
১১৮	বৌদ্ধতান্ত্রিক - ৭

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র -৭

বিদর অঞ্চল -৮

বীরভূম -৮

বনদুর্গা - ১০

বৌদ্ধ - ১০

বিজয়গুপ্ত - ১৬, ২৬, ২৭, ৪৮, ২৪১

বশিষ্ঠ -১৯

বারমাস্যা - ২৩

বরিশাল - ২৬, ২০৬, ২০৮

বামাগতি -২৬

বানিয়াখণ্ড - ৪১

ভ

ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র - ৫০

ভট্টাচার্য, আশুতোষ - ৭, ৯, ১১, ১২, ৫০

ভট্টাচার্য, সঞ্জয় - ৫৫, ১৬৭

ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার - ১১৯, ১৬৭,

ভট্টাচার্য, সুশান্ত - ১২০

ভারতবর্ষ - ২১

ভদ্রেশ্বর -২১

ম

মিত্র, শম্ভু -৫৩, ৬৯, ৮০, ৮৮, ১০৮, ১১৮, ২৪২

মিত্র, অরুণ -৫৫, ১২০, ১৪৫, ১৬৮

মাহমুদ, দীপঙ্কর, ৫৬, ১২১, ২৪৪

মজুমদার, অমিয়ভূষণ - ৫৭, ১৭১, ১৮৬, ২০৪, ২৪৫

মিশনারী-৬০

মিত্র, দীনবন্ধু - ৬৮

মনসা কথা - ১০৮

মুখোপাধ্যায়, অশোক - ১২০

মজুমদার, মোহিতলাল - ১২০

মজুমদার, মোহিতলাল - ১২০

মিত্র, প্রেমেন্দ্রনাথ - ১২০

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ - ১২০

মনসাপুরাণ - ১২২

মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কন - ১৭০

মুখোপাধ্যায়, শিবাশিষ - ১৭১

মনসা- ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩,

২৪, ২৫, ২৮, ৪৩, ৫১, ৫৫, ৮৪, ৯২, ১১৪, ১৩৫,

১৭৬, ২০৭, ২১৫, ২২১, ২৩৫, ২৪২

মঙ্গলকাব্য - ১, ১১, ১৩, ৮১, ১২০, ১২১

মধ্যযুগ - ৪, ২৫, ১০১, ১৮৬, ২৪৪

মিথলজি - ৪

মিশর - ৬

মন্টা-আন্মা -৭

মহাযান-৭

মিলার, এইচ ক্রিকটন -৯

মনসাবৃক্ষ - ৯

মহাভারত -১১, ৬৮

মৈমন সিংহ - ১৬

মজুমদার, দক্ষিণরাজেন মিত্র - ১৬

মনসাচরিত-১৭

মর্ত্যভূমি - ২৯

র

রাঢ়দেশ -৩৮

রায়, মন্মথ - ৫৩, ৬৯, ১১৭

রায়, কালিদাস - ৫৪, ১২০

রায়, রাজারামোহন - ৬০

রায়, দ্বীজেন্দ্রলাল - ৬৮, ১২০

রবীন্দ্রোত্তর - ৮৮, ১৮৬

রসিদ, হারুন - ১০৮

রূপসী বাংলা - ১২৫

রামায়ণ - ৫, ৬১, ৬৮

রামকৃষ্ণ - ৫

রায়, ড. নীহাররঞ্জন - ৮

রাজবংশী - ১১

রাজা জনমেজয় - ১১

রায়মঙ্গল - ১৪

রাখাল গাছি - ২০

ল

লখিন্দর - ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২৩, ৪৫,

৬৫, ৭৬, ৯৭, ১৩৫, ১৭৯, ২০৫, ২২০, ২৪২

লেবেডফ, হেরাশিম - ৬৮

লোকসমাজ - ৪

লিওলিথিক - ৪

লোকপুরাণ - ৫

হ

হায়দর, জিয়া - ৫৫, ১২০, ১৬৭

হোসেন, সেলিনা - ৫৭, ১৭১

হরিদত্ত - ৬০

হ্যামলেট - ১৩৫

হো - ৬

হরিদ্বার - ৬

হাজং - ১১

হোসেন হাসন - ১৫, ২৯

হুসেন শাহ - ১৭, ২০, ২৬

হুগলি - ২১

হাজাদহ - ২১

শ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - ১২০, ১২১

শেক্সপীয়র - ১৩৫

শাস্ত্রি, হরপ্রসাদ - ১৭১

শিরস্ত্রাণ - ৭

শযোৎপাদিনী - ৮

শ্বশানচারী কালী - ১০

শ্বশানচারী শিব - ১১

শ্রীকৃষ্ণ - ১১

শিবমঙ্গল - ১৪

শীতলামঙ্গল - ১৪

শিব - ১৫, ১৮, ২৫, ৯২

শকাব্দ - ১৬

য

যষ্ঠী - ১০

যষ্ঠীমঙ্গল - ১৪

স

সেন, ড. দীনেশচন্দ্র - ১৬, ৪৮, ৫২, ৬০, ৬১

সনকা - ৫৫, ৬১, ৯১, ১৩৮, ১৯৬, ২৪২

সেন, অভিজিৎ - ৫৭, ১৭১, ২১৫, ২২৮, ২৪৫

সিংহ, দেবেন্দ্র - ১০৮

সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী - ১১৯

সেন, নবীনচন্দ্র - ১২০

সেন, দেবেন্দ্রনাথ - ১২০

সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ - ১২০

সেন, ড. সুকুমার - ১৭, ৪৮

সরদার, আব্দুস সাত্তার - ২৪৭

সাহিত্য শাখা-১

সর্বদেবী - ১, ২৪১

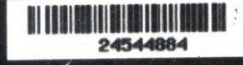
সমাজ বিজ্ঞানী - ৪

সিজবৃক্ষ - ৭

সর্পপূজা - ৭, ১০

A Bengali Peer- Reviewed Journal

ISSN:2454-4884



সংশ্লুক

তৃতীয় বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

।। বিশেষ সংখ্যা ।।

বাউল গান ও বাউল দর্শন

অন্যান্য প্রবন্ধ

কবিতা

ছোটগল্প

রম্যরচনা



সম্পাদক : উত্তম দাস

সংশপ্তক

তৃতীয় বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকা অধিকর্তা

উৎপল মণ্ডল

সম্পাদক

উত্তম দাস

সংশ্লিষ্ট

Peer-Reviewed Journal

২০১৭, দ্বিতীয় সংখ্যা

Vol.3 Issue-2

তৃতীয় বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০১৭

December, 2017

ISSN-2454-4884

পত্রিকা অধিকর্তা

উৎপল মণ্ডল

সম্পাদক

উত্তম দাস

সম্পাদক মণ্ডলী

অতনু শাশমল (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

রীতা মোদক (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

মোনালিসা দাস (কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়)

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রকাশ মাইতি (বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

পার্বসারথি মুখোপাধ্যায় (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়:

স্বামী বিবেকানন্দের মনন, চিন্তন ও দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা, অন্যান্য প্রবন্ধ,
কবিতা, ছোটগল্প এবং রম্যরচনা

সকলকে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাই

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

Email: uttamnbu@gmail.com

চলভাষ: ৯৭৩৪৫১৮৪২৭

লেখা পাঠানোর সময়-সীমা ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে

বি.দ্র.: লেখা অবশ্যই অত্রতে টাইপ করে প্রুফ দেখে সফট কপি পাঠাতে হবে।

সংশপ্তক

SAMSAPTAK

Peer-Reviewed Journal

A bi annual journal based on research social, literary and cultural discourse

সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক পত্রিকা

Vol.3 Issue-2

তৃতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

December 2017

Title of the magazine-Samsaptak

পত্রিকার নাম- সংশপ্তক

The language in which Published-Bengali

যে ভাষায় প্রকাশিত-বাংলা

Periodicity of Publication - Six monthly

ব্যবধান - ষাণ্মাসিক

Magazine Director - Utpal Mandal

পত্রিকা অধিকর্তা - উৎপল মণ্ডল

Name of Editor - Uttam Das

সম্পাদকের নাম - উত্তম দাস

সহকারী সম্পাদক

শান্তনু মণ্ডল, উজ্জ্বল শীল, তুফান রায়, প্রসেনজিৎ দাস, এহেসানুল্লা হক, তাপস মণ্ডল, ইউনুস

মিঞা, মনোজিৎ বর্মণ, শক্তিপদ হালদার,

পত্রিকার সাথে যুক্ত

গৌতম দাস, সুব্রত দাস, অহনা রায়, দীপ চন্দ, অঙ্কিতা সাহা, মাহমুদুল হোসেন, শ্রাবণী দাস,

জয় দাস, মিঠুন দাস, সৌরভ রায়, পার্থ সারথী ঘোষ, সুব্রত পাল,

হৃদয় রঞ্জন সরকার, মানিক মৈত্র, নবীন দাস,

প্রভাত দাস, দীপঙ্কর সরকার

সহযোগিতায়

তাপস সোহেন, গৌতম দাস, অদিতি ভট্টাচার্য, দেবপ্রিয় মণ্ডল, প্রেম প্রকাশ চক্রবর্তী,

প্রশান্তি ঘোষ, মছুয়া সেন, পিয়া সিনহা, কোয়েল পাল, প্রসেনজিৎ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ - উত্তম দাস

অঙ্কর বিন্যাস - সুজিৎ রায়, শিবমন্দির, দার্জিলিং

মুদ্রণ ও প্রকাশকের নাম - মা কামাক্ষা প্রিন্টিং প্রেস, মেন রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

মূল্য: ১৬৫/-

—: সূচীপত্র :—

সম্পাদকীয়	i	
সংশ্লিষ্ট পত্রিকার পক্ষ থেকে		
অধ্যাপক দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে সম্মান		
ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন	১	
পর্ব-ক		
বাউল গান ও বাউল দর্শন		
বাউল গানের রূপ ও স্বরূপ	৩	
বিতর্কিত লালন	১৫	অনামিকা মুখার্জী
আরশী নগরের পড়শীর খোঁজে	২২	অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়
মানুষতত্ত্ব : বাউলগান	২৮	সঙ্গীতা মণ্ডল
মহাত্মা লালন ফকির ও রবীন্দ্র সাহিত্য	৩৪	জগন্ময় পাত্র
বাউল তত্ত্ব ও বাউল সম্প্রদায়	৪০	গৌতম দাস
বাউল গান ও বাউল দর্শন	৫৩	ছন্দা পাল
বাউল গান ও বাউল দর্শন : পুনর্মুদ্রণ		
লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ	৬৬	অন্নদাশঙ্কর রায়
বাউল-গানের রূপ ও সাহিত্যিক মূল্য	৭৫	ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
‘বাউলের দেহতত্ত্ব— দেহসাধন’ সম্পর্কে		
সোহরাব হোসেন-এর বক্তব্য	৯১	
পর্ব - খ		
অন্যান্য প্রবন্ধ		
জীবন সরকারের ছোটগল্প: প্রসঙ্গ দেশভাগ ও ছিন্নমূল		
বাঙালীর বোবা কান্না	৯৪	শিবনারায়ণ রাউত, ড. উৎপল মণ্ডল
বীরভূমের ঢেকারো জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত		
কথ্য ভাষার বাক্যরীতি	১০৭	শান্তনু মণ্ডল
দুই নারীর আত্মকথন : রাসসুন্দরী ও নটী বিনোদিনী	১২১	নীহার শুভ্র অধিকারী, রীতা মোদক

রাজনৈতিক আবহে ক্রান্তদর্শী	১৩৭	উজ্জ্বল শীল
মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্য :		
অপ্রধান চরিত্র	১৪৭	ইউনুস মিঞা
আফসার আমেদের ছোটগল্প :		
মুসলিম নারী সমাজের দলিল	১৭৮	এহেসানুল্লা হক
নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাসের এক অন্যমাত্রা :		
‘অন্য নীড়’	১৯১	সৌরভ বসাক
জগদীশগুপ্তের ছোটগল্পে নারী ভাবনা	১৯৭	সুব্রত দাস
‘চাঁদবেগে’ দুই উপন্যাসিকের ভিন্ন দৃষ্টিতে	২০১	মাগফেরা বেগম
বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর অবস্থায়ন	২১৪	গৌতম দাস
সুন্দরবনের ‘মা’ (বনবিবি)	২১৯	ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী
রবীন্দ্রনাথের আমি	২২৫	প্রভাত দাস
মানসিকভাবে আশাহত মানুষের শান্তি তৈরীর		
আখ্যান মিয়াওপিসমেকিং এন্টার প্রাইজ	২৩১	মিষ্কা মণ্ডল
কমলকুমার মজুমদারের ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ :		
ভাষা ও শৈলীগত বিশ্লেষণ	২৩৭	হাবিবুর রহমান
‘ছেলেদের রামায়ণ’— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী :		
শিশুসাহিত্যের মানদণ্ডে	২৪৬	শ্রাবণী দাস, উৎপল মণ্ডল
শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ :		
প্রেক্ষিত স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষ	২৫২	সুশান্ত পাণ্ডে
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের গতি-প্রবণতা	২৬৫	সাগর দাস
বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং অচলপত্র :		
সূচনা ও অভিমুখ	২৭৩	সুমিত্রা পাল
কোরেশী মাগনের চন্দ্রাবতী: নিবিড় পাঠ	২৮০	ড. অমর কুমার পাল
কবি শামসুর রাহমান ও মানবতাবাদ	২৮৯	ফটিক চন্দ্র অধিকারী
ভাষাহীন প্রতিবাদ	২৯৮	অনিন্দ্যা ঘোষ
রামপ্রসাদের হাতে বিহুনের চৌরপঞ্চাশিকা :		
ABSURD কবির EROTIC কাব্য	৩০৩	অমিত বিশ্বাস
বাংলা ছোটগল্পে রসি-কমলা-স্বর্ষ-সোরধনি-সোমরিরা	৩১৪	দীপঙ্কর সরকার
সাবিত্রী রায়ের ‘পাকাধানের গান’ উপন্যাস :		
নারী জাগরণের আলোকে	৩৩০	শ্যামল মোহন্ত
উনবিংশ শতকে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর স্বতন্ত্র		
অধিকার প্রতিষ্ঠা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	৩৩৭	ড. সুতপা ভট্ট

‘চাঁদবেণে’ দুই ঔপন্যাসিকের ভিন্ন দৃষ্টিতে

মাগফেরা বেগম

magfera.020@gmail.com

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুপম অভিজ্ঞান প্রাগাধুনিক পর্বের রচনার বিশ শতকে ঘটেছে নানা অনুসৃজন। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মানুষের চিন্তা, প্রত্যয়, ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের যে অস্থিরতা তা বাঙালির চিন্তাজগৎকে নানাভাবে আলোড়িত করে। একের পর এক রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে পড়ে মানুষ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন, নকশাল আন্দোলনের উত্থান, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, মিশ্র অর্থনীতির দুর্বল হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনা মানুষকে আরো জটিল ও দুর্বোধ্য করে তোলে। এই পরিসরে সাহিত্যেও চরম ক্ষয় ও শিল্পরূপের অবমূল্যায়ন চলতে থাকে। কিন্তু এই আপাত অবক্ষয়িত সাহিত্যরূপের অন্তরালে একশ্রেণীর সচেতন বুদ্ধিজীবী মানুষ, কবি-শিল্পী সাহিত্যিক সচেতন হয়েছেন আমাদের ঐতিহ্য, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শনকে পুনরুদ্ধার করতে। সাহিত্যের পুনর্নির্মাণের পথে তারা অন্বেষণ করেছেন নতুন ঐতিহ্যের। শুধুমাত্র বর্তমান নয়, তারা বর্তমানকে প্রসারিত করেছেন সুদূর অতীতে এবং ভবিষ্যতে। জীবন ও ঐতিহ্যের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে গিয়ে তারা বৃহত্তর সমকালকে গ্রহীত্ব করেছেন। আর এই সূত্রে আধুনিক ও আধুনিকোত্তর সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতা হল ‘রূপান্তর’ বা ‘পুনর্নির্মাণ’। এই পথে সমালোচনার জগতেও এসেছে ‘নির্মাণ’, ‘বিনির্মাণ’ ও ‘পাঠক প্রতিক্রিয়া’র মতো শব্দগুলি। বর্তমানে আমাদের চিরায়ত সাহিত্য, বিশেষ করে চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা মঙ্গলকাব্য নিয়ে বহু গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটক রচিত হয়ে চলেছে। চিন্তা-চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে, আজকের লেখকরা অনন্ত স্বাধীনতা নিয়ে নির্মাণ করে চলেছেন এক একটি শিল্পরূপ। আর এই Construction, De-construction, De-construction- এর পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে যেন বাখতিন, রলাবার্ত, মিশেলফুকো, জঁঁাক দেরিদার চিন্তাজগৎ আলোড়িত করে চলেছে। চর্যাপদকে কেন্দ্র করে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘চর্যাপদের হরিণী’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেণের মেয়ে’ (১৯২০), সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (১৯৮২), সাইমন জাকারিয়ার ‘ন নৈরামণি’ (২০০০), ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’ (২০০৭) ও ‘বোধিধ্রু’ (২০১০), নাটক এবং শিবশিস মুখোপাধ্যায়ের ‘কাহ্ন’ (২০১০) উপন্যাস ও ‘অসম্ভব গোল টেবিল’ নাটক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাধাকৃষ্ণ’ (১৯৭৬) ও দীপকচন্দ্রের ‘মণ বৃন্দাবন’ (১৯৯৩) ও ‘যদি রাধা না হত’ (১৯৯৫) উপন্যাস লেখা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমাবস্যার গান’ (১৯৭১), অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘চাঁদবেণে’ (১৯৯৩), সত্যপ্রিয় ঘোষের ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ (১৯৯৯),

সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেগে' (১৯৮৪), 'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২), রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহাসন যাত্রা' (২০০৭), শচীন দাশের 'নদীতরঙ্গের আয়না' (২০০৯), মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাঙ্গুর জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭), 'ব্যাধ খণ্ড' (১৯৯৪), 'বেনেবউ' (১৯৯৪) প্রভৃতি উপন্যাস লেখা হয়েছে। এছাড়া শঙ্কুমিত্রের 'চাঁদবেগের পালা' (১৯৭৮), রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'ফুল্ল কেতুর পালা' (১৯৯৪), শিশির কুমার দাসের 'ভাদ্রদন্ত' (১৯৭৭) শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' (২০০২) ও মঙ্গলকাব্যের মিথকে নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও ছোটগল্পের সংখ্যাও অনেক।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা 'চাঁদবেগে' নামে দুটি উপন্যাস পেয়ে থাকি। একটি পঞ্চাশের দশকের আবির্ভূত অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেগে' (১৯৯৩)। অন্যটি বাংলা সাহিত্যজগতে যার সত্তরের দশকে পদার্পণ ঘটেছে, আধুনা বাংলাদেশের জনপ্রিয় মহিলা লেখিকা সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেগে' (১৯৮৪)। নামকরণ থেকেই আমরা বুঝতে পারি দুটি উপন্যাসই মধ্যযুগের অন্যতম বাংলা সাহিত্য মনসামঙ্গলের মিথ ও চাঁদ চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা। তবে প্রাগাধুনিক বাংলা-সাহিত্য অবলম্বনে উপন্যাস দুটি রচিত হলেও বর্তমান সময়ের মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে। বর্তমান জগৎ ও জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটময় অবস্থার মধ্যে অতীতকালকে স্থাপন করে তৈরী করেছেন নতুন এক সাহিত্যরূপ। উক্ত উপন্যাস দুটির নিবিড় আলোচনার পূর্বে উপন্যাসিক যুগলের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কথা বলা ভালো।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের পৈতৃক নিবাস অবিভক্ত বাংলার পাকুড়িয়া গ্রামে হলেও, জন্ম তার কোচবিহার শহরে মাতুলালয়ে ২২ মার্চ ১৯১৮ তে। অর্থাৎ দেশ স্বাধীনতার কয়েক দশক আগে। দেশ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নিজ বস্তু ছেড়ে তিনি পুরোপুরিভাবে উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারে বসবাস করতে থাকেন। পরলোক গমন করেন একবিংশ শতাব্দীতে ৮-ই জুলাই ২০০১ কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে। ডাকবিভাগে কর্মরত এই লেখকের সুদীর্ঘ জীবনের সাহিত্যরচনায় উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও অসম-শিলচর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের জীবনালেখ্য। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা, দেশভাগ, জাতিদাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মানবিক চেতনার অবমূল্যায়ন তাঁর সাহিত্যে বারে বারে ছায়া ফেলেছে। আবার অতীতের সাহিত্য ও আবহ নিয়ে রচনা করেছেন কয়েকটি উপন্যাস। অমিয়ভূষণের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'প্রমীলার বিয়ে' 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫৩ সালের কার্তিক মাসের সংখ্যায় বের হয়। এরপরে ধারাবাহিকভাবে বলিষ্ঠ, স্বতন্ত্র্যধর্মী এবং ব্যতিক্রমী এই লেখকের প্রকাশিত হয় যা নিম্নে দেখানো হল—

১. 'নীলভূইয়া' (১৯৫৫) 'নয়নতারা' নামে যার ২য় সংস্করণ হয়।

২. 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭) 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

৩. 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯) খ্রীঃ
৪. 'উদ্বাস্ত' (১৯৬২) খ্রীঃ
৫. 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১) খ্রীঃ
৬. 'বিলাস বিনয় বন্দনা' (১৯৮২) খ্রীঃ
৭. 'রাজনগর' (১৯৮৪) খ্রীঃ
৮. 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৮৮) খ্রীঃ
৯. ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর' (১৯৮৮) খ্রীঃ
১০. 'বিবিক্তা' (১৯৮৯) খ্রীঃ
১১. 'চাঁদবেগে' (১৯৯৩) খ্রীঃ
১২. 'বিশ্বমিতিরের পৃথিবী' (১৯৯৭) খ্রীঃ

এছাড়া 'পঞ্চকন্যা' (১৯৬২), 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' (১৯৫৬), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৮৬), 'গল্প সমগ্র' (১৯৯৪) প্রভৃতি গল্পসমগ্র ও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলন (লিখনে কি ঘটে - ১৯৬৬) পাওয়া যায়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকার জন্ম ১৪-ই জুন ১৯৪৭-এ অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে। ব্যতিক্রমী এই লেখিকার লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বাংলার লোকপুরাণের উজ্জ্বল চরিত্রগুলি নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সংকট, সেই সঙ্গে ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ তাঁর রচনাকে নতুন মাত্রা দান করেছে। রাজনৈতিক বাতাবরণকে তার রচনার অন্যতম দিক বলে মনে করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

'I Love that my story may turn into a political idea.'

তাঁর লেখা ৩২ টির বেশি উপন্যাস আমরা পেয়ে থাকি এবং এখনও তিনি লিখে চলেছেন তাঁর সুচারু লেখনী দ্বারা। মহম্মদ এনামুল হক গোল্ড মেডেল (১৯৬৯), বাংলা আকাদেমি পুরস্কার (১৯৮০), আলাওল পুরস্কার (১৯৮১) প্রভৃতি পুরস্কার এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D.Lit উপাধি পান। কর্মসূত্রে শিক্ষিকা এই লেখিকা বর্তমানে National human Right Commission of Bangladesh-এর মেম্বর এবং Executive Board of UNESCO-এর representative (প্রতিনিধি)। উপন্যাস চরনা ছাড়া ৪ টি ছোটগল্প সংকলন, বেশ কয়েকটি শিশু সাহিত্য ও প্রবন্ধাবলী রচনা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, ফ্রেঞ্চ, রুশিয়ান, ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় অনূদিত হয় তাঁর উপন্যাস। নিম্নে তার ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হল—

১. 'জ্যোৎস্নায় সূর্য জ্বালা' (১৯৭৩) খ্রীষ্টাব্দ।
২. 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২) খ্রীষ্টাব্দ।

৩. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) খ্রীষ্টাব্দ।
৪. 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' (১৯৭৯) খ্রীষ্টাব্দ।
৫. 'যাপিত জীবন' (১৯৮১) খ্রীষ্টাব্দ।
৬. 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২) খ্রীষ্টাব্দ।
৭. 'পাদশব্দ' (১৯৮২) খ্রীষ্টাব্দ।
৮. 'চাঁদবেগে' (১৯৮৪) খ্রীষ্টাব্দ।
৯. 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) খ্রীষ্টাব্দ।
১০. 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' (১৯৮৭) খ্রীষ্টাব্দ।
১১. 'ক্ষরণ' (১৯৮৮) খ্রীষ্টাব্দ।
১২. কাটাতারের প্রজাপতি' (১৯৮৯) খ্রীষ্টাব্দ।
১৩. 'খুন ও ভালোবাসা' (১৯৯০) খ্রীষ্টাব্দ।
১৪. 'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২) খ্রীষ্টাব্দ।
১৫. 'ভালোবাসা প্রীতিলতা' (১৯৯২) খ্রীষ্টাব্দ।
১৬. 'টাপাপোড়েন' (১৯৯৪) খ্রীষ্টাব্দ।
১৭. 'গায়ত্রী সঙ্খ্যা' (১ম, ১৯৯৪), (২য়, ১৯৯৫), (৩য়, ১৯৯৫) খ্রীষ্টাব্দ।
১৮. 'দ্বীপাধিতা' (১৯৯৭) খ্রীষ্টাব্দ।
১৯. 'যুদ্ধ' (১৯৯৮), খ্রীষ্টাব্দ।
২০. 'লারা' (২০০০) খ্রীষ্টাব্দ।
২১. 'মোহিনীর বিয়ে' (২০০০) খ্রীষ্টাব্দ।
২২. 'কাঠকয়লার ছবি' (২০০১) খ্রীষ্টাব্দ।
২৩. 'আগবিক আঁধারে' (২০০৩) খ্রীষ্টাব্দ।
২৪. 'ঘুম কাতুরে ঈশ্বর' (২০০৪) খ্রীষ্টাব্দ।
২৫. 'মর্গের নীল পাখি' (২০০৫) খ্রীষ্টাব্দ।
২৬. 'অপেক্ষা' (২০০৭) খ্রীষ্টাব্দ।
২৭. 'দিনের রসিতে গিটু' (২০০৭) খ্রীষ্টাব্দ।
২৮. 'মাটি ও শস্যের বুনন' (২০০৭) খ্রীষ্টাব্দ।
২৯. 'পূর্ণ ছবির মগ্নতা' (২০০৮) খ্রীষ্টাব্দ।
৩০. 'ভূমি ও কুসুম' (২০১০) খ্রীষ্টাব্দ।
৩১. 'যমুনা নদীর মুশায়েরা' (২০১১) খ্রীষ্টাব্দ।
৩২. 'গাক্তির ছায়া নেই' (২০১২) খ্রীষ্টাব্দ।
৩৩. 'সোনালী ডুমুর' (২০১২) খ্রীষ্টাব্দ।

৩৪. 'আগষ্টের একরাত' (২০১৩) খ্রীষ্টাব্দ।

এছাড়া 'সাগর' (১৯৯১), 'কাকতাদুয়া' (১৯৯৬), 'আকাশপরী' (২০০১), 'চাঁদের বাড়ির পান্তা ইলিশ' (২০০৮) প্রভৃতি শিশু সাহিত্য, 'উৎস থেকে চিরন্তন' (১৯৬৯), 'মানুষটি' (১৯৯৩), 'মতিজানের মেয়েরা' (১৯৯৬), 'অবেলার দিনক্ষণ' (২০০৭) প্রভৃতি গল্প এবং 'স্বদেশে পরবাসী' (১৯৯৫), 'একান্তরের ঢাকা' (১৯৮৯), 'মুক্তকরো ভয়' (২০০০), 'নিজেরা করো জয়' (২০০৮), 'ঘর গেরস্থির রাজনীতি' (২০০৮) প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী পেয়ে থাকি আমরা।

লেখক অমিয়ভূষণের জন্ম অনেক আগে ১৯১৮ এবং তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন এপার বাংলায় থেকে। সাহিত্য সাধনায় লেখিকা সেলিনা হোসেনের থেকে তিনি অগ্রজ হলেও তাঁর 'চাঁদবেণে' পেয়ে থাকি অনেক পরে ১৯৯৩-এ। এর আগে তিনি নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে 'নীলভূইয়া' উপন্যাস। উত্তরবঙ্গের জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও দলিত সান্দার গোষ্ঠী জীবন নিয়ে লেখা এপিক উপন্যাস 'গড় শ্রীখণ্ড' পেয়ে থাকি। এছাড়া দুখিয়ার কুঠি, 'নির্বাস, উদ্বাস্ত, রাজনগর, মহিবকুড়ার উপকথা প্রভৃতি উপন্যাসে উদ্বাস্ত সমস্যা, উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় দরিদ্র মানুষ ও রাজপরিবারের কথা পায়। ইতিহাস ও পুরাণ নিয়ে তার দু'খানি উপন্যাস। ১. 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৮৮), ২. 'চাঁদবেণে' (১৯৯৩) 'মধু সাধুখাঁ'য় ১৫৫০-এর পরবর্তী সময়ের সমগ্র মধ্যযুগ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক মধুখাঁ দক্ষিণ থেকে এলাচ, লবঙ্গ, চুয়ানন্দ, শাখের চুড়ি ইত্যাদি নিয়ে আসে, আবার উত্তর থেকে কস্তুরী, পোস্তদানা, আমলকী ইত্যাদি। ষোড়শ শতকের জীবনকে অবলম্বন করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সর্বকালীন ও নিরবচ্ছিন্ন জীবন-কথার নির্যাস। দেখা যায় বৃহত্তর-পরিসরের উপন্যাস 'চাঁদবেণে'-র সলতে পাকানো গুঁরা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে। সেই সঙ্গে 'গড় শ্রীখণ্ডের' রামচন্দ্র চরিত্রের সাথে মিল খুঁজে পায় চাঁদবেণের চাঁদ চরিত্রের। ইতিহাস, পুরাণ, বাস্তবতা ও মিথকে একত্রিত করে রচিত হয় তাঁর অন্যতম উপন্যাস এই চাঁদবেণে।

অন্যদিকে ওপার বাংলার লেখিকা সেলিনা হোসেন যার জন্ম দেশ স্বাধীনের সময় (১৯৪৭)। তাঁর 'চাঁদবেণে' অমিয়ভূষণে 'চাঁদবেণের' আগে লিখিত (১৯৮৪)। এর আগে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ অবলম্বনে রচনা করেছেন তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২)। নবম-দশম শতাব্দীর কাহ্নকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন বাংলাদেশের বিশ শতাব্দীর ৮০-দশকের ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুকে তিনি বিশ শতকের প্রতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতিনিধি রূপে দাঁড় করিয়েছেন 'কালকেতু ও ফুল্লরা' (১৯৯২) উপন্যাসে। এই দুটি উপন্যাসের মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত 'চাঁদবেণে' উপন্যাস। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এক দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনীকে তুলে ধরেছেন লেখিকা মনসামঙ্গলের মিথকে ব্যবহার করে। সাহিত্য প্রাঙ্গনে অতীতকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তার ধারণা—

'I don't believe in romanticising the past. I think the past with the present. By writing about the past, I renew history.'^{১৯}

সেলিনাহোসেনের 'চাঁদবেণে' (১৯৮৪) ও অমিয়ভূষণের 'চাঁদবেণে' (১৯৯৩) দুটি উপন্যাসই মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র চাঁদকে অবলম্বন করে রচিত। মনসামঙ্গলের মিথ, মনসামঙ্গলের আবহ, উক্ত উপন্যাস দুটিতেই বিরাজ করলেও উপন্যাস দুটির গঠনগত দিক, ভাষাতাত্ত্বিক দিক, চরিত্রের উপস্থাপনা, সর্বপরি মনসামঙ্গলের মিথ ব্যবহারের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাও ভিন্নভাবে ধরা পড়েছে। আসলে উভয় উপন্যাস রচনায় সময়ের ব্যবধান, উপন্যাস রচনার স্থানগত পার্থক্য এবং উপন্যাসিক দ্বয়ের ভিন্ন শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে দুটি স্বতন্ত্র শিল্পের, উপস্থাপন ঘটেছে।

৪টি তরঙ্গে বিভক্ত মোট ২৯ টি অধ্যায় নিয়ে নবম-শতাব্দির ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত অমিয়ভূষণের 'চাঁদবেণে' (১৯৯৩)। সুবৃহৎ এই মহাকাব্যিক উপন্যাসটি 'চতুরঙ্গ' ও 'বসুধারা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় লেখক নিজে কাহিনীর বয়ান করে ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থাকারে লেখক কর্তৃক কিছুটা হলেও পঙ্কধর, শূর সেন, এক্রাহিম ও দায়ুদের কথনে কাহিনী এগিয়েছে। নির্দিষ্ট কোন প্লট নয়, বৃত্তাকার কাহিনীর বুগট নয়, সমতালিক এক কাহিনি পরম্পরায় উপন্যাসটি তুলে ধরেছেন। আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে, এভাবে কাহিনীর Flash-back (পূর্ব-কথন) দেখানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ যেভাবে ভাবনা-চিন্তা করে জীবনের চলার পথে, উপন্যাসিক সেভাবেই উপন্যাসে বিষয়গুলি নিয়ে এসেছেন। এই চাঁদবেণে উপন্যাসের চন্দ্রশেখর বসু হল সমতটের অধিকারী। যে সিংবংশীয় বাঙালীরা সিংহল থেকে বেরিয়ে মূল ভূখণ্ডের উপকূলে একটা উপনিবেশ গড়ে তোলে। চম্পক বা চম্পা নগর থেকে চন্দ্রশেখর বাগিজ্যে যায় পশ্চিমে সিংহল, কেরল, আরব, মিশর, পূর্বে কঙ্গো, কলিঙ্গবঙ্গ, কম্বুজচীন দেশে। আধুনিক মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যর্থতা, ট্রাজেডি, এবং এমন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষ যে জীবনযুদ্ধে বা জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে, তা অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নবম-দশম শতাব্দির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এখানে বণিক সম্প্রদায়ের বাগিজ্যযাত্রার ছবি তুলে ধরেছেন, কারণ এমন একজন বণিকের জীবন-কথা তিনি অঙ্কন করতে চেয়েছেন যে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিতে চায়, যে কালকে অতিক্রম করতে চায়। মনসা-মঙ্গলের আমাদের পরিচিত চাঁদবেণে চরিত্রের সঙ্গে দৈবীশক্তির লড়াই, সর্পদেবী মনসা ও সাপের প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিতি। কিন্তু 'চাঁদবেণে' উপন্যাসে সাপের প্রসঙ্গ থাকলেও সর্পদেবীর সঙ্গে যুদ্ধ নেই, এখানে চাঁদ বণিকের যুদ্ধ ভাগ্যের সাথে কালের। লেখক নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“এটা উপন্যাস, মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্য লেখা হয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে। কিন্তু উপন্যাসে থাকে মানবচরিত্র। সেই মানবচরিত্র নিয়েই এই উপন্যাসের বিস্তৃতি।

ইতিহাসের দিকে এটা পল্লব সাম্রাজ্য ধ্বংসের, চোল সাম্রাজ্যের উত্থানের সমসাময়িক।”^{১০} সেই সঙ্গে তিনি দু’জোড়া প্রেমের কথাও উল্লেখ করে চন্দ্রশেখর, সনকা ও শূর সেন-দময়ন্তী। মনসামঙ্গলের পতিব্রতময়ী, পতিপ্রাণা সতী বেহুলার কোন উপস্থিতি নেই। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে আধুনিক যুক্তিবুদ্ধির বাস্তবতায় দাঁড় করাতে গিয়ে নির্মিত হয় এক নতুন রচনার। পুরাণের মনসামঙ্গলে কাহিনী নবতর দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে।

উপন্যাসে চাঁদ পিতার পরিত্যক্ত নৌবহর পুনর্নির্মাণ করে সস্ত্রীক সমুদ্রে পাড়ি দেয়, কিন্তু ভাগ্যের পরিহারকে সে সাত-সাতখানি জাহাজ খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে সমতটে ফিরে আসে। তবুও সে চাঁদ বণিকের পালা’র (১৯৭৮-শতাব্দী মিত্র) চাঁদ বেন্যায় মতো অধ্যক্ষ পক্ষধরকে বলে ‘যাত্রা করো, যাত্রা করো এবং পুত্র বিজয় ঘোষকে সে বাণিজ্যে পাঠায়। তবে আধুনিক সমাজ জীবন থেকে নেওয়া এই চন্দ্রশেখর অন্তর্দ্বন্দ্বের, দোষে-গুণে ভরা একজন মানুষ। এই চাঁদ কোলগরের নগরনায়িকা ক্ষিরোদসম্ভবার, নটী লীলালতিকার প্রসাদে যায় অনায়াসে, মনসামঙ্গলের চাঁদ যেমন কড়ি দিয়ে নটীবাড়ি যাবার পরিকল্পনা করে। নিজ স্ত্রী সনকার মুখায়ব ও আচার-ব্যবহারের সাথে মিল থাকায় হল্য ভৈরবীকে চন্দ্রশেখর প্রেম নিবেদন করে। হল্য ভৈরবীর সহায়তায় তাঁতী সংগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রাচীন যুগের দাসপ্রথার চিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ৭ম অধ্যায়ে দেখা যায় পিতার উপর মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য চাঁদপুত্র সদাগর নিজে বাণিজ্য যেতে চায়। নৌ-বহর সহ পুত্র-সাগরের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ায় চাঁদের জীবনে হাহাকার নেমে আসে। পরে নাবালক পুত্র বিজয় ঘোষকে বাণিজ্যে পাঠালেও নিজে জরাজীর্ণ মধুলিট নিয়ে নিজে সপ্তসাগর চষে বেড়ান। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ সনকার কাছে অনুশোচনায় ভেঙে পড়েন। তবে এই দক্ষ চাঁদ নিজের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া নিজেই করে অসীম সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে সীমাকে সঞ্জন করে। মুংলার কথায়—

“চন্দ্রশেখরের যুক্তিতে মৃত্যু বলে কিছু নেই,
তার মৃত্যুভয়ও ছিল না।”^{১১}

জীবনের তরঙ্গে পরাজয় ঘটলেও নিজেকে থামিয়ে রাখেনি চন্দ্রশেখরকে। তাই শেষে দেখা যায় তারই নির্দেশে পক্ষধরের তত্ত্বাবধানে মধুলিট জাহাজে সমুদ্র যাত্রা করছে চাঁদের কনিষ্ঠ-পুত্র লক্ষ্মীন্দ্র।

উপন্যাসে মনসার সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও সর্পের প্রসঙ্গ এসেছে বহুবার। আসলে মধ্যযুগের দৈবনির্ভর মনসামঙ্গলের দ্বারা দাঁড় করাতে হয়। উপন্যাসে বারবার চাঁদের সপবিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে। সাপকে সে কুটিলতা, ক্রুরতা আর বিশেষ প্রতীক রূপে মনে করে। ‘শিব ও সর্প, (ষষ্ঠ অধ্যায়) নামক অধ্যায়ে চাঁদ সাপকে পাবতীর ভয়ের কারণ হিসাবে দেখালে সনকা এই সাপকে উর্বরা শক্তির প্রতীক বলে মনে করে। তার মতে, আদিবাসীরা তাদের মঙ্গল-কামনায় সাঁওতাল পর্বতে মনসা পূজা করে। সর্প এখানে মঙ্গলময় দেখানো হয়েছে।

সেই সঙ্গে,—

“চিরকালের জন্য হেরে যাওয়া, সেই কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের নষ্ঠ-আশা-আকাঙ্ক্ষা পদপিষ্ঠ অনুভূতির প্রতীক নাকি সর্প।”^৫

শূরসেন পত্নী দময়ন্তীর মতে,— ঐশ্বর্য আদায়ের শক্তি এই সর্পরূপী। এটি বেগেদের গল্প, কিন্তু আরো লোভ-আশা-আকাঙ্ক্ষা করলে বিষ উগরায় দময়ন্তী পুরাণের বর্ণনা করে বলে যে, সর্প জন্মমাত্র গোপালের অছিছত্র, কিশোর গোপাল সাপের মাথায় নাচে। আবার তক্ষশীলার এক গ্রাম্য পূজকের মতে—

“সর্প নাকি মানুষের মধ্যেই অন্ধকামরূপে থাকে।”^৬

অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতে, মনের অংশই যেন মনসা। এইভাবে মনসা-পুরাণের বিভিন্ন প্রচলিত ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। চাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে মনসার উপস্থিতি সর্বত্র থাকলেও তা আধুনিক মনস্ক ব্যক্তির কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য মিথটিকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখক চাঁদের জীবনকে সমুদ্র তরঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। তাই উপন্যাসটি প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ, তৃতীয় তরঙ্গ ও তরঙ্গভঙ্গিল-এই চরণটি পর্বে ভাগ মরেছেন। উপন্যাসটিকে যেন কাল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাই বিজয়ের মতে, নদী তরঙ্গ অপেক্ষা জীবনের তরঙ্গকে বিভীষিকা মনে হয়েছে—

“অসীম স্থান, ব্যাপ্ত তাদৃশ কালের তরঙ্গভঙ্গ, তার অপর তীর কি আছে? সব ধর্মই জীবাত্মাকে হোক, পুশালকে হোক, নাবিক হতে হয়। কালের তরঙ্গভঙ্গ.... লবণ সবুদের তরঙ্গভঙ্গ অপেক্ষা কি কম বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। অথবা কি কম বিচিত্র।”^৭

পল্লবের ধ্বংস ও চোল সাম্রাজ্যের উত্থানে যে ২৫ বছর ধরে মহাযুদ্ধ কুম্ভকোণমের, উপন্যাসটিকে তা নতুন মাত্রা দান করেছে। সেই সঙ্গে লেখকের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসপ্রীতি ধরা পড়েছে। আবার যৌথ বাণিজ্য। অভিনব ধাতু আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাণিজ্য ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের ‘আধুনিকোত্তর’ বা ‘উত্তর আধুনিক’ কালপর্বে জীবন ও ঐতিহ্যকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা, অমিয়ভূষণ মজুমদার তাকেই পূর্ণতা দিয়ে অন্য কাহিনী নির্মাণ করেন। মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংকেত নিয়ে নির্মাণ করেন নতুন পাঠকৃতি। ইতিহাসের তন্মিষ্ট গবেষকের মতো তিনি লোকপুরাণের ভিতরকার ইতিহাস উন্মোচিত করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সমালোচকের ভাষায়—

“চাঁদবেগে”, “মধু সাধুখাঁ” প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যযুগের কাহিনিতে আধুনিক মাত্রা যোগ করে অমিয়ভূষণ বাস্তবতার মাত্রা সজ্জাত করেছেন।”^৮

লেখক সযত্নে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে ভেঙে এক যুক্তিবাদী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দোষেগুণে ভরা

চাঁদচরিত্র নির্মাণ করেন। এই চন্দ্রশেখরকে, মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদবেনে মনে হয়না, তিনি যেন নবম-শতাব্দীর প্রত্ন ভারতবর্ষের এক ট্রাজিক নায়ক। ভাগ্যানিয়ন্ত্রিত এক অসহায় মানুষের ত্রন্দন আমাদের হৃদয়কে বেদনাসিক্ত করে তোলে। গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতো জয়লাভের সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আবার তার নিজের শেষ কর্ম সম্পন্ন করে যাওয়ার মধ্যে মনসা পুরাণের ব্রজজয়ী চাঁদ চরিত্রের যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। অটল ব্যক্তিত্ব, উদ্ভূঙ্গ, আত্মমর্যাদাবোধ ও অহমিকা নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন পরিচিত জগতের সীমাকে, অতিক্রম করে মহাকালের যাত্রাপথে। মৃত্যুও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এইভাবেই তাঁর যাত্রা কাল থেকে কালান্তরের দিকে। তাই সমালোচক বলেছেন—

“মনসামঙ্গলের পাতায় যে চাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় অমিয়ভূষণের চাঁদ সেই মানুষটি হয়েও আবার অন্য মানুষ। উপন্যাসের চাঁদের চরিত্র স্বভাব, কাহিনির বয়নগুণে চাঁদের যে আদল ফুটে ওঠে তার ভিতরে কোথাও যেন রয়েছে মিথ-পুরাণের সে ব্যক্তিত্বময় মানুষটির সজীব উপস্থিতি।”

ইতিহাস-পুরাণ-মিথ-কাব্য, অলৌকিকতা— বাস্তবতা ও স্বপ্ন মূর্ত-বিমূর্তের অদ্ভুত নক্সা রচনা করেছেন। তবু জীবন ও জীবনে যে গভীরবোধ আমরা পাচ্ছি, তাকে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নব-রূপায়ণ।

সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে (সন্ধানী প্রকাশনী) গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ পায় ১৯৯৩-এর মার্চ মাসে। অমিয়ভূষণের ‘চাঁদবেনে’র মতো এটি মহাকাব্যিক উপন্যাস নয়। মাত্র দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসে রয়েছে নিটোল এক কাহিনি। উপন্যাসের অন্যতম চাঁদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুযোগসন্ধানী, ব্যক্তিস্বার্থবাদী, হিংস্র, লোভী, জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামকে দেখিছেন। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, নতুন রাষ্ট্রগঠন প্রভৃতির পরেও আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন জমিদারতন্ত্রের অবসান ঘটেনি। সাধারণ দরিদ্র কৃষকরা তাদের ঘটিবাটি ভিটেমাটি, হালের বলদ পর্যন্ত বিক্রি করে সর্বশ্রান্ত হয়। আকস্মিকভাবে নেমে আসা খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় কৃষক মজুরদের সর্বহারার পথে নামিয়েছে। এই কৃষকরা নিজেদের বাচার তাগিদে জমিদার ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলনা। কিন্তু এর মধ্যে থেকে লেখিকা মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রের অনুকরণে এমন এক চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন যে এই প্রতিকূলতাকে মেনে নিতে নারাজ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সে অস্ত্র হাতে নিয়ে শাসক গোষ্ঠীর মুণ্ডপাত পর্যন্ত করতে পারে। বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’ (১৯৬৬) নাটকে দেখি জোতদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রামের কথা, কিছু লেখিকা চাঁদ চরিত্রের একক সংগ্রাম ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে তুলে ধরেছেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করব অমিয়ভূষণের চাঁদবেনের মতো উপন্যাসে

প্রাচীন সাম্রাজ্যের ইতিহাস বা বাণিজ্যিক ইতিহাস উঠে আসে নি। কিংবা চাঁদবেনের সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার কথা নেই। যদিও চাঁদের বাবার নদীতে (পদ্মায়) নৌকা নিয়ে ভেসে যাওয়ার কথা উঠে এসেছে। আমাদের চিরপরিচিত মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে সমকালের সমস্যাকে পরিস্ফুট করেছেন লেখিকা। আর এই সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়ে পূর্বোক্ত চাঁদবনে থেকে এটি পুরোপুরিই আলাদা উপন্যাস হয়েছে।

পদ্মা নদীর তীরে চম্পাইগঞ্জ গ্রামের একজন নিতান্ত ক্ষেতমজুর চাঁদ। আকিকা দেওয়া নাম মুছে গিয়ে মায়ের আদরের ডাক ‘চাঁদ’ নামেই সে পরিচিত। বাবা সামান্য সম্বল বিলের জমি হাতছাড়া করে ফেললে, তখন থেকে মহাজন আজু মৃধার জমিতে চাব করে ফসল ফলায় সে। তবে নিজের জমিই হোক বা অপরের জমিই হোক, ফসল ফলানোতেই তার আনন্দ। মাটিকে সে বড়ো ভালোবাসে। পিতা যেমন নৌকার মালিকের কাছ থেকে মজুরি না পেলেও নৌকা নিয়ে পদ্মায় পাড়ি দেওয়াই ছিল জীবনের চরিতার্থতা। হাসিমুখে তাই পদ্মার অনন্ত জলে ভেসে যেতে পারত। কিন্তু চাঁদের জীবনে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে ওঠে। যে পদ্মার অতল জলে পাড় ভেঙে জমিকে গ্রাস করত, সেই পদ্মা এখন শুষ্ক বালু মাত্র। যে জমিতে ফসল ফলাবে চাঁদ, প্রচণ্ড খরার দাবদাহে ফসল যায় পুড়ে। মাটি ফেটে চৌচির হয়। অন্যদিকে মনসারপী আজু মৃধার অত্যাচার তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কিন্তু সে মনোবল ও আত্মনিষ্ঠার জোরে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে তৎপর। চাঁদের ছোটবেলার স্মৃতিচারণায় মনসার মিথের কথা পাওয়া যায়। ছোটবেলায় বাবার সাথে মনসার পালা দেখে রাস্তার ফণীমনসার গাছকে সাপ মনে হত। তখন থেকেই তার মনসার প্রতি বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। বাবাকে সে বলেছিল—

“হামিও হাপেরে ভয় করি। মাগো গা ক্যাংকা জানি করে।”^{১০}

ছোটবেলা থেকে চাঁদ বণিকের আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠাকে নিজের মধ্যে প্রোথিত করতে পেরেছিল সে। এক্ষেত্রে সহায়তা ছিল বাবার আদর্শ। এখন মানুষের বুক থেকে উৎসবের জোয়ার চিরকালের ভাটিতে নেমে গেছে। ফণীমনসা গাছ পরিণত হয়েছে কাটাগুলে। প্রকৃতির সৌন্দর্য হয়েছে বিনষ্ট। একসময় চম্পাইগঞ্জের পাশ দিয়ে সপ্তডিঙা মধুকর ভেসে যেত। এখানে বেহুলারা কলসি কাঁখে জল আনতে গিয়ে নদীতে জল ছিটাত চোখ লাল করে ফলতে। এখন সেই পদ্মা শুষ্ক মরুভূমি, পথঘাট ধুলায় পরিবেষ্টিত। তবুও চাঁদ চোখ বুজলে মনসা পালা দেখে। নিজে চাঁদবনে হয়ে ঘরে ফেরে। আজু মৃধা চোখ দেখালেও চাঁদ বাতাসে উড়িয়ে দিতে চায় বিদ্রোহের লক্ষ লক্ষ বীজ। প্রয়োজনে সে হেতালের লাঠি নিয়ে উদ্যত হতে পারে। আজু মৃধায় তোয়াজে তার কিছু যায় আসে না। আপাত দৃষ্টিতে সে যতোই পরাজিত হোক না কেন তার কিছু যায় আসে না, সে মাটি চিনেছে, চষা ক্ষেত চিনেছে, বীজ চারা আগাছা চিনেছে। জন্মের সময় যে অভাবের সাপ শরীরে ঢুকেছিল, সেটা এখনও ফোঁসফোঁসায়। চাঁদের বাবাও

এটা ঠেকাতে পারে নি। চাঁদ ও পারছেন। কিন্তু চাঁদ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে চায় না আর কেউ অভাবের টানে ভুগুক; দিগন্তরেখার সীমানায় তাকিয়ে তার বোধ ফসলের প্রাচুর্যে ভরে ওঠে চাঁদ বণিকের ময়ূরপঙ্খির স্বপ্ন দেখে বুক বাধে সে। সে জানে—

“চেঙমুড়ি কানীবিটি আজু মৃধা আমাকে ছোবল দেয়। সে বিষে আমি মরিনা। আমি তা হজম করে নীলকণ্ঠ হই। আমি জানি আমার বেহুলা নেই যে মরা লাশ বুকে নিয়ে জলে ভেসে বেড়াবে। জীবনের ভিক্ষায় অনন্তের পথে যাবে।”^{১১}

কিন্তু চাঁদ কারো কৃপা বা অনুদান পছন্দ করে না। দরকার পড়লে ক্ষেতমজুরদের নিয়ে সে মহাজনের গোলা থেকে চাল নিয়ে আসে, তবুও সরকারি আটা আনতে যায় না সে।

উপন্যাসে দেখি স্ত্রী ছমিরণের ব্যর্থতায় চাঁদ ফুরিয়ে যায় না। তাই স্কিনা তাঁর স্বপ্নের ইঙ্গিত। স্কিনাকে নিয়ে সে চম্পাইগঞ্জে কালীদেহে সপ্তডিঙা প্রস্তুত করতে চায়। বাগিজে যেতে চায় আবার। দরকার পড়লে আজুমৃধার ঘাড়ের উপর থেকে মাথাটা ফেলে দেবে। সব জমি ক্ষেতমজুররা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে। তারা নিজেরা জমির মালিক হবে। চাঁদ তাই মনসারুণী আজু মৃধাকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে—

“হামি চম্পাইগঞ্জের মাটি চিনি, ফসল ফলাই। হামার আবাদ বাদে আপনাকের গোলা ভরে না। চম্পাইগঞ্জে হামি থাকবো নাতো থাকবেন আপনি।”^{১২}

পুরাণের চাঁদ সদাগরের ছয়পুত্র, সপ্তডিঙা মধুকর, সমুদ্রে ডুবে গেলেও সে পুনরায় পুত্র লখিন্দরের মধ্য দিয়ে নিজের সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শকে বলীয়ান রাখতে চেয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার ধানি ছেয়ে ফেলে চাঁদ সদাগরকে। কড়ে আঙুলে হোক তবু মনসার পূজা তাকে দিতে হয়। বর্তমান উপন্যাসেও লেখিকা দেখিয়েছেন স্কিনার গর্ভে লখিন্দরের জন্মের কথা। কিন্তু এখানে মনসামঙ্গলের মিথকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা। চাঁদের মতে, তাদের ভবিষ্যতের লখিন্দরকে লোহার দেয়াল দিয়ে আড়াল করতে হবে না। এই লখিন্দরের জন্ম হবে খোলা আকাশের নিচে। এই লখিন্দর অত্যাচারী ক্রুর শক্তির প্রতীক আজু মৃধার বেড়ে ওঠাকে রুখবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ‘চম্পাইগঞ্জের মাটির আমু মৃধা ও তার বংশধর। তাই আমরা দেখি বিলের জমিতে আজু মৃধা চাঁদকে শাসালে, চাঁদ প্রতিবাদ স্বরূপ আজু মৃধার মুণ্ডকে ধড় থেকে আলাদা করে দেয়। এভাবেই সুদিন ফিরিয়ে আনতে চায় সে। সব মানুষ নিয়ে চম্পাই গঞ্জের একটাই গেরস্থালি দেখতে চায় সে। এখানে আমরা সমতটের চন্দ্রশেখর বসুর সাথে মিল খুঁজে পায়। চন্দ্রশেখরও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, অভিনব ধাতু আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে সমতটকে উন্নত নগরীতে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেটা বাস্তববায়িত হয় নি। অমিয়ভূষণের চন্দ্রশেখর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার সমতট কুস্তকোনমের মহাযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। শেষ পর্যন্ত মাথানত না করলেও জয় ঘোষিত হয় নি তার অন্যদিকে মনসামঙ্গলের মিথকে নিলেও চাঁদ চরিত্রের জয় ঘোষণা করেছেন লেখিকা।

চাঁদকে সে অন্তর্দ্বন্দ্ব জর্জরিত করে গড়ে তোলেন নি, তাঁর চাঁদ অসীম সাহসী পুরুষ আসলেও থেকে থাকে না সে, নিজ উদ্দেশ্য সফল করতে সে মানুষের মুণ্ডপাত পর্যন্ত করতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে সে। এখানেই অমিয়ভূষণের 'চাঁদবেনে'র থেকে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেণে'র মূল পার্থক্য। শেষে লেখিকা তাই চাঁদের মুখ দিয়ে গুনিয়েছেন—

“আমি নিঃশেষ হই না। সে কোনো মূল্যেই বিকিয়ে দেই না কেন, আমার পণ্য অনিঃশেষিত। বাতাসে আমার বীজ ওড়ে। দেশের পলিমাটিতে সে বীজে চারা গজায়। দ্রুত বাড়ে সে মহীরুহ। তাই আজ মৃধারা আমাকে ভয় পায়। আমি ছুরি দিয়ে ওদের মেদবহুল বুকে আমূল সেধিয়ে যাই। চাঁদ সদাগর মনসাকে দিয়েছিলো কড়ে আঙুলে গুজো। কড়েতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি চাই মুণ্ড।”^{১০}

তথ্যসূত্র :

১. সাক্ষাৎকার, 9 th May 2013, Toronto Festival of Literature and the Arts 2013.
২. তদেব
৩. ১৩ জুলাই, ১৯৯৪, আজকাল পত্রিকা (সাক্ষাৎকার)।
৪. মজুমদার অমিয়ভূষণ, অমিয় রচনাপ্রসঙ্গ-৯, খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, জানু-২০১০, পৃ. ২৩।
৫. তদেব, পৃ. ২২৩
৬. তদেব, পৃ. ২২৪
৭. তদেব, পৃ. ৩৪৬
৮. নাগ রমাপ্রসাদ, স্বতন্ত্র নির্মিত অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৯৯
৯. নস্কর, সনৎকুমার, 'প্রাগাধুনিক বাংলা-সাহিত্যঃ পরিপ্রঙ্গ ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃ. ২১০
১০. হোসেন, সেলিনা, 'চাঁদবেনে', আহমদ পাবলিশিং হাউস (ঢাকা), তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর-২০০৫, পৃষ্ঠা-১৫
১১. তদেব, পৃ. ৫০
১২. তদেব, পৃ. ১২০
১৩. তদেব, পৃ. ১২৬
- অন্যান্য সহায়কগ্রন্থাবলী:
১. ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১২

২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'আখ্যানের সাতকাহন', অমৃত লোক সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৫
৩. নাগ, রামপ্রসাদ, 'অমিয়ভূষণঃ ট্রমাচিহিত এপিক', ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৮
৪. ভট্টাচার্য, বীতশোক, 'কথাজিজ্ঞাসা', এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৪
৫. বর্মা, উদয়শংকর, 'উপন্যাসের অন্যভূবন' কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০০৮
৬. সামন্ত সুবল (সম্পাদনা), বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অনীক্ষা', এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি-১৯৯৮
৭. পাল-অপর্ণা 'ভিন্ন স্রোতের ঢেউ' বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭-৬৭), অক্ষয় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩
৮. মণ্ডল বরেন্দ্র, 'আখ্যানের আলেখ্য', দিবারাত্রির কাব্য, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১ (শ্রাবণ)
৯. মিরবর কল্যাণ, 'বাংলাদেশের উপন্যাসঃ চার দশক' পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ-১৩৯৯ (বঙ্গাব্দ)
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৬-০৭
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-১৯৬১
১২. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্যদ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট-২০০২
১৩. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-১৩৫৬
১৪. 'সাহিত্যচিন্তা', গবেষণাধর্মী ষাণ্মাসিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বইমেলা-১৪২০

হিউম

ISSN 2349-8013

বর্ষ-২১, সংখ্যা-২য়, প্রকাশ: ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১৪



হিজল

সম্পাদক

সৌরভ রায়

হিজল

Hijal

ISSN 2349-8013

A journal based on reseach-oriented literary and cultural discourse.

বর্ষ - ২১, সংখ্যা - ২য়, প্রকাশ: ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১৪

সম্পাদক: সৌরভ রায়

প্রধান উপদেষ্টা : প্রফেসর দিলীপ কুমার রায়

সহযোগিতায় : নীলকান্ত পাল

অঙ্কর বিন্যাস : দীপতনু মাল্টিমিডিয়া, শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার

প্রচ্ছদ : কৌশিক বিশ্বাস

মুদ্রণে : টেকনো ওয়ার্ল্ড, শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার

বিনিময়: ৫০ টাকা মাত্র

রাজু সাহা কর্তৃক, শামুকতলা, পোঃ সম্ভালপুর, জেলা - আলিপুরদুয়ার, ৭৩৬২০৬
থেকে প্রকাশিত।

E-mail address: hijal4680@gmail.com , sourav4680@gmail.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৪

সার্থ শতবর্ষ পরেও রবীন্দ্রনাথ কেন প্রাসঙ্গিক - দিলীপ কুমার রায় ৫

সমাজ মনস্কতার আসিকে মৈমনসিংহ গীতিকা: প্রসঙ্গ - চন্দ্রাবতী পালা - উত্তম দাস ৯

বনফুলের অণুগল্পের ভাষাশৈলী - সুধাংশু কুমার সরকার ১৭

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : অলৌকিক প্রসঙ্গ - অখিল ঘোষ ২৬

সময়ের অন্তর্গতনায় 'জাগরী' উপন্যাস - যাদবেশ আচার্য ৩৬

প্রফুল্ল রায়ের 'ক্রান্তিকাল' উপন্যাস: বিচ্ছিন্নতাবাদীর মানবায়নে - উজ্জ্বল শীল ৪২

শনিবারের চিঠি এবং হেমন্তবালা দেবী - মল্লিকা দাশগুপ্তা ৪৯

দেশকাল সমাজ ও দ্বিজেন্দ্রলাল - রমা পাল ৫৫

সমরেশ বসু : গঙ্গা - সৌরভ রায় ৬০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'একঘরে': শিল্পী হতে সমাজহিতৈষীর রূপকার - পার্শ্বসারথি ঘোষ ৬৯

চাঁদবেনে: অনুসৃজনে মনসাপুরাণ - মাগফেরা বেগম ৭৪

চাঁদবেনে : অনুসৃজনে মনসাপুরাণ

মাগফেরা বেগম

স্বাধীনতা উত্তরকালে আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আবির্ভাব (৫০-এর দশকে) এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের যাঁরা স্বাতন্ত্র্যদীপিত কথাকার, অমিয়ভূষণ মজুমদার তাদের মধ্যে অন্যতম। কবিভাবার মতো গল্পে উপন্যাসে প্রাতিদ্বিক গদ্যভাষা নির্মাণে আমরা বিশেষভাবে যে দুজন ব্যক্তির নাম করতে পারি, তাঁরা হলেন—অমিয়ভূষণ ও কমলকুমার মজুমদার। অমিয়ভূষণের গদ্যভাষায় ও উপস্থাপন ভঙ্গিতে আছে ডিফারেন্স। বলা যায় তাঁর গদ্যরচনা ও গদ্যরীতি একেবারে তাঁর ঘরানার ও এটি তাঁর রচনার বিশেষ সম্পদ। বুদ্ধি, মেধা, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের রসায়নে রচিত তাঁর সাহিত্য। প্রাক্ স্বাধীনতা মুহূর্তের রাজনৈতিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিভেদ-দাঙ্গা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ইত্যাদি রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের মধ্যে কিছু উপন্যাসে উদার মানবিক বোধে উদ্ভূত হয়। সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ভুলে মানুষের মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ('নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'কেয়াপাতার নৌকা', 'মেঘের ঢাকা তারা', 'উত্তরাধিকার', ইত্যাদি উপন্যাসে)। সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ধারার পাশে আরও একটি ধারা বাংলা উপন্যাসে সচল ছিল তা হল মনন-চিন্তা প্রধান বিতর্কমূলক ভাবনাকেন্দ্রিক উপন্যাসের। এ জাতীয় উপন্যাসের লেখকরা মানুষের মনের ভিতরের আত্মসমীক্ষা, কিংবা ইতিহাস থেকে কোনো একটি তত্ত্ববিষয়কে তুলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তার পূর্ণমূল্যায়ণে নতুন মাত্রা দান করেন। আছে মানুষের মনের অন্তঃকোণে পাপবোধ, স্বীকারোক্তি, বা ডিটেকশন, কনফেশন প্রভৃতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মনঃসমীক্ষামূলক ঘটনার বিকৃতি। সেই সঙ্গে সমাজ বা কালের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের রূপায়ণের দিকটিও গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনোত্তর বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের শুধু চরিত্রই প্রাধান্য পেতে থাকে না, চরিত্রের অন্তর্ঘর্ন রহস্য বা মানুষের মনের বাস্তবতা, জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। পরপর দুটি মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা, দেশভাগ, তত্ত্বজ্ঞিত নানা ঘটনার উত্তাল তরঙ্গ সমাজের চেহারাটাকেই বদলে দিল এমন আমূল যে সেই পরিবর্তিত দিনের কথা ও রূপ ধরে রাখার কথা সাহিত্যের ভাষায় তৈরী হল নতুন ডিসকোর্স। জন্ম নিল নতুন প্রজন্মের লেখক। যাঁদের লেখায় আধুনিক জটিল সমাজের বহুরূপ ও বহু অনুভব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক ব্যক্তি মানুষের দুর্বোধ্য জটিল মন ও মানুষের জীবনযন্ত্রণার রূপ। এই উপন্যাসগুলিতে মানুষের সংকট অন্ততপক্ষে দুটি স্তরে অনুভূত। একটি সমাজ পরিস্থিতি জনিত অসঙ্গতি, অন্যটি হল আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা। আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে এবং রাজনৈতিক পটভূমি অস্বীকৃত হয় নি, কিন্তু ব্যক্তিমনের প্রতিটি স্তরেই, প্রতিটি বিভঙ্গে সচেতন বিশ্লেষণ এবং অনিয়ন্ত্রিত অবচেতনা, সেই বহির্ভূবন কীভাবে এক নতুন বসতি

গড়ে তুলেছে মানুষের চারিদিকে তারই চলচ্চিত্র এই উপন্যাস। এই উপন্যাসিকেরা ভিন্নধারার লেখক। তাঁরা বাংলা উপন্যাসের জলতরঙ্গে নিয়ে এসেছেন ভিন্নশ্রোতের ঢেউ, তাঁরা জনপ্রিয়তার হাতছানিতে ভোলেন নি। তাঁরা পাঠকের জন্য বিনোদন মধুর কোনো আখ্যান রচনার চেষ্টা করেন নি। জীবনকে অনুভব করেছেন যে জটিলতায়, পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তারই প্রতিকল্প। এই সময় বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে মননশীল পাঠকের জন্য নিগূঢ় জীবনদৃষ্টি ও ভিন্নধরনের মনোবিশ্লেষণের শক্তিতে বাংলা উপন্যাসকে দাঁড় করান অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার, দেবশ রায় অসীম রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সাবিত্রী রায় প্রমুখ উপন্যাসিকগণ।

বাংলা উপন্যাসের পাঁচের দশকের বিভ্রান্ত, সংশয়, নতুন অনুসন্ধানের পরিস্থিতিতে খুব নিস্তরঙ্গ আবির্ভাব অমিয়ভূষণ মজুমদারের। বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল লিপিকুশলতায় উপন্যাসকে যুগের ইতিহাসকে বিবৃত করেছেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনাই স্বতন্ত্র ও ধ্রুপদী। তিনি প্লটের মিথোলজিক্যাল বা সার্বজনীন উপাদানটিকে অতিক্রম করেছেন। কাহিনীর একমুখীন ছবুত্ব ক্রম তিনি আখ্যানে ব্যবহার করেন নি। আখ্যানে তিনি বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার নানান ক্রমে বিন্যাস্ত করেছেন যার সঙ্গে অনেক সময়ই কাহিনীর কালের ক্রমের মিল থাকে না। তাঁর মতে— “জন্ম থেকেই একদায় আছে উপন্যাসের যে, তাকে বাস্তবের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।”^১ এবং এই বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গেলে কাহিনি ক্রম বজায় রাখলে ততটা জীবন্ত ভাবে ফুটে ওঠে না। সার্থক উপন্যাসে কাহিনিকে কাঠামো মাত্রই মনে করে জীবনের ‘উপন্যাসায়নেই’ তিনি বিশ্বাসী। উপন্যাস বিবরণ বা ঘটনার সন্নিবেশের চেয়ে তিনি উপন্যাসের শিল্পময় অস্তিত্বকে বড় করে দেখেন। আর সমাজের প্রতিটি মানুষই যে নায়ক হওয়ার যোগ্য তা তিনি বিশ্বাস রাখতেন। বাইরের জগৎ থেকে মানুষের মনের জগৎ, আবার সেখান থেকে বহির্জগৎ এই ক্রমানুসারে তাঁর সাহিত্য ও চিত্রকল্প আমরা লক্ষ্য করি। অমিয়ভূষণ মজুমদারকে এক অনড় প্রতীজ্ঞার প্রতীক বলে ধরে নেওয়া হয়। সমালোচকের ভাষায়—“পাঠক সংখ্যা যত সামান্যই হোক না কেন সমস্ত জীবন তিনি সাহিত্যরচনার পদ্ধতির সামান্যতম ও ব্যতিক্রম ঘটাননি। সর্বসাধারণের সহজবোধ্যতার সংজ্ঞায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি সাহিত্যের সংবিলম্বিত সচেতন ছিলেন।”^২ ক্রমাগত অনুশীলনে পাঠকের সংবিলম্বিত প্রবৃত্তিতে তিনি জীবন সায়াহ্নেও আশাবাদী ছিলেন। তিনি মনে করেন ঈশ্বরের মতো সাহিত্যিকও প্রকৃতিগত চেতনার তাগিদে আত্মানুসন্ধান করে থাকেন। এই আত্মানুসন্ধানের জন্য কখনও কখনও সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রচলিত প্রত্যয় লঙ্ঘন করে সাহিত্যিক অগ্রসর হতে থাকেন। পথে হয়তো পৃথিবীর ট্রাজিক ধারণাটা আবিষ্কার করা হয়। তাঁর মতে—

“কিছু একটা সাহিত্যিক বলতে চান। এই পৃথিবীতে বাস করে এক অনুভূতি এবং সমগ্রতায় তিনি কিছু দেখে থাকবেন, অন্য অনেকে যা দেখেননি। সে কথাটাই তিনি প্রকাশ করতে চান।

এবং যেহেতু সমগ্র চরাচরকে ভূর্জপত্র কিম্বা কাগজের পিঠে স্থাপন করা সম্ভব নয়, কলাকৌশল করে তারই ভ্রমোৎপাদন করতে হয়। ভ্রমোৎপাদনই তার আর্ট। আর তার হাতের রং হচ্ছে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের সাধারণ গ্রাহ্যবোধ।”^{১৬} একই কথার প্রতিধ্বনি আরও একজন ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের কথায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। অমিয়ভূষণের নিজস্ব ঢাঙের যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ভাষা আবার পাঠকের সঙ্গে একটা ব্যবধান তৈরী করে, লেখক অবশ্য স্বীকার করেন তিনি সহজভাষা লিখতে পারেন না। সেটা সর্বদা ইচ্ছাকৃত নয়, পরিবেশও এজন্য দায়ী।

বিশ শতকের শেষার্ধের এই মননশীল লেখকের জন্ম ১৯১৮ সালের ২২ শে মার্চ। (বঙ্গাব্দ ৮ ই চৈত্র; ১৩২৪) কোচবিহার শহরে মাতুলালয়ে। জীবনাবসান ঘটে ৮ ই জুলাই ২০০১ সালে কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ ও অসম-শিলচর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের জীবনালেখ্য তার কথা সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এছাড়া স্বাধীনতা, দেশভাগ, জাতিদাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মানবিক চেতনার অবমূল্যায়ণ তাঁর সাহিত্যে বারে বারে ছায়া ফেলেছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও মিথও হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যবিষয়। তাঁর উপন্যাসে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির সমান্তরাল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নিম্নবর্গীয় সাংস্কৃতিক অপরতায় চমৎকার নির্মাণ ঘটেছে। অমিয়ভূষণের প্রথম প্রকাশিত গল্প, ‘প্রমীলার বিয়ে’, ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ১৩৫৩ (১৯৪৬) সালের কার্তিক মাসের নবম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়। এর আগে তাঁর নাটক ‘দি গড অন মাউন্ট সিনাই’, ১৯৪৩ সালে ‘মন্দিরা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১ম উপন্যাস ‘নীলভূইয়া’ (১৯৫৫) যার পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ ‘নয়নতারার’ রূপে ছাপা হয়। যদিও অন্যতম এপিক উপন্যাস ‘গড় শ্রীখণ্ড’ (১৯৫৭) ১৩৬০ সালে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে — ‘দুখিয়ার কুঠি’ (১৯৫৯খ্রি.), ‘নির্বাস’ (১৯৫৯), ‘উদ্বাস্তু’ (১৯৬২), ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ (১৯৮১), ‘বিলাস বিনয় বন্দনা’ (১৯৮২), ‘রাজনগর’ (১৯৮৪), ‘মধু সাধুখাঁ’ (১৯৮৮), ‘ফ্রাইডে আইল্যান্ড’ ও ‘অথবা ‘নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর’ (১৯৮৮), ‘বিবিজা’ (১৯৮৯), ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩), ‘বিশ্বমিভিরের পৃথিবী’ (১৯৯৭) ইত্যাদি। গল্পসংগ্রহের মধ্যে — ‘পঞ্চকন্যা’ (১৯৬২), দীপিতার ঘরে রাত্রি’ (১৯৬৫), ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ (১৯৮৬), ‘এই অরণ্য এই নদী এই দেশ’ (১৯৮৮), ‘গল্পসমগ্র’ (১৯৯৪), ‘ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প’ (২০০০), ‘লিখনে কি ঘটে’ প্রবন্ধ সংকলন’ (১৯৬৬) এছাড়া তাঁর অসংখ্য অগ্রণিত উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ছিন্নমূল মানুষের বাস্তবসংক্রান্ত সমস্যা, সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দেখানো হয়েছে ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসে। পূর্ববঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকা উত্তরবঙ্গের এক বিশাল ক্যানভাসের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের সংকটময় জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন নিখুঁতভাবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমাজের অস্থিরতার চিত্র ‘নীলভূইয়া’ উপন্যাস। নীলচাঁব ও নীলবিদ্রোহ কে কেন্দ্র করে সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবন আলেখ্য এই

উপন্যাস। ‘দুখিয়ার কুঠি’, ‘নির্বাস’, ‘উদ্ধাস্ত’, ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘রাজনগর’ প্রভৃতি উপন্যাসে উদ্ধাস্ত সমস্যা, উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক জীবনচিত্র, রাজপরিবারের কথা প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইতিহাস ও পুরাণের নবনির্মাণে তাঁর দুখানি উপন্যাস— ‘মধু সাধুখাঁ’ (১৯৮৮), ও ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩) উপন্যাস। অমিয়ভূষণ নিজেই বলেছেন ‘নীলভূইয়া’ যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কারণ এর সব চরিত্রই কাল্পনিক, আবার ঐতিহাসিকও। তৎকালীন নীলান্ত সমাজকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ‘গড় শ্রীখণ্ড’ ও ‘চাঁদবেনে’ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এই মন্তব্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই। আসলে লেখক জীবনের সূচনা পর্বের গভীরতর দ্বিবাচনিক উপলব্ধিতে অমিয়ভূষণ নিশ্চিত যে, লেখক হিসেবে তাঁর দায় ইতিহাস ও কল্পনার নতুন পরিসর আবিষ্কারে নতুন পাঠকৃতির নির্মাণে। সমস্ত আপাত বিরোধ পেরিয়ে মানুষের নতুন অবসর নির্মাণ করতে চান বলেই বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ-এর মধ্যে মেলবন্ধন করতে চান তিনি। আবিষ্কার করতে চান সময় স্বভাবের নতুন তাৎপর্য সমালোচক তপোধী ভট্টাচার্য এই সূত্রে বলেছেন—

“দূরত্ব ও নৈকট্যের দ্বিরালাপে গড়ে ওঠে ‘গড় শ্রীখণ্ড’ বা ‘চাঁদবেনে’র মতো উপন্যাসের সময়। কল্পনা তার কাছে ‘অন্তর্ভেদী রঞ্জনে রশ্মি, যার সাহায্যে ইতিহাসের নির্মোক অর্থাৎ বহিবৃত্ত আখ্যান পেরিয়ে তিনি পৌছতে চান অন্তবৃত্ত জীবনসত্যের মর্মে।”^{১৪}

কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে তাঁর প্রতিটি রচনায় দেখা যায় সচেতন নির্মিতি। বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনীতির সঙ্গে কাব্য; পুরাণ, ইতিহাস ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, চিত্রকলা, তাঁর উপন্যাসে দেখা যায়। জ্ঞানের জগৎ ও কল্পনাশক্তি মিশিয়ে তিনি জীবনের বাস্তবতা নির্মাণ করতে চান। মধ্যযুগের সমাজ সংস্কৃতি-ইতিহাস ও মানবিক চেতনার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ‘মধুসাধুখাঁ’ উপন্যাসে। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত এই কাহিনীতে সমগ্র মধ্যযুগ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র মধ্যযুগ পূর্বস্থলীর এক বণিক। নৌবাণিজ্যে দক্ষ মধু দক্ষিণ থেকে এলাচ, লবঙ্গ, চুয়ানন্দন, শাখের চুড়ি ইত্যাদি নিয়ে আসে আবার উত্তর থেকে কস্তুরী পোস্তদানা, আমলকী ইত্যাদি। ষোড়শ শতকের জীবনকে অবলম্বন করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সর্বকালীন ও নিরবচ্ছিন্ন জীবনকথার নির্যাস। ইতিহাস ও পুরাণ-বাস্তবতা ও মিথকে একত্রিত করে রচিত হয় তাঁর অন্যতম উপন্যাস ‘চাঁদবেনে’।

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুপম অভিজ্ঞান প্রাগাধুনিক পর্বের রচনার বিশ শতকে ঘটেছে নানা অনুসৃজন। বিশ শতকের অস্থিরতাময়, সংকটময় পরিস্থিতিতে কিছু কবি উপন্যাসিক হাত বাড়িয়েছেন নিজ জাতির ঐতিহ্যের দিকে, করেছেন শিকড়ের সন্ধান। বাঙালীর ঐতিহ্যসমৃদ্ধ রচনা চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ও মঙ্গলকাব্য নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য-কবিতা। প্রাগাধুনিক রচনা

অবলম্বনে বর্তমান অস্থিরতাময় সময়ে জীবন জিজ্ঞাসাকে, চরিত্রের জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত হওয়ার সাথে সাথে প্রাক্ আধুনিক পর্যায়ের বিস্তৃত আখ্যান গ্রন্থন পরম্পরাকে পুনরুদ্ধার করতে দেখা যায় তাঁকে। এক্ষেত্রে তাঁর 'চাঁদবেনে' উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসটি 'চতুরঙ্গ' ও 'বসুধারা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে। ৪টি তরঙ্গ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত মোট ২৯ টি অধ্যায়ে সুবৃহৎ এই উপন্যাস পুরাণ ইতিহাস ও ঐতিহ্যানির্ভর এক মহাগ্রন্থ। বিষয়বৈচিত্র্যে, স্থান-কালের উল্লেখ, চরিত্র-নির্মাণে- চরিত্রের নামোল্লেখের, ইতিহাসের বিশ্লেষণে উপন্যাসটি একপ্রকারের মহাকাব্যিক রূপ ধারণ করেছে। লেখক মনসামঙ্গলের কাহিনিকে স্থাপন করেছেন বিস্তৃততর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তবে মনসা মঙ্গলের কাহিনি নিলেও তিনি নবম থেকে দশম শতাব্দীর সময়ের ইতিহাস-পালযুগের শেষ পর্ব ও সেনযুগের সূচনা পর্বের মধ্যবর্তীকালীন আরাজকতাময় সময়কে উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থিত করেছেন। এমনকি পল্লব-চোল যুদ্ধ প্রসঙ্গও এসেছে। উপন্যাসের পটভূমিকায় বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিণ-ভারতের সীমাবদ্ধ থাকে নি। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের দেশ সমূহ তথা পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্র, সেখানকার জনপদ ও সমাজ-ইতিহাস লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ ও উত্থান পতনের কাহিনির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথ ও পুরাণকথা। এটি ইতিহাসকথা নয়, পুরাণকথা তবে মনসামঙ্গলের পুরাণকে সরাসরি প্রয়োগ ঘটাতে পারে নি। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি বিশ শতকে বসে লিখছেন উপন্যাস। বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক জীবনযাত্রা অলৌকিক অন্ধকার ও মিথোলজিক্যাল রহস্য মিশিয়ে রূপদৃষ্ট কথাসিল্পীর মতো জীবনকে স্পর্শ করার চেষ্টা। এখানে অমিয়ভূষণ দেশীয় ঐতিহ্যের শিকড়সন্ধানী। পৌরাণিক আবহ থাকায় বাস্তবতার প্রশ্নগুলি বড় হয়ে উঠে না অনেকসময়। এমনকি ইতিহাস পুরাণকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। উপন্যাসে রয়েছে চাঁদ সদাগর, সনকার সপ্তডিঙা, চাঁদের পুত্রদের মৃত্যু, সমুদ্রঝড়, সপ্তডিঙাসহ চাঁদের নিঃস্ব হয়ে যাওয়া, লখিন্দর, সর্পপূজা প্রভৃতির মতো বিষয়গুলিই। ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় পৌরাণিক বা আঞ্চলিক উপন্যাসেই অমিয়ভূষণের ইতিহাস প্রয়োগ অধিক সুপ্রযুক্ত এবং জীবন্তও। ইতিহাস এগুলিতে অনুসঙ্গমাত্র, অলংকরণমাত্র, ব্যঞ্জনামুখী ও প্রবহমান স্রোতরূপ হয়ে ওঠায় এই উপন্যাসগুলির আধুনিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। 'মধু সাধুখাঁ' ও 'চাঁদবেনে' তার অন্যতম প্রমাণ। 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে চাঁদের সুতীর্থ যাত্রা ভাগ্যের প্রতিস্পর্ধী হবার লড়াই, যুগসন্ধিক্ষণের তন্নিষ্ঠ বাস্তব ইন্দ্রজাল রচিত অধিবাস্তবতা, সময়ের মাত্রাবৃত্তে মানবের অসহায়তা, মৃত্যু থেকে নবজন্মের আভাস, সব নিয়ে এক কৌমসত্ত্বার ট্রাজেডি এই উপন্যাসে পৌরাণিকতার মাত্রাতে বয়ে এসেছে। বাঙালি জীবনের অতীত ও বর্তমান, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ঐতিহ্য ও অবক্ষয় কেন্দ্রীয় ভাবনা হয়ে এসেছে উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত। চাঁদের ব্যক্তিক বিদ্রোহ ব্যক্তিগত থেকেও

সামগ্রিক হয়ে উঠেছে। অতীতচারী থেকেও সমকালীন পরিচয়ে চিহ্নিত হয়েছে।

২৯ অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসে চাঁদ বণিকের চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি দিক স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে দেখিয়েছেন অনেক সময় কালানুক্রমিকে ভেঙে। নির্দিষ্ট কোন প্লট নয়, বৃত্তকার কাহিনির বুনট নয়, সমতলিক এক কাহিনি পরস্পরা তুলে ধরা হয়েছে। আসলে তার ‘মহিবকুড়ার উপকথা’ ‘বিনয় হলং মানসাই উপকথা’, ‘চাঁদবেনে’ প্রভৃতি উপন্যাসে সময়ের ক্ষেত্রে অতীতের ঘটনার অনুপ্রবেশ দেখা যায়। উপন্যাসগুলিতে ঘটনার সূত্র ধরে অতীতের ঘটনার ‘পূর্বকথন’ ছুঁছুঁয়ায় দেখা যায়। ‘চাঁদবেনে’-তে লেখকের দক্ষতা আরো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে লোকপুরাণ ও মিথক্রিয়ায় সার্থক ব্যবহারে। বাঙালি জীবনের যৌথ কৌমবিশ্বাস বর্তমানের বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। অমিয়ভূষণ মনসামঙ্গলের মিথকে উপন্যাসে স্থাপন করেছেন বাস্তবনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ ইতিহাসের ভিত্তিতে। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা লেখক/কথকের মুখে বলতে শুনি—

“অষ্টবসুদের একজন ছিল বলেই তার নামের শেষে বসু যোগ করা হয়, আসলে সে চাঁদবেনে, এমন জনশ্রুতিও আছে; নতুবা তাকে চাঁদসদাগরের কাহিনীর মূলচরিত্র মনে করার অন্য কোনো যুক্তি নেই।”

তার উপন্যাসের চাঁদবেনে গুরুত্ব চন্দ্রশেখর বসু সমতটের অধিবাসী। আধুনিক মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যর্থতা, ট্রাজেডি এবং এমন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষ যে জীবযুদ্ধে বা জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে তা অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নবম দশম শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এখানে বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য যাত্রার ছবিতুলে ধরেছেন, কারণ এমন একজন বণিকের জীবন কথা তিনি অঙ্কন করতে চেয়েছেন যে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিতে চায়, যে কালকে অতিক্রম করতে যায়। মনসামঙ্গলে আমাদের পরিচিত চাঁদবেনে চরিত্রের সঙ্গে দৈবীশক্তির লড়াই, সর্পদেবী মনসা ও সাপের অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিতি। কিন্তু, ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসে সাপের প্রসঙ্গ থাকলেও সর্পদেবীর সঙ্গে যুদ্ধ নেই। এখানে চাঁদ বণিকের যুদ্ধ ভাগ্যের সাথে কালের। তিনি মন্তব্য করেছেন—

“এটা উপন্যাস, মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্য লেখা হয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে, কিন্তু উপন্যাসে থাকে মানবচরিত্র সেই মানবচরিত্র নিয়েই এই উপন্যাসের বিস্তৃতি। —ইতিহাসের দিক থেকে এটা পল্লব সাম্রাজ্য ধ্বংসের, চোল সাম্রাজ্যের উত্থানের সমসাময়িক।”

সেই সঙ্গে তিনি দু’জোড়া প্রেমের কথাও উল্লেখ করেন— চন্দ্রশেখর-সনকা ও শূর সেন-দময়ন্তি, মনসামঙ্গলের পাতিব্রতময়ী, প্রতিপ্রাণা সতী বেহুলার কোন উপস্থিতি নেই। মনসামঙ্গলের কাহিনিকে আধুনিক যুক্তিবুদ্ধির বাস্তবতায় দাঁড় করাতে গিয়ে নির্মিত হয় এক নতুন রচনার। পুরাণের মনসামঙ্গল কাহিনি নবতর দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। এই নবনির্মাণ

ঘটতে গিয়ে লেখকের দ্বারা উপন্যাসের কালানুক্রম ভেঙে তছনছ হয়েছে। এবং বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় লেখক 'আমি' এই পরিচয়ে কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন। গ্রন্থে অধ্যক্ষ পক্ষধর, চাঁদের বন্ধু শূরসেনের কথনে এবং কিছুটা হলেও লেখকের বয়ানে কাহিনি এগিয়ে গেছে। এছাড়া আরবসাগরে গিয়ে চাঁদের কি হয়েছিল তা এব্রাহিম ও দায়ুদ নামে দু-জন আরবী জাহাজী মল্ল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ কায়দা তাঁর মহাভারত থেকে নেওয়া, ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের কথকতা রীতি। ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ নিয়ে কাহিনি নির্মিত হলেও অমিয়ভূষণের বর্ণনার প্রতি উদ্ভটপুঙ্খ-এর প্রতি ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারণ তিনি একজন শিল্পী, চিত্রকর।

প্রথম তরঙ্গ (১৪টি অধ্যায়), দ্বিতীয় তরঙ্গ (৯টি), তৃতীয় তরঙ্গ (১টি), তরঙ্গ ভঙ্গি (৫) নামে পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই সমতটের চন্দ্রবসুর নামোল্লেখ পাই আমরা। সেইসঙ্গে সমতটের সূচক ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা, যা তৎকালীন সময়ের ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে উপন্যাসে। সিংহল থেকে বেরিয়ে একদল সিংহ বংশীয় বাঙালি বাণিজ্য বায়ু ও সমুদ্রস্রোতের অনুকূলের দরুণ মূল ভূখণ্ডের উপকূলে একটা ছোট উপনিবেশ গড়ে তোলে। যার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে পাহাড়। আর চম্পাবতী নামে গভীর খাড়ি সমেত নদী মধ্য সমতলকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে। উপনিবেশিক নগর চম্পক বা চম্পা। প্রসিদ্ধতর এই চম্পার বন্দর থেকে এই বণিকগোষ্ঠীরা পশ্চিমে সিংহল, কেরল, ভৃগকচ্ছ, দেবল আরব, মিশর, এবং পূর্বে কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, সুবর্ণভূমি, স্বর্ণদ্বীপ, কন্বুজ, চম্পা, চীন দেশে বাণিজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলতেন। জৈন সন্ত-পণ্ডিতদের প্রাকৃত, বৌদ্ধ শ্রমণদের পালি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংস্কৃত ও তামিল কবিদের শিবগাথা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত বহুল, পালিমিশ্র অবহট্টভাষী ছিল সমতটের অধিবাসীরা। এই নগরের বৃদ্ধি ছিল দ্রুতগতি সম্পন্ন ও সূনিয়ন্ত্রিত। আর চন্দ্রশেখর বসু অষ্টবসুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, রূপসী স্ত্রী স্বর্ণকায়া সনকা থাকায় ছিল নৌভাগ্যের অধিকারী। পিতা পারিবারিক বাণিজ্যতরী হারিয়ে শোকে ও আশাভঙ্গে অকালে গত হলে চাঁদবনে সেই জাহাজগুলি পুনরায় নির্মাণ করে, এবং জাহাজের সংখ্যা বাড়িয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে আবার। তবে শোনা যায় ১বার সাফল্যলাভ করলেও পরের বার সাতখানা জাহাজ খুঁইয়ে নিঃশ্ব হয়ে বাড়ি ফিরছিল। ২য় অধ্যায়ে চাঁদপুত্র বিজয় ঘোষ মধুলিট জাহাজে অধ্যক্ষ পক্ষধর ও দভভপানির সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় পাড়ি দেয়, পথে সঙ্গে পায় শাক্তশীল, বিনয়পালের মতো ত্যাগী, অনুসন্ধানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের। পুত্র সাগরদত্তকে বাণিজ্যে পাঠানোর পর চাঁদ বিজয়কে সমুদ্রযাত্রায় পাঠিয়ে চাঁদ নিজের দূরদেশে পাড়ির ইচ্ছা সম্পূর্ণ করতে চায়। তাই তার মুখে শোনা যায়—

“পক্ষধর অনেকদিন মহাচীন যাইনি। এটা কি ভালো? মহাচীন থেকে সেই সুদৃশ্য অভূতপূর্ব সুন্দর পানপাত্র আনার কথা ছিল, তা কি ভুলে গেছে? যাত্রা করো, যাত্রা করো।”

এখানে আমরা শব্দ মিশ্রের চাঁদ বণিকের পালায় চাঁদবনের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার কথাটির সাথে মিল খুঁজে পাই। এ যাত্রা হল সত্যের জয়ের জন্য যাত্রা। চন্দ্রবসুকে লেখক মনসামঙ্গলের চাঁদ-সদাগর নয়, তাঁর উপন্যাসে চন্দ্রশেখর আধুনিক সমাজ জীবন থেকে নেওয়া। তাই সে অন্তর্দ্বন্দ্বের দোষে-গুণে ভরা একজন মানুষ। কারণ লেখকের মতে, বাস্তবকে দেখে দেখেই তো উপন্যাস রচিত হয়। সমাজেব

প্রতিটি মানুষই উপন্যাসের নায়ক হওয়ার যোগ্য। ৩য় অধ্যায়ে পক্ষধরের গল্পে শোনা যায় চাঁদবেনেব সনকাকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা, ঝড়ে জাহাজের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া, সনকাকে হারানো, পরে মধুলুকা জাহাজ নিয়ে কোলগারে পৌঁছানো নগর নায়িকা ক্ষিরোদ সম্ভবার প্রাসাদে যাওয়া, তারপর নটী লীলালতিকার গৃহে পদার্পণ, সেখানে চিত্রকর চারু দত্তের ভৈরবী চিত্র অঙ্কন ও সেই ভৈরবীকে ছলনা করে চাঁদের তাঁতী সংগ্রহ ইত্যাদি ঘটনা, ৫ম অধ্যায়ে এই ভৈরবী ও সনকা একাকার হয়ে যায়। চাঁদবেনের ছলনা বুঝতে পারলে হলো ভৈরবী আত্মহত্যা করে এবং ৫ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সনকার অলৌকিক আবির্ভাব ও ভৈরবীপুত্র সাগরকে নিজ কোলে তুলে নেয়। চাঁদ নিজ স্ত্রীর সাথে চেহারায় সাদৃশ্যযুক্ত ভৈরবীকে প্রেম নিবেদন করে অনায়াসেই। তার মুখে শোনা যায়—

“আমি দক্ষকপাল। তুমি থাকো। তোমার অলৌকিকতায় অর্ধবিশ্বাস থাকুক। কী হবে রাজা রামচন্দ্র অথবা ভাগ্যের সাথে প্রতিযোগিতায়?”

পরে উপন্যাসের শেষ তরঙ্গে (২৭ অধ্যায়) চাঁদ যখন সমতটে ফিরে আসে এবং সনকার কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে—

“আমার কিছু দিন থেকে ভুল হচ্ছে। অথবা তখনই কি ভুল করেছিলাম? আচ্ছা

সনকা, যে ভালোবাসা সন্তানদের প্রাপ্য। পরস্পরকে ভালোবাসতে গিয়ে কি তা থেকে তাদের বঞ্চিত রেখেছিলাম? সে জন্যই কি তাদের তেমন প্রমাণ করতে ইচ্ছা হয়েছিল, তারা আমারই? কিংবা তুমি বিরহে ব্যাকুল হবে বলেই কি সমুদ্রে না গিয়ে তাদের যেতে দিয়েছিলাম?”

এভাবে মনসামঙ্গলের চরিত্রকে যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়েছেন লেখক।

উক্ত উপন্যাসের সমতট নগরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। নগর প্রধান শেখর সেন, মধুলিটের শাসক পরিচালক মণিভদ্র, জনপদ প্রধান মহাহুপতি, স্থাপত্য বিশারদ চিত্ররথের কথা, ইন্দুধব বণিকের কথা। সেই সঙ্গে চাঁদের বন্ধু শূর সেন ও তার স্ত্রী দময়ন্তীর উপন্যাসের বেশিরভাগটা জুড়ে উপস্থিতি। ৭ম অধ্যায়ে শূর সেনের উদ্যানবাটিতে চাঁদের সঙ্গে বৃদ্ধ মণিভদ্র, সোমদত্ত, বুদ্ধ, দর্ভপানি প্রৌঢ় হরিষণ, ওদন্ত সেনের পুত্র বসুদত্তের মধ্যে নতুন রকম ধাতু আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা হয় যা মাটির সঙ্গে জাহাজের খোল বোঝাই করে চাঁদ সমতটে নিয়ে আসে। এখানে ধাতুর প্রকৃতি, বাণিজ্যিক উপকারিতা ও অভিনবত্ব নিয়ে বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা হয়। দ্বিতীয় তরঙ্গের ১৭ অধ্যায়ে ১১ বছর পেরিয়ে যাবার পর পুনরায় যৌথ বাণিজ্যকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর জন্য মণিভদ্রের বাড়িতে হরিষণ, সোমদত্ত, দর্ভপানি, বজ্রদত্ত, বুদ্ধ, বিরুপাক্ষ প্রভৃতি বণিকদের মধ্যে আলোচনা হয়। উপন্যাসে কলিঙ্গ বণিক বাকপতি, ইহুদী সুরা বণিক সলেমান, সুলতান বণিক, বিণ চাচ ও বমিয়ান আকমদ চাঘতাই জিড্ডার বণিক আব্বাস, সুমালির কথা জানা যায়। সেই সঙ্গে বসুশ্রী পুত্র হলয়ুধ ও শূরসেন পুত্র শাতনীকের বিণ চাচের সঙ্গে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রকূট, পাল, প্রতিহার এই তিন সাম্রাজ্যে বাণিজ্য যাওয়ার কথা শোনা যায়। চাঁদপুত্র সাগর বাণিজ্যে গিয়ে পিতার মর্যাদা রক্ষা করতে চায়। পিতাকে যে লোকে লোভী, নির্বোধ, ঘাতক বলে এবং বিনা কারণে জাহাজগুলোকে সমুদ্রে পাঠিয়ে অধ্যক্ষ ও নাবিকদের হত্যা করেছেন। এই অভিযোগ যে মিথ্যা তা প্রমাণ করতে চায়। সে নিজে সমুদ্রে গিয়ে প্রমাণ করতে চায় শ্রীমন্ত, রুদ্রসেন, কৌমিলরা যারা লোহিত সাগরে গিয়েছিল। কুণ্ডীর জাহাজে, পুরন্দব যে মধুতপ্ত নিয়ে গিয়েছিল আবার সাগরে তারাও চাঁদের প্রিয় ছিল। সে পিতার যোগ্য পুত্র হতে চায়। সমুদ্রযাত্রাগুলো

যে উদ্দেশ্যহীন ধ্বংস নয়, তা প্রমাণ করতে চায়। মধুকর, মধুপ, মধুবহ, মধুমক্ষী ও মধুভদ্র জাহাজ নিয়ে সাগরদত্তের বাণিজ্য যাত্রা এবং পুত্র সাগরের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া চাঁদের জীবনে ব্যর্থতা ছেয়ে আসে। তার হাহাকার ও মধুলিট জাহাজ নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়তির কাছে মানুষের পরাজয় যেন। কিন্তু এ চাঁদ কালকে অতিক্রম করতে চায়। তাই শূরসেনের মুখে শোনা যায়—

“যেমন করে এক পিতা সাগরকে খুঁজেছিল, তেমন করেই বিজয়কে সমুদ্রে পাঠিয়ে এখন অনুশোচনায় তাকে খুঁজছে, সেই পাঁচ কার্যাপণের জাহাজ? শীতে, গ্রীষ্মে কখনই বা সমুদ্রে প্রমত্ত নয়?”

তৃতীয় তরঙ্গে বিজয়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া চাঁদের জীবনে আরো টুজেডি নিয়ে আসে। দুর্ভাগ্যকে প্রতিহত করার জন্য চাঁদ পুণরায় নাবালক পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠালেও সে পুরাতন মধুলিট জাহাজ নিয়ে নিজে সপ্তসাগর পাড়ি দেয়। কিন্তু সেখানেও তার ব্যর্থতা। দভভপাণির ভাবনায় তাই আসে—

“পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ মধুলিটে সপ্তসাগর চষে বেড়ানো, সে তো মূর্তিমান হাহাকারই। তার উদ্দেশ্যে কি ছিল সাগরদত্ত থেকে দুর্ভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা? হয় দেরি হয়ে গিয়েছিল?”

উপন্যাসে লেখক চাঁদের জীবনকে সমুদ্রতরঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। তাই উপন্যাসটি প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ, তৃতীয় তরঙ্গ ও তরঙ্গভঙ্গি—এই চারটি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাই বিজয়ের মতে নদী তরঙ্গ অপেক্ষা জীবনের তরঙ্গ বীভৎস—

“অসীম স্থান, ব্যাপ্ত তাদৃশ কালের তরঙ্গভঙ্গ, তার অপর তীর কি আছে? সব ধর্মই জীবাত্মাকে হোক, পুদগলকে হোক, নাবিক হতে হয়।— কালের তরঙ্গ লবন সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ অপেক্ষা কি কম বিপজ্জনক ও ভয়াবহ, অথবা কি কম বিচিত্র।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম তরঙ্গভঙ্গি। পল্লব-বংশের ২৫ বছর ধরে কুস্তকোনমের মহাযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। চোল, পাণ্ড্য ও পল্লবের মধ্যে যুদ্ধ। নৃপতুঙ্গের মৃত্যুর পরে অপরাজিত অপ্রহিত শক্তিশাল্য করে। কিন্তু ৮২৬ তে আদিত্যচোল অপরাজিতকে হত্যা করে চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নবম শতাব্দীর ইতিহাসকে বাস্তবায়িত করেছেন উপন্যাসিক। এই কুস্তকোনমের যুদ্ধ সমতটকেও প্রভাবিত করতে পারে তাই আদিবাসী গোষ্ঠীসহ বণিকদের মধ্যে বৈঠক হয়। আরক্ষবাহিনী শক্তি, মায়াবাহিনী শক্তি তৈরি এবং সাতালি পর্বতের উপর দুর্গ, নির্মাণ, শূরসেনের তত্ত্বাবধানে নারী-শিশুদের সাতালী পর্বতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধে ইন্দুধ্বজ ও শূরসেনের মৃত্যুতে সমতটের বিবাদের ছায়া নেমে আসে। শেষ পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সমতটের বসুবণিক চন্দ্রবসুর জীবনের করুণতম পরিণতিও পরিলক্ষিত

হয়। ভাগ্যের কাছে পরাজিত এই অর্ধদক্ষ বলিষ্ঠ পুরুষ চন্দ্রবসুর জীবনের পরিণতি দেখানো হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ নিঃস্ব হয়ে সমুদ্রতটে ভবঘুরে ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে পল্লবভরমের পথ অতিক্রম করে সমতটে ফিরে আসে। তবে সে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে না। কারণ আলো, বাতাস, আকাশ, সমুদ্রের ঈশ্বর কাউকে নির্বাচিত অধিকারী করেছেন তা অপ্রমাণ করা দরকার ছিল। তাছাড়া সে শুধু বন্ধু, অধ্যক্ষ, নাবিকদেরই সে পথে পাঠাই নি, শ্রাণসম পুত্রকেও পাঠিয়েছে। সে আরো যুক্তি দেখায়—

“তাছাড়া, সনকা, আমার পরিকল্পনায় কি ভুল ছিল? তুমি এ-সবে আমার সঙ্গে একমতই ছিলে। মন্মট, মহানাদ, পুরন্দর, সৌতি, সুযেণের মতো অধ্যক্ষ, আর দেহরক্ষী হিসাবে সাতশত তারা। আর তারা লোহিতসাগরে না গিয়ে সুমালি আর আবিসিরাজে ভারতীয় কার্পাস ভারতীয় পণ্য উপাদান কেন্দ্র করবে। বলো, তাই নয়? আর সাগর বলেছিল, কাব্যই প্রমাণ, অনেক সময়ে সুমালিতে ভারতীয় পণ্যকেন্দ্র স্থাপিত হলে, বংকই প্রমাণ, সেখানে আরবি ইশারী সব বণিকই আসত, সেখানে বন্ধু আরবিদের দেখা মিলত। তখনই ভূমধ্যসাগরের উত্তরকূলে যাওয়া সহজ হত।”^{১৬}

ভাগ্য যে তার সাথ দেয় নি, কালের ঘেরাটোপে সে যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরো একটি উক্তি—

“ভাগ্য কি এত কাপুরুষ, সনক, যে সমাপতনের চেহারা আসে? সে ঐরাবতের মতো আসে না কেন? কী বলব তোমাকে মুনি, আমাকে বারবধূরও ঘৃণ্য, এমন কুষ্ঠী করেছে।”^{১৭}

সমতটেই ফিরে এসে কুস্তকোনমের যুদ্ধে বন্ধু শূরসেনকে সহযোগীতা করে চাঁদ। বন্ধু শূরসেনের মৃত্যু ও সনকার ভৈরবীর বেশ ধারণ করে শ্রমণ চারুদত্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ায় চাঁদের জীবনে হাহাকার নেমে আসে। কিন্তু মুংলার শাতনীকের প্রতি উক্তি জ্ঞান যায়—

“চন্দ্রশেখরের যুক্তিতে মৃত্যু বলে কিছু নেই, তার মৃত্যুভয়ও ছিল না।”^{১৮}

তাই নিজের অস্ত্যোষ্টি ক্রিয়া নিজেই করে, মুংলাকে জাহাজের অধ্যক্ষ করে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বলতে গেলে অনির্দিষ্ট পথে, অনির্দিষ্ট যাত্রা এই চাঁদবেনের পক্ষধরের ভাবনায়—

“সমতটের সেই চিতা কি তাহলে নিজের তত্ত্বাবধানে নিজের শেষ সংস্কার করে যাওয়া চন্দ্রশেখরের? জানিয়ে গেলেন, তার সঙ্গে আমাদের আর কারো সম্বন্ধ রইল না? মধুকর নিয়েই বা একা তিনি কোথায় যাবেন? সেই ভূমধ্যসাগরই কি আবার? কিংবা তাকেও পার হয়ে? অথবা একি নিজের খ্যাতি-অখ্যাতি প্রতিষ্ঠা সব কিছুকে দক্ষ করে ভাগ্যর জন্য কিছু ছাই ছুড়ে দেওয়া।”^{১৯}

এই চাঁদের মৃত্যু হয়েও সে মৃত্যুকে জয় করেছে। জীবনের তরঙ্গে তার পরাজয় ঘটলেও নিজেকে সে থামিয়ে রাখেন নি। সমুদ্রে অনির্দিষ্ট দিকে সে আবার পাড়ি দিয়েছেন। তারই নির্দেশে

পক্ষধরের তত্ত্বাবধানে চাঁদপুত্র লক্ষ্মীন্দ্র ও শূরসেন পুত্র শাতনীক পুনরায় মধুলিট জাহাজে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। লখাই দক্ষিণে নেমে তাম্রপণী হয়ে পরে উত্তরপূর্বে এবং স্রম্ম অঞ্চলে যাবে, মালয়ে শ্রীবিজয়রাজ্যে যাবে সমতটে ফিরবার আগে। তার পূর্বধ্বালে যাত্রা চন্দ্রশেখরের নির্দেশে। শাতনীক সমুদ্রে পাড়ি দেয় তার পিতার জারজ সন্তানদের সন্ধানে। কুন্তুকোনমের যুদ্ধের শেষে পল্লববংশের ধ্বংস ও চোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের নাম শান্তিপর্ব। মহাভারতের সঙ্গে মিল রয়েছে এই অংশের। লেখকের মতে, ম্যান মাস্ট হ্যাভ অ্যান অকুপেশন, ম্যান মাস্ট হ্যাভ অ্যা প্রফেশন। কুরুক্ষেত্রের পরও প্রফেসন দরকার। মানুষকে তো কিছু করতে হবে, করে যেতেও হবে। তাই এই শান্তিপর্ব। সময় কোনদিন থেমে থাকে না। কোন একটি বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলে আবার নতুন সাম্রাজ্যের অঙ্কন ঘটে। কালের নিয়মে তাই পুনরায় বাণিজ্যযাত্রা শুরু করা হয় চাঁদের সপ্তডিঙা ডুবে যাওয়ার পরও। লেখকের ভাষায়—

“মধুলিট, তা সত্ত্বেও ব্যস্ত গতিতে চলছে না। অথবা ব্যস্ত গতি চিত্রিত হলে যেমন একই সঙ্গে তৎকালের হয়, কালকে অতিক্রম করে তেমন সেই গতি।...”

‘চাঁদবেনে’ ভাগ্যের কাছে পরাজিত মানুষের ট্রাজেডির কথা, বাঙালির কৌমজীবনের মনন কথা। জয়লাভের সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মনসাপুরাণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বজ্রজয়ী চাঁদকে আত্মসমর্পণ করতে হয় নিয়তির কাছে। এখানে তবুও দেখা যায় মৃত্যু হয়েছেও মৃত্যু হয়নি চাঁদের। সে উত্তীর্ণ হয় জীবনে সময়-দেশ-কালকে অতিক্রম করে। মৃত্যু হলেও তিনি জীবিত থাকবেন সন্তানদের মধ্যে, মৃত্যুকে জয় করে এই প্রত্যাশা তাঁর। তাই দু’শো হাত লম্বা, পঞ্চাশ জোড়া দাঁড়, তিনটি নয় থাক পালের মধুলিট জাহাজকে আবার চম্পার সমুদ্রে দেখা যায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। উপন্যাসে চাঁদবেনে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জটিলতা, চরিত্রের অন্তর্গত রহস্য ইত্যাদি তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রের নবনির্মাণ করেছেন লেখক। আসলে অমিয়ভূষণের মানসিক যন্ত্রণা এবং আবেগ থেকে সাহিত্যের রূপরেখা যেমন তৈরী হতে পেরেছে, সংযম পরিত্যক্তিতে সেরকমভাবে নিজের চিত্রভাষায় তিনি চিত্রিত করেছেন উদ্বেলিত মনের প্রক্ষেপ। সৃষ্টির ক্ষমতায় তিনি নিজেকেই অতিক্রম করে গেছেন বারে বারে। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী মানবিক মূল্যবোধের সংকট তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। আধুনিক জীবনের প্রেমহীনতা, অতীত ঐতিহ্যের বিচ্যুতি তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। সিনিজন ও ভ্রষ্টাচারের ডুবে থাকা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি তার অভিজ্ঞতার জগতকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এমন এক শিল্পজগতে যেখানে সে নিজেই হয়ে উঠতে পারেন একটি ব্যক্তিসত্ত্বাময় মানুষ।

মনসা চরিত্রের সরাসরি নামোল্লেখ না থাকলে উপন্যাসে সর্পের উল্লেখ আছে অসংখ্যবার। আসলে বিশ শতকের যুগে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের মতো দেবনির্ভর কাহিনিকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তবে মনসার প্রসঙ্গটিকে নানা যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে দাঁড় করিয়েছেন। উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম শিব ও সর্প চাঁদ ও

সনকা নগর ছাড়িয়ে যে শিব-পার্বতীর মন্দিরে যায় সেখানকার বিগ্রহের পরিকল্পনা দেখে
চাঁদের কাছে প্রশংসার বদলে দৃষ্য বলে মনে হয়। অনুচ্চকণ্ঠে সে বলে ওঠে —

“ওটা তো জটা নয়, সাপ। সাপ কেন?”^{১৮}

তাঁর মতে, শিবের আকৃতি লিঙ্গরূপ হওয়াই ভালো এবং শিবের গলা পেঁচিয়ে বুকের
উপর ওই সাপ দেখে গৌরী যেন সঙ্কুচিত। কিন্তু সনকার মতে, এই উর্বরা-শক্তি সাপের জন্যই
এই পৃথিবী সৃষ্টি, আমরা সৃষ্টি। এখানে চাঁদের সর্প-বিতৃষ্ণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু সনকার কাছে
সর্প ও শিব একাকার হয়েছে। দুই-ই যেন উর্বরা শক্তির প্রতীক। ‘অলৌকিক সর্প’ নামে ১৯
অধ্যায়ে কোমলগরের নগরনায়িকা লীললতিকার গৃহে সর্পপূজা দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছিল চাঁদ। তার
মনে হয়েছিল সর্প আসলে ঘৃণা ও ভয়ের বস্তু। তিনি কখনোই সর্পকে সহ্য করতে পারেন না।
চাঁদের দপ্তরের বাতায়নের দেওয়ালের কাছে চৌকাঠি পর্যন্ত উঁচু এক ধূসর খয়েরি সাপের রাগে
ফনা তুলে কাঁপা, ফোঁপানো এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে চাঁদ বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু
তৎক্ষণাৎ বিচলিত ভাব কাটিয়ে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। সাপের দিকে আঙুল
তুলে চিৎকার করে ওঠে—

“দেখ, সনকা, দেখ চাঁদকে ভয় দেখায়, চাঁদকে! সে হো হো করে উঠলো। বললো,
বোঝানি, সোনা, ওটা একটা ছায়া মাত্র।”^{১৯}

সনকাকে বোঝানোর চেষ্টা করে এই ঘটনা অলৌকিক কিছু নয়, এ একরকমের বৃষ্টি।
উত্তাপ সঞ্চালনে হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র পড়ে। চাঁদ ও সনকা সাঁওতাল পাহাড়ে অবসর যাপনের
জন্য গেলে, সেখানে স্থানীয় আদিবাসীদের মনসাগাছের নীচে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে মনসার
পূজা করতে দেখে, সনকা অভিভূত মনে ভাবে আদিবাসীরা তাদেরই মঙ্গল কামনায় এই পূজার
আয়োজন করেছে। কিন্তু চাঁদ এই দৃশ্য দেখে আহত হন। তার যুক্তিবাদী মানসিকতা এটি মেনে
নিতে পারে না। যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা সনকাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—

“সাপ কুটিলতা, ক্রুরতা, আর বিষের প্রতীক। মাটিতে মিশে চলে কপট, কোমলতা
আর বিনীত ভাব দেখিয়ে। মানুষ অসতর্ক হলেই ছুবলে দেবে। পূজা তো মানুষেরই
অনুভূতিকে উদার আর মহৎ করবেই। হয় তা সরীসৃপের ধ্যানে?”^{২০}

সনকার মতে, সাপ তাহলে হয়তো আমাদের দাসদের প্রতীক। মূর্খ, মূক মানুষেরও অনুভূতি
থাকে, সে অনুভূতি হয়তো মনের অন্ধকারে গতিশীল, আর এই আদিবাসীরা চাঁদের পরিবারের
মঙ্গলকামনাই করে। সনকার আরো কিছু যুক্তি—

“চিরকালের জন্য হেরে যাওয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের নষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা পদপিষ্ট
অনুভূতির প্রতীক নাকি সর্প।”^{২১}

এই কথা শুনে শূরসেন মন্তব্য করে, তাহলে সেই বিনষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি, পদানত
অনুভূতিগুলি বিষ সঞ্চয় করে এক সময়ে বিষাক্ত ও ক্রুর হয়ে উঠতে পারে। দময়ন্তীর মতে,

ঐশ্বর্য আদায়ের শক্তি এই সর্পরূপী। এটি বেগেদের গল্প, কিন্তু আরো লোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষা করলে বিষ উগরায়। দময়ন্তী পুরানের বর্ণনা করে বলে যে, সর্প জন্মমাত্র গোপালের অহিছত্র, কিশোর গোপাল সাপের মাথায় নাচে। তক্ষশীলায় ঢোকান আগে এক গ্রাম্য-পূজকের কাছ থেকে যে পতঞ্জলির শ্বেতপাথরের মূর্তি পায় বিন চাচ, তার মাথার উপর সাপের পাঁচফনা। সেই সর্পপূজক বলেছেন—

“সর্প নাকি মানুষের মধ্যেই অন্ধকামরূপে থাকে। সেই অন্ধ সর্পকাম থেকেই লোভ, লোভ থেকে ক্রোধ, সেজন্য বিষময় পাঁচ ফনা তার। আবার সেই অন্ধকাম না থাকলে মানুষের বৃদ্ধিই হয় না। যৌবনের গুণপনা আসে না, এই অন্ধকাম জ্ঞানে যুক্ত হলে তবে তার বিষক্ষয়।”^{২২}

এগুলি হল উপন্যাসিক অমিয়ভূষনেরই কথা। তাঁর নিজস্ব ভাবনা চিন্তাগুলিই এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছেন—

“Libido কিন্তু Unconscious তো, মনের অংশই যেন মনসা। সেজন্যই তিনি শিবের আত্মজা। পরমজ্ঞান আত্মজা। তার মানে Libido is part of, super ego is part of mind. সে জন্যই আত্মজা। এই মনসার পূজা করে আমাদের শরীরের ওই যে বিষ— কাম। ক্রোধ, হিংসা-এই সমস্ত যে মূল শক্তি— Libido, যেটা নষ্ট করলে মানুষ যুবক হয় না, গোঁফ ওঠে না, একটা মেয়ে যুবতী হবে না, তাকে বলছি, মা তুমি সামনে এসো। তিনি এখন বিষহরিণী। এই পূজো হচ্ছে বাঙালির পূজো। এটা বাঙালির সমন্বয়ের পূজো। হিন্দু-মুসলমান-যোগী সব মিলে একটা সমন্বয় গঠিত হয়েছে। এই মনসার থেকেই পদ্মা।”^{২৩}

উক্ত দর্শনটি উপন্যাসে আরও স্পষ্ট হয়। যখন তদ্বাচ্ছন্ন ঘুমের মধ্যে চাঁদ ‘হেস্তাল’ বলে চিৎকার করে। প্রাসাদের ঐশ্বর্যসুখ ও বিলাসের মধ্যেও চাঁদের মনকে এক বিপন্নতা ও অমোঘ আঘাতের ভয় গ্রাস করে থাকে। স্বপ্নে সে পত্রহীন প্রাচীন হিজল গাছের ভয়াবহ অন্ধকারময় কোটরে একটা কুৎসিত দর্শন সাপ পিচ্ছিল গতিতে ফনা লুকিয়ে ঢুকতে দেখে। আসলে এই স্বপ্নদর্শনের মধ্যে রয়েছে আধুনিক মানুষের বিপন্নতার যন্ত্রণা ও একাকিত্বের অসহায়তা। চাঁদের মনসাভীতি এখানে সাপ ও হেতালের মাধ্যমে প্রতীকি হয়ে যায়। মনো-বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতিতে এই স্বপ্নদর্শনের বিষয় অর্থবহ হয়ে ওঠে। এখানে চাঁদের গহন মনের অন্ধকারে জমে থাকা সর্পির্ল মানসিকতা যেন তাকেই গ্রাস করতে আসে। আবার আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেকে জয়ী করে তোলার প্রচেষ্টা হেঁতালের রূপকে ভাষারূপ লাভ করে। তাঁর ভয় ও আতর্ষ চিৎকার আসলে মনসার মতো নিয়ন্ত্রণী শক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করা। এই ভাবে উপন্যাসিক মনসা পুরাণের বিভিন্ন প্রচলিত ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। চাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে মনসার উপস্থিতি সর্বত্র থাকলেও তা আধুনিক মনস্ক ব্যক্তিব

কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য মিথটিকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ‘আধুনিকোন্মুখ’ বা ‘উত্তরআধুনিক’ কালপর্বে জীবন ও ঐতিহ্যকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রবণতা অমিয়ভূষণ মজুমদার তাকেই পূর্ণতা দিয়ে অন্য কাহিনি নির্মাণ করেন। মনসামঙ্গলের কাহিনির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংকেত নিয়ে নির্মাণ করেন নতুন পাঠকৃতি। তাই উপন্যাসের চরিত্র ‘চাঁদ’ আর ‘মনসার’ বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকে না। তিনি হয়ে ওঠেন প্রাচীনকালের সমাজ তথা দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধির ধারক ও বাহক। ভারতীয় বাণিজ্যের উদগাতা ও ঐতিহ্যের সংগঠক। উপন্যাসের চাঁদ স্বপ্ন দেখেছিল আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের চেয়েছিল দেশের সকল বণিকদের জন্য সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে দিতে। কিন্তু চাঁদের জীবনে দৈব ও দুর্দৈব একত্র সমাপিত হয়ে স্বপ্ন পুরো সফল হতে দেয়নি। লেখক নিজেই জানিয়েছেন যে, উপন্যাসে সরাসরি মনসার সাথে বিরোধ নেই, যদি বিরোধ থাকে তাহলে সেটা ভাগ্যের সাথে, কালের সাথে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনিতে অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা আবরণ তৈরি করে লেখক তাকে প্রামাণ্য ইতিহাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিহাসের তদ্বিষ্ঠ গবেষকের মতো তিনি লোকপুরাণের ভিতরকার ইতিহাস উন্মোচিত করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সমালোচকের ভাষায়—

‘চাঁদবেনে’, ‘মধুসাধুখাঁ’ প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যযুগের কাহিনিতে আধুনিক মাত্রা যোগ করে অমিয়ভূষণ বাস্তবতার মাত্রা সঞ্জাত করেছেন।”^{২৪}

—লেখক সময়ে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে ভেঙে এক যুক্তিবাদী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দোষে-গুণে ভরা চাঁদ চরিত্র নির্মাণ করেন। এই চন্দ্রশেখরকে, মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদবেনে মনে হয় না, তিনি যেন নবম শতাব্দীর প্রভু ভারতবর্ষের এক ট্রাজিক নায়ক। ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত এক অসহায় মানুষের জন্মন আমাদের হৃদয়কে বেদনাসিক্ত করে তোলে। গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতো জয়লাভের সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়তির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আবার তার নিজের শেষ কর্ম সম্পন্ন করে যাওয়ার মধ্যে তার মধ্যে মনসাপুরাণের বজ্রজয়ী চাঁদচরিত্রের যেন পুংপ্রতিষ্ঠা ঘটে। অটল ব্যক্তিত্ব, উদ্ভুদ আত্মমর্যাদাবোধ ও অহমিকা নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন পরিচিতি জগতের সীমা অতিক্রম করে মহাকালের যাত্রাপথে। মৃত্যুও তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। এই ভাবেই তাঁর যাত্রা-কাল থেকে কালান্তরের দিকে তাই সমালোচক বলেছেন—

“মনসামঙ্গলের পাতায় যে চাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, অমিয়ভূষণের চাঁদ সেই মানুষটি হয়েও আবার অন্য মানুষ। উপন্যাসের চাঁদের চরিত্র-স্বভাব, কর্মকাণ্ড, পরিণাম কিছুই মেলে না। তবুও কাহিনির বয়নগুণে চাঁদের যে আদল ফুটে ওঠে তার ভিতরে কোথাও যেন রয়েছে মিথ-পুরাণের সেই ব্যক্তিত্বময় মানুষটির সজীব উপস্থিতি।”^{২৫}

‘চাঁদবেনে’ মানব বৈপরীত্যের ইতিহাস। মানুষের ইতিহাসে হাজারটা মুখ থেকে যায়।

পদাতিক মানুষ পথ চলতে গিয়ে লড়াই করে। সফলতা কিম্বা বিফলতা দেখে নেয়। মানুষের ভেতরেই কথা বলে ওঠে কাল ও সময়ের কণ্ঠস্বর। মানবযন্ত্রণা ও কান্নার কলতান বুকে নিয়ে এক বণিক কাহিনি জীবন ও সৃষ্টির নব যোগসূত্রের রচনা করেছে। ইতিহাস-পুরাণ মিত্র কাব্য; অলৌকিকতা বাস্তবতা ও স্বপ্ন মূর্ত-বিমূর্তের অদ্ভুদ নকশা রচনা করেছেন, তবুও জীবন ও জীবনের সে গভীরবোধ আমরা পাচ্ছি। তাতে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নবরূপায়ন।

তথ্যসূত্র :

১. সামন্ত, সুবল (সম্পাদনা) - 'বাংলা উপন্যাসঃ বীক্ষা ও অঘীক্ষা' এবং 'মুশায়েরা, জানুয়ারি-১৯৯৮, পৃ. ৯
২. নাগ, রমাপ্রসাদ - 'অমিয়ভূষণ : ট্রমাচিহ্নিত এপিক', ভাষাপ্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ৯৬।
৩. মজুমদার, অমিয় - 'অমিয় রচনাপ্রসঙ্গ', ৩য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি-২০১০, পৃ. ১২।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর - 'আখ্যানের সাতকাহন', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৬, পৃ. ৩৩।
৫. মজুমদার, অমিয় - 'অমিয় রচনাপ্রসঙ্গ', ৯ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি-২০১০, পৃ. ১৫।
৬. ১৩ জুলাই, ১৯৯৪, আজকাল পত্রিকা,
৭. মজুমদার, অমিয় - 'অমিয় রচনাপ্রসঙ্গ', ৯ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি-২০১০, পৃ. ২৩।
৮. তদেব, পৃ. ৬৮।
৯. তদেব, পৃ. ৩৯৫।
১০. তদেব, পৃ. ৩১৫।
১১. তদেব, পৃ. ৩৪৯-৩৫০।
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৬।
১৩. তদেব, পৃ. ৩৮৪।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৮৫।
১৫. তদেব, পৃ. ৪৪২।
১৬. তদেব, পৃ.
১৭. তদেব, পৃ. ৮২৮।
১৮. তদেব, পৃ. ৮২।

১৯. তদেব, পৃ. ২১৯।
২০. তদেব, পৃ. ১১৭।
২১. তদেব, পৃ. ২২৩।
২২. তদেব, পৃ. ২২৪।
২৩. তদেব, পৃ. ৫৮২।
২৪. নাগ, রামপ্রসাদ - 'স্বতন্ত্র নির্মিত, অমিয় ভূষণ সাহিত্য' পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি-২০০২, পৃ. ১৯৯।
২৫. নস্কর, সনৎকুমার - 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রেক্ষ ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ২১০।
- অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী :
১. ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার - 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', বাকুপ্রতিমা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই-২০১২।
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর - 'উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ', বঙ্গীয়সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৪১২।
৩. বর্মা, উদয়শংকর - 'উপন্যাসের অন্য ভূবন', কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০৮।
৪. ভট্টাচার্য, বীতশোক - 'কথাজিজ্ঞাসা : এবং মুশায়েরা', প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি - ২০০৪।
৫. মণ্ডল, বরেন্দ্র - 'আখ্যানের আলেখ্য', দিবারাত্রির কাব্য, প্রথম-প্রকাশ, ১৪১১ (শ্রাবণ)
৬. মুখোপাধ্যায়, তরুণ - 'কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার পরিবেশক', প্রথম প্রকাশ, ২২ মার্চ, ২০১১।
৭. পাল, অপর্ণা - 'ভিন্ন স্রোতের ঢেউ', বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭-৬৭), অক্ষর প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৩।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার - 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পূর্নমুদ্রণ-১০০৬-২০০৭।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ - 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-১৯৬১, পঞ্চম দে'জ সংস্করণ, নভেম্বর-২০০৩।
১০. সেন, দীনেশ চন্দ্র - বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট-২০০২।

১১. রায়, নিহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন-১৪১৬ জুন-২০০৭।
১২. সাহিত্যচিন্তা, গবেষণাধর্মী বার্ষিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বইমেলা ২০১৪।
১৩. মজুমদার, অমিয় - অমিয় রচনাসমগ্র, ৭ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি-২০১০।
১৪. মজুমদার, অমিয় - অমিয় রচনাসমগ্র, ৬খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, জুন-২০০৮।
১৫. মজুমদার, অমিয় - অমিয় রচনাসমগ্র, ৪খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং,
১৬. মজুমদার, অমিয় - অমিয় রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল-২০০২।
১৭. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত - গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-১৯৯৯।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস - রঙ্গালয় ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৮।
